গ্রন্থ

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচিপত্র

অন্তর বাহির 2
দৃষ্টি ও সৃষ্টি 13
মত ও মন্ত্র 39
শিল্প ও দেহতত্ত্ব 48
শিল্প ও ভাষা 62
শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড 79
শিল্পে অধিকার 94
শিল্পে অনধিকার 105
শিল্পের সচলতা ও অচলতা 119
সন্ধ্যার উৎসব 130
সৌন্দর্যের সন্ধান 135

www.bengaliebook.com

অন্তর বাহির

ফটোগ্রাফের সঙ্গে ফটোকর্তার যোগ পুরো নয়—পাহাড় দেখলেম ক্যামেরা খুল্লেম ছবি উঠলো ফটোকর্তার অন্তরের সঙ্গে পাহাড়ের যোগাযোগই হল না। এইজন্যে আর্টিষ্টের লেখা পাহাড় যেমন মনে গিয়ে পৌঁছয়, ফটোতে লেখা পাহাড় ঠিক তেমন ভাবে মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না—শুধু চোখের উপর দিয়েই ভেসে যায় বায়স্কোপের ছবি, মনের মধ্যে তলিয়ে যায় না। খবরের কাগজ খবর দিয়েই চল্লো অনবরত, আজ পড়লেম দুদিন পরে ভুল্লেম। কবি গান গেয়ে গেলেন, শিল্পী রচনা করে গেলেন, চোখ কাণের রাস্তা ধরে' মর্মে গিয়ে পৌঁছোল গান ও ছবি। ক্যামেরার মতে চোখ খুল্লেম বন্ধ করলেম, একই বস্তু একই ভাবে বারম্বার এল কাছে,—এ হ'ল অত্যন্ত সাধারণ দেখা। শিল্পীর মতো চোখ মেল্লেম বস্তু জগতের দিকে, রূপ চোখে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে রূপাতীত রসের উদয় হ'ল।

ফটোগ্রাফ বস্তু জগতের এক চুল ওলট-পালট করতে অক্ষম, কিন্তু শিল্পীর কল্পনা যে বরফের হাওয়া পেলে—ফটোগ্রাফের মধ্যে যতটা বস্তু তার সমস্তটা পালাই পালাই করে—সেই বরফের চূড়ায় হর-গৌরীকে বসিয়ে দিলে বিনা তর্কে। চোখের দেখা ও মনের দেখা দিয়ে শিল্পী যখন মিল্লেন চোখের সামনে বিদ্যমান যা এবং চোখের বাইরে অবিদ্যমান যা তার সঙ্গে, তখন নিয়তির নিয়ম উল্টে গেল অনেকখানি—দেবতা সমস্ত এসে সামনে দাঁড়ালো ঠিক মানুষের মতই দুই পায়ে কিন্তু অসংখ্য হাত অসংখ্য মাথা নিয়ে, নিচের দিকে রইলো বাস্তব উপরে রইলো অবাস্তব, সম্ভবমতো হ'ল দুই পা, অসম্ভব রকম হ'ল হাত ও মাথা, সৃষ্টির নিয়ম মিল্লো গিয়ে অনাসৃষ্টির অনিয়মে।

ফটোগ্রাফের যে কৌশল তা বস্তুর বাইরেটার সঙ্গেই যুক্ত আর শিল্পীর যে যোগ তা শিল্পীর নিজের অন্তর-বাহিরের সঙ্গে বস্তুজগতের অন্তর-বাহিরের যোগ এবং সেই যোগের পন্থা হ'ল কল্পনা এবং বাস্তব ঘটনা দুয়ের সমন্বয় করার সাধনাটি।

নির্ভুলে ব্যাকরণ ও পরিভাষা ইত্যাদি দিয়ে যেমনটি-তাই ঘটনাকে বলে' যাওয়া হ'লেই যে বলা হ'ল তা নয়, তা যদি হ'ত তো সাহিত্য খবরের কাগজেই বদ্ধ থাকতো। তেমনি যা-তা এঁকে চলা মানে শিল্পের দিক থেকে বেঁকে ফটোগ্রাফের দিকে যাওয়া, সুর ছেড়ে হরিবোলার বুলি বলা। অবিদ্যমানকে ছেড়ে বিদ্যমানে বর্তে' নেই একদণ্ড এই সৃষ্টি এবং কল্পনাকে ছেড়ে শুধু ঘটনার মধ্যে বর্তে' থাকতে পারে না মানুষের রচনা, ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিলন হ'ল তবে হ'ল একটা শিল্প রচনা। গাছ দাঁড়িয়ে রইলো কিন্তু ফুল পাতা এরা দুল্লো, কখনো আলোর দিকে মুখ ফেরালে কখনো অন্ধকারের দিকে হাত বাড়ালে। মানুষ বাঁধা রইলো মাটির সঙ্গে কিন্তু মন তার বিদ্যমান অবিদ্যমান দুই ডানা মেলে উড়লো, মানুষের শিল্প তার মনের পাখীর গতিবিধির চিহ্ন রেখে গেল কালে কালে—পাথরে, কাগজে, মাটিতে, সোণায়, কাঁসায়, কাঠে, কয়লায়। ইতর জীব তার বর্তমানটুকুর ঘেরে বাঁধাই রয়েছে, বিদ্যমানের প্রাচীর ছাড়িয়ে যাওয়া শুধু মানুষেরই সাধ্য হয়েছে—ঘোড়া সে কোনকালে পক্ষিরাজ হবার কল্পনাই করতে পারলে না কিন্তু মানুষ অতিমানুষের কল্পনা অমানুষি সমস্ত রচনার স্বপ্ন দেখলে, বিদ্যমানের মধ্যে মানুষ আপনাকে ইতর জীবের মতো নিঃশেষে ফুরিয়ে দিতে পারলে না; সে কল্পনা ও স্মৃতি এই দুই টানা-পোড়েনে প্রস্তুত করে' চল্লো বিশ্বজোড়া মায়াজাল। সে ঘুমিয়ে স্বপন দেখলে, জেগে স্বপন দেখলে, বিদ্যমান থেকে অবিদ্যমান পর্যন্ত তার মন এল গেল—অবিদ্যমানকে আনলে, অনাবিষ্কৃতকে করলে আবিষ্কার। পাখীরা যে সুর পেলে সেই সুরেই গেয়ে গেল, অনাহত সুরের সন্ধান তারা পেলে না; দেওয়া সুরে গাইলে কোকিল, দেওয়া সুরেই ডাকলে ময়ূর, কিন্তু মানুষের গলায় অবিদ্যমানের সুর পৌঁছোলো—অনাহত তারের অপ্রকাশিত সুর, তাই শুনে বিশ্বজগৎ হরিণের মতো কাণ খাড়া করে' স্তব্ধ হয়ে রইলো, অগোচর রূপ সাগরের জল মানুষ ছুঁয়ে এল, তার হাতের পরশে ফুটলো বিচিত্র ছবি বিচিত্র শিল্পকলা, আর একটি নতুন সৃষ্টি—পলে পলে কালে কালে যা নতুন থেকে নতুনতর রাজত্বে চলেছে তো চলেছেই! বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান এই দুই ডানার উত্থানপতনের গতি ধরে', চলেছে মানুষের মনের সঙ্গে মানুষের মানস-কল্পনার প্রকাশগুলি। অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মধ্যে ধরে' দিচ্ছে মানুষ, অন্তরকে আনছে

বাইরে, বাইরেকে নিয়ে চলেছে অন্তরে,—এই হ'ল শিল্প-রচনার মূলের কথা। শিল্প এলো সামনে, পিছনে লুকিয়ে রইলো শিল্পী,—এই হ'ল শিল্পের সঠিক লক্ষণ। ময়ূর শিল্পী নয় কেননা সে তার চালচিত্র আড়াল করে' নিজেকে সামনে ধরে' দেয়। রচনাকে ঠেলে বেরিয়ে এলো সুচতুর রচয়িতা এটা একটা মস্ত দোষ, ছবিটাকে আড়াল করে' ছবি-লিখিয়ে তাড়াতাড়ি তোড় জোড় নিয়ে যদি সামনে দাঁড়ায়, ছবির কোণের নামটা এবং তুলির টানটাই দেখবার বিষয় বলে, তবে সে লোককে কি সওয়া যায় চিত্রবিদ্ বলে'? অবিদ্যমানের দিকে, কল্পনার দিকে, অগোচরের দিকে যে চিরন্তন টান রয়েছে সমস্ত শিল্পের সমস্ত শিল্পীর, এটা যে না বোঝে চিত্রের বিচিত্র রহস্য সে বোঝে না, তার কাছে বাস্তব ও কাল্পনিক দুয়েরই অর্থ অজ্ঞাত থেকে যায়, দাঁড়ে বাঁধা পাখীর মতো শিল্প শাস্ত্রের বুলিই সে আউড়ে চলে অনর্গল; যথা—"সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং" কিম্বা "তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকং। বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ॥" অথবা "সুপ্তং চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতং। নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ॥" যে ওস্তাদ বোল সৃষ্টি করে সে বোঝে বোলের মর্ম কিন্তু খোল সে বোল বলে মাত্র, বলে কিন্তু বোঝে না বোলের সার্থকতা অথবা প্রয়োগের কৌশল। মানুষের লেখা পুঁথিগত শিল্পের চেহারা এক, আর মানুষের মনোমত করে' রচা শিল্পের রূপ অন্য। শাস্ত্রকার চাইলেন শিল্পী আঁকুক ঠিক ঠিক তরঙ্গ অগ্নিশিখা ধূম নিম্ন উন্নত সুপ্ত মৃত জীবিত এক কথায় সশ্বাস ইব চলন্ত বলন্ত ইংরাজীতে যাকে বলি life-like ছবি—কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে' পূর্ব পশ্চিমের বিস্তার ছাড়িয়ে যে শিল্পলোক এবং কল্পনার রাজ্য তার যে অধিবাসী তারা এঁকে চল্লো এর ঠিক বিপরীত, শুধু নকলনবিশেরাই ধরে' রইলো সামনে বিদ্যমান শাস্ত্রের বচন ও বস্তুজগৎ।—"Do not imitate; do not follow others—you will be always behind them"—Corot. আসল মেঘ চলে' যায় পলে পলে রূপ বদলাতে বদলাতে, নকল মেঘের বদল নাই, এটা শাস্ত্রকার পণ্ডিতের ঢের আগে শিল্পী আবিষ্কার ক'রে গেছে, তাই সে বলেছে—অনুসরণ, অনুকরণ, অনুবাদ এ সব করলে পিছিয়ে পড়বে, পটের 'সশ্বাস ইব' অবস্থায় স-শে-মি-রা হয়ে হবে পুঁথির ও পরের তল্পিদার মাত্র, শিল্পী হবে না শিল্পকে পাবে না—

“Nothing is so tiring as a constant close imitation of life one comes back inevitably to imaginative work”—Weertz.

“তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকং বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ,” অথবা “সুপ্তবৎ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতং নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ”—এ হ’ল শিল্পে বাস্তবপন্থীর কথা—যেন ঢেউ উঠছে পড়ছে, যেন আগুন জ্বলছে, নিশান লট্‌পট্‌ করছে, আঁচল উড়ছে বাতাসে, যেন ঘুমন্ত যেন জীবন্ত যেন মৃত যেন নিম্নোন্নত,—এক কথায় ‘সশ্বাস ইব’ হ’ল চরম কথা। কিন্তু এই মতের অনুসরণে গিয়ে কি মানুষ অনুকরণেই ঠেকে রইল না শিল্পী সে ছবি লিখে চল্লো বায়ুর চেয়ে গতিমান কল্পনার সাহায্যে নিজের বর্ণ ও রেখা সমস্তকে কখন তরঙ্গায়িত, শিখায়িত, ধূমায়িত ক’রে দিয়ে—এমন মেঘ এমন আগুন, এমন সমুদ্রের এমন ঢেউ যা বাস্তব জগতে দেখেনি কেউ! শিল্পের জয়পতাকা কল্পনার বাতাসে উড়ে’ অচেতন রেখা চেতন হয়, সচেতন রং ঘুমিয়ে পড়ে কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে, শয়ন ছেড়ে জেগে ওঠে মনের মধ্যেকার সুপ্ত ভাব, স্থির বিদ্যুল্লেখার মতো শোভা পায় স্বপ্নপুরের অলক্ষ্য রূপরেখা! কল্পনার যেখানে প্রসার নেই সেখানে রেখা শুধু দপ্তরীর রুলটানা, আলো-ছায়া, আনাটমি পারস্‌পেক্‌টিভ ইত্যাদির ঘূর্ণাবর্ত, শুধু কুস্তির মারপেঁচ, ভূষণ সেখানে বারাঙ্গনার সাজের মতো অপদার্থ এবং বর্ণ সেখানে বহুরূপীর রং চং করা সং মাত্র, তা সে শাস্ত্রমতো অনুলোম পদ্ধতিতেই আঁকা হোক বা প্রতিলোম পদ্ধতিতেই টানা হোক। “To make a thing which is obviously stone, wood or glass speak is a greater triumph than to produce wax-works or peep-shows—Rodin. শিল্পী কতখানি প্রকাণ্ড কল্পনা নিয়ে বাস্তব জগৎ থেকে সরে’ দাঁড়ালো যখন সে কাঠ পাথর কাগজকে কথা বলাতে চাইলে! শিল্পের প্রাণ হচ্ছে কল্পনা, অবিদ্যমানের নিশ্বাস। চৌরঙ্গীর মার্কেটে যে মোমের পুতুলগুলো বিক্রী হচ্ছে তারা একেবারে ‘সশ্বাস ইব’, চোখ নাড়ে ঘাড় ফেরায় হাসে কাঁদে “পাপা” “মামা” বলেও ডাকে কিন্তু ‘ইব’ পর্যন্তই তার দৌড়! কোন শিল্পী যদি শিল্পশাস্ত্র লিখতে চায় তবে এই ‘ইব’ কথাটি তার চিত্রশব্দ-কল্পদ্রুম থেকে বাদ দিয়ে তাকে লিখতে হবে ‘সশ্বাস ইব’ নয় ‘সশ্বাসং যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং’। শিল্পীর মানস কল্পনা যে কল্পলোকের দিব্য নিশ্বাসে প্রাণবন্ত হয় সে হাওয়া কি এই

বাতাস যা ঐ লাট প্রাসাদের নিশান দুলিয়ে গড়ের মাঠের ধূলোয় কলের ধূলোয় মলিন হ'য়ে আমাদের নাকে মুখে দিবারাত্রি যাওয়া আসা করছে? আর্টিষ্টদের মনোরথ যে বাতাস কেটে চলে সে বাতাস হচ্ছে এমন এক তরল হাওয়া যার উপর পালকের ভার সয় না অথচ বিশ্বরচনার ভার সে ধরে' আছে! শিল্পশাস্ত্র খুবই গভীর, তার একটা লাইনের অর্থ হাজার রকম, কিন্তু তার চেয়ে গভীর জিনিষ হ'ল শিল্প, যার একটা লাইনের মর্ম ঝুড়ি ঝুড়ি শিল্পশাস্ত্রেও কুলোয় না, আবার শিল্পের চেয়ে গভীর হ'ল শিল্পীর মন যার মধ্যে বহির্জগৎ তলিয়ে রইলো—স্মৃতির শুক্তিতে ধরামুক্তি, নূতন জগৎ সৃষ্টি হল জলের মাঝে বড়বানল। এই যে শিল্পীর মন এর কাজই হল বাইরে গিয়ে আবিষ্কার এবং ভিতরে থেকেও আবিষ্কার, আবির্ভূত যে জগৎ এই গাছ-পালা জীবজন্তু আকাশ আলো এর সামনে এসে শিল্পীর মন থমকে দাঁড়িয়ে শুধু নকল নিয়ে খুসী হয় না সে খুঁজে খুঁজে ফেরে অনাবিষ্কৃত রয়েছে যা তাকে! শিল্পীর মন দেহপিঞ্জরের অন্তঃপুরে যাদুঘরের মরা পাখীর মতো দিন রাত সুখে দুঃখে সমভাবে থাকে না—সে বোধ করে স্বপন দেখে স্বপন রচনা করে' চলে অসংখ্য অদ্‌ভুত অতি বিচিত্র! নিছক ঘটনা আর নিছক কল্পনা এ দু'য়েরই কথা শাস্ত্রকার লিখলেন। এক দিকে বলা হ'ল "সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্", দর্পণে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তার চেয়ে সচল সশ্বাস,—রূপে প্রমাণে ভাবে লাবণ্যে সাদৃশ্যে বর্ণিকাভঙ্গে সম্পূর্ণ চিত্র আর কিছুই হ'তে পারে না। কিন্তু সবাই তো এ বিষয়ে এক মত হ'তে পারলে না; এর ঠিক উল্টো রাস্তা ধরে' একদল শাস্ত্রকার বল্লেন—"অপি শ্রেয়স্করং নৃণাং দেববিম্বমলক্ষণম্। সলক্ষণং সত্যবিম্বং ন হি শ্রেয়স্করং সদা॥" কিছুর প্রতিকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলা হ'ল—"মানবাদীনামস্বর্গ্যাণ্যশুভানি চ।" শাস্ত্র পড়ে' শিল্পী হ'তে চল্লে এই দোটানা সমস্যায় পড়ে' হাবুডুবু খেতে হবে; নানা মুনির নানা মত! মানুষের শিল্প যে নানা রাস্তা ধরে' চলেছে তার অন্ধি সন্ধি এত যে তার শেষ নেই, বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান ঘটনা এবং অঘটন কল্পনা এই দুই খাত রেখে চলেছে শিল্পের ধারা—কিন্তু এই দুয়েরই গতি কোন্ দিকে—রসসমুদ্রের দিকে, এ দুয়েরই উৎপত্তি কোন্ খানে–রসের উৎসে, সুতরাং ভারত শিল্পই বল আর যে শিল্পই বল রসের সংস্পর্শ নিয়ে তাদের বিচার। শিল্পে বাস্তবিকতা কিম্বা অবাস্তবিকতা কোন্‌টা প্রয়োজনীয় একথার উত্তর শাস্ত্রকার তো দিতে পারে না! শাস্ত্র হ'ল নানা

মুনির নানা মতের সমষ্টি এবং নানা শিল্পের নানা পথে পদক্ষেপের হিসাবের খাতা মাত্র, কাজেই শাস্ত্র পড়ে' শিল্পের স্বরূপ কেমন করে' ধরা যাবে? সমুদ্র ঘাঁটলে মাছ ওঠে নুন ওঠে মুক্তাও ওঠে কিন্তু হীরক ওঠে না, সেখানে মাটি ঘাঁটতে হয় যে মাটিতে শিল্পী জন্মেছে ও গড়েছে। শাস্ত্র ঘাঁটলে শাস্ত্রের বচন পাই শাস্ত্রজ্ঞান পাই, শিল্পীর রচনা-রহস্য ও শিল্পজ্ঞান শিল্পের মধ্যেই গোপন রয়ে' যায়। শাস্ত্রকার যখন ছিল না এমন দিনও তো পৃথিবীতে একদিন এসেছিল, সে সময়কার শিল্পী শাস্ত্র না পড়েও শিল্পজ্ঞান লাভ করে গেছে—জগতের সমস্ত আদিম অধিবাসীদের শিল্পকলা এর সাক্ষ্য দিচ্ছে—এই অাদিম শিল্পচর্চা করে' দেখি মানুষ জলের রেখা, ফলের ডৌল, পাখীর পালক, মাছের আঁষ এমনি নানা জিনিষের স্মৃতি কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে সাজাচ্ছে ঘাটি-বাটি কাপড়-চোপড় অস্ত্র-শস্ত্র সমস্ত জিনিষের উপরে এমন কি মানুষের নিজের গায়ের চামড়ায় পর্যন্ত স্মৃতি ও কল্পনার জাল পড়েছে! মানুষের চিরসহচরী এই কল্পনা ও স্মৃতি, শিল্পের দুই পার্শ্বদেবতা! বিদ্যমান জগৎ বাঁধা জগৎ, আর কল্পনার জগৎ সে অবিদ্যমান, কাজেই বাঁধা জগতের মতো সসীম নয়। অনন্ত প্রসার মানুষের কল্পনার,—তেপান্তর-মাঠের ক্ষীর-সমুদ্রের ইন্দ্রলোক-চন্দ্রলোকের। বিদ্যমান জগৎ নির্দিষ্ট রূপ পেয়ে আমাদের চারিদিকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—তাল, বট, তেঁতুল, কোকিল, ময়ূর, কাক, গরু, বাছুর, মানুষ, হয়, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র এরা কালের পর কাল একই রূপ একই ভঙ্গি একই সুর নিয়ে খালি আসা যাওয়া করছে। পৃথিবীটা খুব বড় এবং এখনো মানুষের কাছ থেকে আপনার অনেক রহস্য সে লুকিয়ে রেখেছে, তাই এখনো মানুষ উত্তরমেরু ধবলগিরি অতিক্রম করার কল্পনা করছে, দুদিন পরে যখন এ দুটো জায়গাই মানুষের জানা জগতের মধ্যে ধরা পড়বে তখন মানুষের চাঁদ ধরার কল্পনা সত্য হয়ে উঠবার দিকে যাবে! এমনি বাস্তব এবং কল্পনা, কল্পনা ও বাস্তব এই দুটি পদচিহ্ন রেখে চলেছে ও চলবে মানুষ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এবং তার পরেও নতুন যুগে যে সব যুগ এখনো মানুষের কল্পনার মধ্যেই রয়েছে! অঘটিত ঘটনা অবিদ্যমান সমস্ত কল্পনা আজ যেগুলো মানুষের মনোরাজ্যের জিনিষ সেগুলো কালে সম্ভব হয়ে উঠবার প্রতীক্ষা করছে না, জোর করে' একথা কে বলতে পারে? এক যুগের খেয়ালী যা কল্পনা করলে আর এক যুগে সেটা বাস্তব হয়ে উঠলো, এর প্রমাণ মানুষের ইতিহাসে বড়

অল্প নেই, কতযুগ ধরে পাখীদের দেখাদেখি মানুষ শূন্যে ওড়ার কল্পনা করে এল, এতদিনে সেটা সত্যি হয়ে উঠলো কিন্তু এতেও মানুষের কল্পনা শেষ হ'ল না, ওড়ার নানা ফন্দি ডানায় বিনা ডানায়, এমনি নানা কল্পনায় মানুষের মন বিদ্যমানকে ছেড়ে চল্লো অবিদ্যমানের দিকে। হঠযোগ থেকে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ইষ্টিম গাড়ি, দুচাকার গাড়ি, শেষে হাওয়া গাড়ি এবং উড়োজাহাজে কল্পনা এসে ঠেকেছে কিন্তু ওড়ার কল্পনা এখনো শেষ হয় নি, রাবণের পুষ্পক রথে গিয়ে ঠেকলেও মানুষ আরো অসম্ভব অদ্ভুত রথের কল্পনা করবে না তা কে বলতে পারে? দেশলাইয়ের কল্পনা চকমকি থেকে এখন মেঘের কোলের বিদ্যুতে গিয়ে ঠেকেছে কিন্তু এখনো নিস্প্রভ আলো তাপহীন আগুন এ সমস্তই অবিদ্যমানের কোলে দুলছে একদিন বিদ্যমান হবার প্রতীক্ষায়। অবিদ্যমান হচ্ছে বিদ্যমান সমস্তের জননী, অজানা প্রসব করছে জানা জগৎ, অসম্ভব চলেছে সম্ভব হ'তে কল্পনার সোপান বেয়ে। "অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, সমস্তই চিহ্নবর্জিত ছিল, অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারায় সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন, বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থানে নিরূপণ করিলেন।" আগে সৃষ্টির কল্পনা তবে তো সৃষ্টি! ইউরোপের স্বরগ্রামে শুনেছি আগে নিখাদ স্বরটা একেবারে অজ্ঞাত ছিল হঠাৎ এক খেয়ালী সেই অজানা সুরের কল্পনা ধরে বসলে এবং তারি সন্ধানে মরীচিকালুব্ধের মতো ছুটলো অবিদ্যমান যে সুর তাকে বিদ্যমান করতে চেয়ে! সঙ্গীত তখন ইউরোপে পাদ্রীদের হাতে ধর্মের সেবায় বাঁধা রয়েছে, ছয় সুরের বেশী আর একটা সুরের কল্পনা পাদ্রী সঙ্গীতবেত্তার কাছে অমার্জনীয় ছিল, খেয়ালী লোকটার নির্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা হয়ে গেল, সে একটা কাল্পনিক সুরের জন্যে ঘর ছাড়লে, দেশ ছাড়লে, নির্যাতন সইলে, তারপর যে সুর কল্পনায় ছিল তাকে বিদিত হ'ল সে নিজে এবং বিদিত করে' গেল বিদ্যমান জগতে। এমনি একটার পর একটা সুরের পাখী ধরে গেছে কল্পনার জালে মানুষ, অনাহতকে ধরে গেছে আহতের মধ্যে।

মানুষের সমস্ত কাজে, কর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কল্পনাটা প্রথম তারপর বাস্তব,—এই হ'ল রচনার ধারা ও রীতি। কল্পনাটা মানুষের মধ্যে প্রবল শক্তিতে কাজ করে; এই শক্তি সৃষ্টি করার দিকে মানুষের দৈহিক

ও মানসিক আর সমস্ত শক্তিকে উদগ্র করে' দেয়। মাতাল ও পাগলের দেহ বিকল হয়ে গেল, উৎকট কল্পনা তাদের বিকট মূর্তিতে বিদ্যমান হ'ল; কিন্তু যে সুস্থ সাধনের দ্বারায় বিরাট কল্পনা সমস্তকে স্মরণের মধ্যে ধারণ করতে সমর্থ হল সেই বীর হল রূপ ও অরূপ দুই রাজ্যের রাজা, সে হ'ল বীর, সে হ'ল কবি, সে হ'ল শিল্পী, সে হ'ল ঋষি, আবিষ্কর্তা, গুণী, রচয়িতা। কল্পনাপ্রবণতা হ'ল মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা, কেননা দেখি কল্পনা তার আশৈশব সহচরী । খেয়াল জিনিষটা বিশ্বসংসারকে পুরোনো হতে দিচ্ছে না মানুষের কাছে, একই আকাশের তলায় একই ঋতু-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা পৃথিবীতেই চলি-বলি খাই-দাই ঘুমোই, কিন্তু কল্পনায় গড়ে চলি খেলা করি বিচরণ করি আমরা নতুন নতুন জগতে চিরযৌবন, চিরবসন্তের স্বপ্ন নিয়ে। বস্তুজগতের এইটুকু ঘটনার স্মৃতিগুলো বড় হয়ে ওঠে কল্পনায়। মানুষের এত বড় ঐশ্বর্য এই কল্পনা একে হারালে তার মতো দীন ও অধম কে? কোন দিকে অগ্রসর হবার রাস্তা তার বন্ধ হ'ল, কায়ার মায়াহীন প্রাচীরের সুদৃঢ় বন্ধনে সে বন্দী রইলো "সশ্বাস ইব" কিন্তু সশ্বাস মোটেই নয়।

কাব্যে পুনরুক্তি একটা মহৎ দোষ; পুনঃ পুনঃ কেবল পুনরুক্তি সেইখানেই চলে যেখানে উক্তকে সমর্থন করতে হয় একটা কথা বারবার বলে। যে ছবি হয়ে গেছে তাকে আবার এঁকে কি লাভ, জানালা দিয়ে দিনরাত চোখে পড়ছে যে আকাশ ও মাঠ ঘর বাড়ি সেটার সঠিক প্রতিচ্ছবি কি দরকার মানুষের, যদি না সে স্মৃতির সঙ্গে কল্পনাকে এক করে দেখায়। কল্পিত থেকে বঞ্চিত বাস্তবটা হ'ল মানুষের কাটা হাত পায়ের মতো বিশ্রী জিনিষ, মৃতদেহ সেও স্মৃতি জাগায় কল্পনা জাগায় কিন্তু আসলের নকল কিম্বা আসলের থেকে বিচ্ছিন্ন যেটা সেটা প্রাণে বাজে না, বিশ্রী রকমে কানে বাজে চোখে বাজে। বিদ্যমান বস্তুর প্রতিকৃতি প্রতিবিম্ব সঠিক নকল ইত্যাদির মধ্যেই যারা আর্টকে বন্ধ করে স্মৃতি ও কল্পনার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায় কিম্বা অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের সম্পর্ক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উন্মত্তকে অবাধ্যতা দিয়ে ছেড়ে দিতে চায় অনির্দিষ্ট পথে তারা শাস্ত্রকার হ'লেও তাদের কথা শোনায় বিপদ আছে। এমনে লোক আছে যার নেশায় চোখ এমন বুঁদ হয়ে গেছে যে দিন কি রাত, উত্তম কি অধম, বস্তু কি অবস্তু

সব জ্ঞান তার লোপ পেয়েছে—টলে' পড়ার দিকেই যার ঝোঁক; আবার এমনো লোক আছে যার চোখে রঙ্গ রসের নেশা একেবারেই লাগলো না, সে গট্ হয়ে বসে আছে সাদা চোখে সাদা-সিধে লোকটি, একজন বকে' চলেছে প্রলাপবাক্য আর একজন কিছুই বলছে না বা বলছে সাদা কথা, —শিল্পজগতে এই দু'জনের জন্যই স্থানাভাষ। নাটকের মধ্যে যেখানে মাতলামি দেখাতে হয় সেখানে একটা সত্যিকার মাতাল এনে ছেড়ে দিলে সে কুকাণ্ড বাধায়, অন্যদিকে আবার যার কোন কিছুতে মত্ততার লেশ নেই তাকে এনে রঙ্গমঞ্চে ছেড়ে দিলেও সেই বিপদ, দুই পক্ষই যাত্রা মাটি করে' বসে' থাকে। মাতলামির রং যার চোখে ইচ্ছা মতো আসে যায়, নেশা যার চোখের আলো মনের গতিকে নিস্তেজ করে' বাস্তব অবাস্তব দুয়ের বিষয়ে অন্ধ ও আতুর করে দেয় না, সেই হয় আর্টিষ্ট, মনকে মনের দিকে কল্পনাকে বাস্তবের স্মৃতির দিকে অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের দিকে অভিনয়ন করেন আর্টিষ্ট 'সশ্বাস ইব' স-শে-মি-রা অবস্থায় নয়, মোহগ্রস্ত বা জীবন্মৃত নয় কিন্তু রসের দ্বারায় সঞ্জীবিত প্রস্ফুটিত।

শিল্পশাস্ত্র ঘাঁটতেই যদি হয় তবে গোড়াতেই আমাদের দুটো বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে- কোনটা মত এবং কোনটা মন্ত্র এ দুয়ের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণাটি নিয়ে কাজ করতে হবে। মত জিনিষটা একজনের, দশজনে সেটা মানতে পারে নাও মানতে পারে, একের কাছে যেটা ঠিক অন্যের কাছে সেটা ভুল, নানা মুনির নানা মত। মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। মত একটা লোকের অভিমতকে ধরে প্রচারিত হল আর মন্ত্র প্রকাশ করলে আপনাকে সব দিক দিয়ে যেটা সত্য সেইটে ধরে। শিল্পশাস্ত্রে মত এবং মন্ত্র দুটোই স্থান পেয়েছে, মতকে ইচ্ছা করলে শিল্পী বর্জন করতে পারেন কিন্তু মন্ত্রকে ঠেলে ফেলা চলে না।

"যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগানাং যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ॥"

খণ্ড খণ্ড অনেকগুলো সত্য দিয়ে এটা বলা হ'লেও সমস্ত শ্লোকটা কলাবিদ্যার সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড অহমিকা নিয়ে মত আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। যে রাজভক্ত তার কাছে ক্ষিতীশচন্দ্র হলেন শ্রেষ্ঠ কিন্তু এমন

অনেক ফটিকচাঁদ আছে রাজাও যার পায়ে মাথা লোটায়। এ ছাড়া চিত্রকলাই সকল কলার শ্রেষ্ঠ কলা একথা একেবারেই অসত্য কেননা গীতকলা কাব্যকলা নাট্যকলা এরা কেউ কমে যায় না! মতের মধ্যে এই একটা মস্ত ফাঁক আছে, মন্ত্রে কিন্তু তা নেই দেখ—শরীরেন্দ্রিয় বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কা ভাবাঃ বিভাবজনিতশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ—এ সত্যের দ্বারায় পরখ করা জিনিষ, এ মন্ত্র-শিল্পীকে সুমন্ত্রণ দিচ্ছে ভাব ও তার আবির্ভাব সম্বন্ধে, অতএব এতে কারু দুইমত হবার কথা নয় কিন্তু "দৌর্বল্যং স্থূলরেখত্বং অবিভক্তত্বমেব চ। বর্ণানাং সঙ্করশ্চাত্র চিত্রদোষা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" এটা একটা লোকের মত, মন্ত্রের মতো খুব সাচ্চা জিনিষ নয়, এর মধ্যে অনেকখানি সত্য এবং মিথ্যাও লুকিয়ে আছে, দৌর্বল্য, স্থূলরেখত্ব অবিভক্তত্ব বর্ণসঙ্করত্ব হ'ল চিত্রদোষ কিন্তু কিসের দৌর্বল্য কিসের অবিভক্তত্ব টীকা না হলে বোঝা দুষ্কর, তা ছাড়া এসব দোষ যে চিত্রে কোন কাযে আসে না তা নয় এ সবই চাই চিত্রে, বর্ণসঙ্কর না হ'লে মেঘলা আকাশ সূর্যোদয় এমন কি কোন কিছুই আঁকা চলে না, অমিশ্র বর্ণ সে এক ছবি দেয়। মিশ্রবর্ণ সে অন্য ছবি দেয়, ফুলের বোঁটার টান দুর্বল গাছের গুঁড়ির টান সবল দুর্বল স্থূল, সূক্ষ্ম সব রেখা সব বর্ণ ভাব ভঙ্গি মান পরিমাণ সুর এমন কি বেসুর তা তো অনেক সময় দোষ না হয়ে গুণই হয়ে ওঠে গুণীর যাদুমন্ত্রে।

এইবার শিল্পের একটা মন্ত্র দেখ, পরিষ্কার সত্য কথা—"রূপভেদা: প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্॥ সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম॥" ভারতবর্ষ থেকে ওদিকে আমেরিকা কোন দেশের কোন চিত্রবিদ এর উল্টো মানে বুঝে, ভুল করবে না, কেননা চিত্রকরের কারবারই হল এই ছটার কোনটা কিম্বা এর কোন কোনটাকে নিয়ে। একটা চিত্রে পুরোমাত্রায় এ ছয়টা পাবো না নিশ্চয় কিন্তু দুটো চারটে চিত্র ওল্টালেই বুঝবো কেউ রূপ-প্রধান কেউ প্রমাণ-সর্বস্ব, কেউ ভাবলাবণ্য-যুক্ত, কেউ বর্ণ ও বর্ণিকাভঙ্গে মনোহর, কেউ যড়ঙ্গের দুটো নিয়ে চিত্র, কেউ পাঁচটা নিয়ে হয়েছে ছবি।

মত অপেক্ষা রাখে সমর্থনের, মন্ত্র যা তা নিজেই সমর্থ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও সত্যের দ্বারায় বলীয়ান। ধর্মের যেমন-তেমন শিল্পকলাতেও মানুষ মতও

চালিয়েছে মন্ত্রও দিয়েছে। তার মধ্যে মত গুলো দেখি কোনটা চলেছে, কোনটা চলেনি এবং মত ধরে কোন শিল্প ম'রলে, কোনটা আধমরা হয়ে রইলে, কিন্তু শিল্পের মূল মন্ত্রগুলো সেই পৃথিবীর আদিমতম এবং নতুনতম শিল্পে সমানভাবে কায করে চল্লো। মত, খণ্ডন হ'ল মহাকলরবের মধ্যে কিন্তু মন্ত্রের সাধন করে চল্লো মানুষ নীরবে, মানবের ইতিহাসে এটা নিত্য ঘটনা, মানুষের গড়া শিল্পের ইতিহাসেও এর প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে। সাদা মানুষ, সে কালে মানুষ সম্বন্ধে শক্ত মত নিয়ে এগোয় কিন্তু কালো মানুষ পদে পদে সেই মতের সমর্থন করে চলে না কিন্তু মানুষ যেখানে মানুষের কাছে মন্ত্র নিয়ে এগোয়—মানুষে মানুষে অভেদমন্ত্র দয়ার মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র— সেখানে মতভেদ হয় না সাদায় কালোয়, তেমনি শিল্পের বাস্তব ও কল্পনা মানুষি ও মানসী, প্রতিকৃতি ও প্রকৃতি, reality ও ideality এই সব নানাদিকে যে সব মতগুলো আছে তা নিয়ে এর সঙ্গে ওর বিবাদ কিন্তু কলাবিদ শিল্প সাধক বাস্তব জগতের এবং কল্পনা জগতের মধ্য থেকে শিল্পের যে সব মন্ত্র আবিষ্কার করেছে সেগুলো গ্রহণ সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক অথবা মতামতের কথা কোন দলের কেউ তোলে না। বৌদ্ধযুগ থেকে আরম্ভ করে মোগল এবং ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত আমাদের কলাবিদ্যা সমস্ত এমন কি কলাবিদদের আকৃতি প্রকৃতি পর্যন্ত নানামতের চাপনে রকম রকম লক্ষণে চিহ্নিত হয়েছে। এই যে আমাদের নানা কলাবিদ্যার নানা আকৃতি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা এগুলো কোন এক কালের শাস্ত্রমত বা লোকমত বা ব্যক্তিবিশেষের মতের সঙ্গে মেলালে দেখবো নিখুঁৎ মিলছে না—অজন্তার অতুলনীয় চিত্র সে হয়ে যাচ্ছে চিত্রাভাষ, মোগল শিল্প হয়ে যাচ্ছে যবন-দোষ-দুষ্ট এবং তার পরের শিল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে সকল দোষের আধার। চীন দোষ, জাপান দোষ, ব্রিটন দোষ, জার্মাণ দোষ,—দোষের অন্ত নেই মতের কাছে। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের মধ্য থেকে শিল্পের মন্ত্রগুলো বেছে নাও এবং সেই সকল মন্ত্র দিয়ে পরখ কর, এক ভারত শিল্পের অসংখ্য অবতারণা ঠিক ধরা যাবে-—ভারত শিল্পের সেই সত্যরূপ যেটি নিয়ে ভারত শিল্প বিশ্বের শিল্পের সঙ্গে এক এবং পৃথক। কোন শিল্পের স্বরূপ শাস্ত্রমতের মধ্যে ধরা থাকে না সেটা শিল্পের নিজের মধ্যেই ধরা থাকে। ভারত শিল্পের কেন সব শিল্পের প্রাণের খোঁজে যে শিক্ষার্থীরা চলবেন তাঁদের এই মত ও মন্ত্রের পার্থক্য প্রথমেই হৃদয়ঙ্গম করা চাই মতকে মন্ত্র বলে ভুল করলে

চলবে না। যুদ্ধের সময় দুপক্ষের সেনাপতি মত দেন, কোন পথে কি ভাবে ফৌজ চলবে, ব্যুহ রচনা করবে এবং সেই মতো ম্যাপ প্রস্তুত করে' নিয়ে ফৌজের চালনা হয়। শিল্পশাস্ত্রকারের মতগুলো এই ম্যাপ, দেশের শিল্প কখন কি মূর্তি ধরেছিল তার প্রথা ও প্রণালীর সুস্পষ্ট ইতিহাস শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায় বলে তার মধ্যে কোন একটা পথে যদি আজ আমরা শিল্পকে চালাতে চাই তো এই সব প্রাচীন মত শিল্পে পেটেণ্ট নেওয়ার বেলা খুব কাজে আসবে, দেশের প্রাচীন artএর ইতিহাস লিখতে কাজে আসবে, গত artএর নূতন থিসিস লিখতে কাজে আসবে, এমন কি artist না হলেও art সম্বন্ধে original research লেখার পক্ষেও এই সব মত যথেষ্ট রকম ব্যবহারে লাগবে কেননা এদের copyright বহুদিন শেষ হয়েছে,–কিন্তু শিল্পকে যারা চায় তাদের কাছে এই সব মত বেশী কাজে আসবে না। শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে এমন কি বৈদ্যশাস্ত্রের বৈষ্ণব শাস্ত্রের এক কথায় নিখিল শাস্ত্রের অপার সমুদ্রের তলায় ও শিল্পেরই মধ্যে যে সব মন্ত্রগুলো এখানে ওখানে লুকিয়ে আছে সেগুলো উপকারে লাগবে। যে জানতে চায় শিল্পকে তাকে মত ও মন্ত্র দুই উদ্ধার করে করে চলতে হয়। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের ম্যাপ ধরে চল্লেই যুদ্ধে জিৎ হয় না, এটা পাকা সেনাপতি পাকা সেপাই দু'জনেই বোঝে, ম্যাপের সীমানার পরে যে অনির্দিষ্ট সীমানা তার কল্পনা সেনাপতিও ধরে থাকে সিপাহীও ধরে থাকে এবং বীরত্বের যে একটি মন্ত্র দুঃসাহস তাকে মনে পোষণ করে অগ্রসর হয়, জিতলে পুরস্কার হারলে তিরস্কার!" নূতনকে জয়ের কল্পনা তাদের মনকে দোলায়, ম্যাপে দাগা মতামতের উল্টোপথে অনেক সময়ে তারা চলে মন্ত্রের সাধনে শরীর পাতনে, হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে তারা মন্ত্রণা করে সেনা ও সেনাপতি, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ বিপথ অতিক্রম করে গিয়ে দেয় হানা অজানা পুরীর দরজায়, হঠাৎ দখল হয়ে যায় একটা রাজত্ব যেন মন্ত্রবলে! শিল্পকে পেলে তো কথাই নেই, শিল্পের মন্ত্রগুলো পেলে শিল্প পেতে দেরী হয় না, কিন্তু মতগুলোতে পেয়ে বসলে শাস্ত্রমতে যাকে পাওয়া বলে তাকেই পায় মানুষ, শিল্প রচনাকে পায় না মনোমত মনোগত এ সবের কল্পনাকেও পায় না।

দৃষ্টি ও সৃষ্টি

“Those organs which guide an animal are under man’s guidance and control.”
–Goethe

লক্ষ্য করবার জন্যেই হল চোখ, শব্দ ধরবার জন্যেই হল কান, হাত পা রসনা সব কটাই হল রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ ধরে’ বিশ্বের চারিদিককে বুঝে নেবার জন্যে। সজীব সব মানুষেরই বুদ্ধির চারিদিকে ইন্দ্রিয় সকল নানা শক্তিশেল নিয়ে খবরদারি কাযে দিনরাত ব্যস্ত রইলো, এই হল স্বাভাবিক ব্যাপার; অথচ অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, কিম্বা দশরথের শব্দভেদ এমনি নানা রকম ভেদবিদ্যার কৌশল শিক্রে পাখী থেকে আরম্ভ করে শিকারী মানুষে যখন লাভ করলো, দেখলাম তখন সেই জীব অথবা মানুষ নিজের চোখ কান হাত পা ইত্যাদিকে অস্বাভাবিক রকমে অসাধারণ শক্তিমান করে তুল্লে;—এই কথাই বলতে হয় আমাদের। ছেলেকে অক্ষর চিনতে শেখালে, বই পড়তে শেখালে তবে সে আস্তে আস্তে চোখে দেখতে পায় কি লেখা আছে, বুঝতে পারে পড়াগুলো, এবং ক্রমে নিজেই রচনা করার শক্তি পায় একদিন হয়তো-বা। যে মানুষ কেবল অক্ষর পরিচয় করে চল্লো, আর যে অক্ষরগুলোর মধ্যে মানে দেখতে লাগল, আবার যে রচনার নির্মাণ-কৌশল ও রস পর্যন্ত ধরতে লাগলো এদের তিন জনের দেখা শোনার মধ্যে অনেকখানি করে পার্থক্য যে আছে তা কে না বলবে! কাযেই দেখি—শিল্পই বল আর যাই বল কোন কিছুতে কুশল হয় না চোক হাত কান ইত্যাদি, যতক্ষণ এদের স্বাভাবিক কার্যকরী চেষ্টাকে নতুন করে সুশিক্ষিত করে তোলা না যায় বিশেষ বিশেষ দিকে—বিশেষ বিশেষ উপায় আর শিক্ষার রাস্তা ধরে। এই শিক্ষার তারতম্য নিয়ে আমাদের সচরাচর মোটামুটি দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পীর ও গুণীর দেখাশোনার পার্থক্য ঘটে। ছবি কবিতা সুর-সার প্রভৃতি অনেক সময়ে যে আমাদের কাছে হেঁয়ালীর মতো ঠেকে তা দুই দলের মধ্যে এই পরখ ও পরশের পার্থক্য বশতঃই হয়। কথাই আছে—‘কবিতারসমাধুর্য্যম্ কবির্বেত্তি’; ঠিক সুরে সুর মেলা চাই, না হলে যন্ত্র বল্লে ‘গা’, কণ্ঠ বলে উঠলো ‘ধা’।

জেগে দেখার দৃষ্টি ধ্যানে দেখার দৃষ্টির সঙ্গে মিলতে তো পারে না, যতক্ষণ না ধ্যানশক্তি লাভ করাই নিজেকে। এই জন্যেই কবিতা সঙ্গীত ছবি এ

সবকে বুঝতে হলে আমাদের চোখ কানের সাধারণ দেখাশোনার চালচলনের বিপর্যয় কতকটা অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারায় ঘটাতে হয়, না হলে উপায় নেই। মানুষের সৃষ্টি বুঝতে যদি এই নিয়ম হল তবে সৃষ্টিকর্তার রচনাকে পুরো রকম বুঝে-সুঝে উপভোগ করার ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার যে অপেক্ষা রাখে তা বলাই বাহুল্য।

"The scene which the light brings before our eyes is inexpressively great, but our seeing has not been as great as the scene presented to us; we have not fully seen! We have seen mere happenings, but not the deeper truth which is measureless joy"—Rabindranath

মোটামুটি দৃষ্টি,—তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি—এর মধ্যে মোটামুটি রকমের কার্যকরী দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সমস্ত জীবেরই থাকে; তার উপরে উঠতে হলেই শিক্ষা ও অভ্যাস দিয়ে চক্ষুকর্ণের সাধারণ দেখা শোনার মধ্যে অদল-বদল কিছু না কিছু ঘটাতেই হয়। শিক্‌রে পাখী কতবার তার শিকার হারায় তবে তার চোখ এবং ঠোঁট আর আঙ্গুলের নখরগুলো সুশিক্ষিত হয়ে ওঠে মেঘের উপর থেকে লক্ষ্যভেদ করতে,—একেই বলে ধরার কায়দা, দেখার কায়দা। এই কায়দা ইন্দ্রিয়সকল লাভ করে অনেক দিনের শিক্ষা ও অভ্যাসে। চা খাবার সময় রুটির টুকরো যখন ফেলে দেওয়া যায়, তখন দেখি কাকগুলো সবাই একই কায়দায় সেগুলো এসে ধরে—মাটিতে রুটি পড়েছে যখন, তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ঠোঁটে করে সেটা টপ্‌ করে তুলে নেওয়াই দেখি সব কাকেরই দস্তুর; কিন্তু চিলগুলো সাঁ করে উড়ে এসে মাটিতে রুটি পৌঁছতে না পৌঁছতে লুফে নিয়ে পালায়। এই নতুন কায়দা আমার সাম্‌নে একটা কাককে দিনে দিনে অভ্যাস করে নিতে এই সেদিন দেখলেম এবং লক্ষ্যভেদ বিদ্যার দখলের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কাকের দেখাশোনা চালচলন সমস্তই উল্টে-পাল্টে গেল তাও দেখলেম। শুধু ঐ একটুখানি শিক্ষা আর অভ্যাসের দরুণ কাকের মোটা দৃষ্টি বা স্বাভাবিক দৃষ্টি ও চালচলনের ওলট-পালট যদি কাকটা না ঘটাতো, তবে সব কাকদের মধ্যে সে অর্জুন হয়ে উঠতে পারতো না, কিম্বা সময়ে সময়ে চিলটিকেও সে হারিয়ে দিতে পারতো না রুটির লক্ষ্যভেদের সভায় আন্দাজের পরীক্ষায়। কুরু-পাণ্ডবে মিলে একশো পাঁচ ভাই, দ্রোণাচার্য

যখন তাদের আন্দাজের পরীক্ষা নিলেন তখন দেখা গেল একশো চার ভায়ের শুধু চোখই আছে,—দৃষ্টি আছে কেবল একমাত্র অর্জুনের! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের দিন লক্ষ্যভেদের সময় অর্জুনের এই দৃষ্টিরহস্যের হিসেব আরো পরিষ্কাররূপে পরীক্ষা হয়েছিল। পৃথিবীর ধনুর্ধর একত্র হল স্বয়ম্বরে—কৃপ কর্ণ নানা বীর, কিন্তু লক্ষ্যভেদের বেলায় কারো চোখ দ্রৌপদীর রূপের প্রভা দেখলে, কারো দৃষ্টি নিজের গলার মণিহারের চমক্ লক্ষ্য করলে, কিন্তু লক্ষ্যভেদের যা আসল সামগ্রী সেটা জলের তলায় ঘূর্ণ্যমান সুদর্শন চক্রের প্রতিবিম্বের আড়ালে একটি বিন্দুর আকারে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেটার বিষয়ে একেবারেই রাজারা অন্ধ রইলেন, এক অর্জুনের দৃষ্টি সেটা লক্ষ্য করলে ও বিঁধলে। অস্থির হয়ে ভ্রমণ করছে এই দুটি মাত্র আমাদের চোখের দৃষ্টি, একটু অন্ধকারে ঝাপসা দেখে, বেশী আলো পেলেও ঝলসে যাবার মতো হয়, দূরবীণ না হলে খুব দূরের জিনিষ দেখাই হয় না আমাদের! আবার যখন তিলকে দেখি তখন তালকে দেখি না, তাল দেখতে গেলে তিল বাদ পড়ে যায়। তা ছাড়া দৃষ্টি আমাদের সামনেই চলে, পিঠের দিকে যা ঘটছে একেবারেই দেখা সম্ভব হয় না যে চোখ এখন আছে তার দ্বারা। ঘড়ি যেমন শুধু ঘণ্টা প্রহর গুণে গুণে আমাদের জানিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারে না, গ্রীষ্মের দিন কি শীতের, অথবা দিন দুই প্রহর কি রাত দুই প্রহর, এটা জানাবার সাধ্যই হয়না যেমন ঘড়ির—যতক্ষণ না ঘড়ির মধ্যে কোন একটা বিপর্যয় শক্তি সঞ্চার করে দেওয়া হচ্ছে, তেমনি এই চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটু অদল-বদল না ঘটাতে পারলে চোখ আমাদের ওঠা-বসা চলা-ফেরা এমনি কতকগুলো নির্দিষ্ট কাযের সহায় হয়ে যান্ত্রিক ভাবে খবরদারী করতেই নিযুক্ত থাকে। নিত্য চলাচলের পক্ষে যতখানি দরকার শুধু ততটুকু দেখাই, দিনরাতের মধ্যে বস্তু ও ঘটনাগুলোর মোটামুটি খবর পৌঁছে দেওয়াই হয় এদের কায; এই লোক অমুক, ও অমুক, নকিবের মতো এইটুকু ফুকরে যায় চোখ—অমুকের সম্বন্ধে তন্ন তন্ন খবর নেবার অথবা দেবার সময় নেই। একটা গাড়ি এল, চোখ কান চট্ করে সেটা ধরলে—মোটামুটি গাড়ির শব্দ, আর একটা আবছায়া, খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই। গলির মোড়ে একটা ভিড় জমেছে—তার মাঝে পাহারাওলার লাল পাগড়ীর লাল রংএর ঝাঁজটা মাত্র লক্ষ্য করেই চোখ—মায় যার চোখ তাকে নিয়ে—কোন্ গলি ঘুঁজি দিয়ে কেমন করে যে

একেবারে গড়ের মাঠে হাজির হয় তার কোন হিসেব দিতে পারে না! খুব বাঁধা ও খুব প্রয়োজনীয় কাযের ভার নিয়ে দরওয়ান ব্যস্ত থাকে; অভ্যাগত লোককে দেউড়ি ছেড়ে দেবার সময় শুধু মানুষটা চেনা কি অচেনা, ছোকরা কি বুড়ো এমনি মোটামুটিভাবেই দেখে নিয়েই তার কায শেষ। ঘুমোচ্ছি এমন সময় ঘরে খট্ করে শব্দ হল, কি গায়ে কিছু স্পর্শ করলে, অমনি কান হাত পা ইত্যাদি চট্ করে বুদ্ধিকে গিয়ে খবর দিলে—যন্ত্রের মতো সময় অসময় জ্ঞান নেই! ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নিমেষে নিমেষে চোখ দেউড়ির ঝাঁপ খুলে বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে আর নোট্ দিচ্ছে মানুষকে—এ হল তা হল, এ গেল সে গেল, এটা দেখা যাচ্ছে, ওটার খবর এখনো আসেনি! নিত্য নৈমিত্তিক কাযের অনেকখানি এই রকম মোটামুটি যান্ত্রিক রকমের দৃষ্টি দিয়েই চোখ আমাদের সম্পন্ন করে যাচ্ছে, এ ছাড়া অনেকখানি কায একেবারে চোখে না দেখে হাত পা ও গায়ের পরশ এবং পরখ দিয়ে একটু, আর সব ইন্দ্রিয়ের পরখের অনেকখানি মিলিয়ে করে চলেছি আমরা। জুতো পরায় জামা পরায়, চোখের পরখের চেয়ে গায়ের পরশ বেশি সাহায্য করে—কোন্‌টা আমার জুতো বা জামা চিনিয়ে দিতে। মানুষের নিত্য জীবন যাত্রার মধ্যে নিবিষ্টভাবে রয়ে-বসে দেখা এত অস্বাভাবিক আর বিরল যে কাযের মধ্যে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ানো, নয়নভরে কিছু দেখে নেওয়া, স্থির হয়ে কিছু উপভোগ করার সময় পায় না বল্লেই হয় সাড়ে পনেরো আনা লোকের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি,—এটা অত্যন্ত অদ্‌ভূত কিন্তু অত্যন্ত সত্য ঘটনা। এমন ছাত্র নেই যে প্রতি সন্ধ্যায় গোলদীঘির ধারে জমায়েৎ হয়ে দুচার ঘণ্টা না কাটায়, কিন্তু তাদের প্রশ্ন কর—গোলদীঘিটা গোল না চৌকা? হঠাৎ কেউ উত্তর দিতে পারবে না, গোলদীঘির লোহার রেলিং ত্রিশূলের আকার না বর্শার ধরণ? একশ'র মধ্যে একজন ছাত্র চট্ করে বলতে পারে কি না সন্দেহ। একটা রেলিং আছে এইটুকুই টুকে আসছে চোখ মনের নোট্ বইখানায় যন্ত্রের মতন, রেলিংএর কারুকার্য গড়ন পেটন নিবিষ্ট হয়ে দেখার প্রয়োজন এবং অবসরের দরকারই বোধ করেনি চোখ। খুব ছোট থেকে খুব বড় বয়সেও আমাদের বুদ্ধির কোঠায় দর্শন স্পর্শন শ্রবণ এরা অহোরাত্র খবর পাঠাচ্ছে; বাইরের ঘটনা বাইরের বস্তুর পরিষ্কার একটি-একটি চুম্বক রিপোর্ট চট্‌পট্ বুদ্ধির ঘরে টেলিগ্রাম করাই এদের সাধারণ কায। রাত পোহালো চোখ ঝাঁপ খুলেই

www.bengaliebook.com

দেখলে আলো হয়েছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার গেল বুদ্ধির কাছে—"রাতি পোহাইল, উঠ প্রিয় ধন, কাক ডাকিতেছে করেরে শ্রবণ"। সকাল, এই বুদ্ধি অমনি জাগল মানুষের, দ্বিপ্রহরের রোদ চন্‌চনে হয়ে উঠলো অমনি স্পর্শন বুদ্ধির কাছে তার পাঠালে "ভানুতাপে তাপিত ধরণী", মধ্যাহ্ন, বুদ্ধি উদয় হল মানুষের। এমনি অষ্টপ্রহর বুদ্ধির তাঁবেদারি করতেই কাট্‌ছে দিন দর্শনের স্পর্শনের শ্রবণের! একেবারে ঘড়িধরা এদের কায একটু এদিক ওদিক হলেই মুস্কিল—কুয়াশা বেশি হলে, বাদলা ঘন হলে এই প্রহরীরা অনেক সময়ে ঠিক ঠাউরে উঠতে পারে না সকাল কি সন্ধ্যে, টেলিগ্রাফে ভুল থেকে যায়, বিছানা ছাড়তে বেলা হয়, ভাত চড়তে তিনটে বাজে, এমনি নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নিত্য কাযে। তখন বার বার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখতে হয়, নয় তো জানলা খুলে বাইরে উঁকি দিতে হয় ক্রমান্বয়ে। শুনে দেখি, চেয়ে দেখি অথবা পরশ করেই দেখি, সাধারণ মানুষের জীবনে এই তিন দেখার সম্পর্ক হচ্ছে বস্তু-জগতের যেগুলো সচরাচর ঘটনা এবং বাইরের যে মোটামুটি খবর তারি সঙ্গে। প্রহরীর কায খবরদারীর কায; এর বেশি কায এদের দেওয়ার দরকারই হয় না জীবনে ইতর জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত কারু, অতএব বলতেই হ'ল চোখ কান হাত এমনি সবার স্বাভাবিক কায ও অবস্থা হয় চট্‌পট্‌ দেখা শোনা ছোঁয়া ও জানা যান্ত্রিকভাবে। চোখে দেখলেম বাইরের পদার্থ তার রূপ রং ইত্যাদি, পাঁচ আঙ্গুলে পরশ করে দেখলেম সেগুলো; শুনে দেখলেম বাইরের খবরাখবর, এই ভাবে জগতের বস্তু ও ঘটনার বুদ্ধিটা বেড়ে চল্লো মানুষ থেকে ইতর জীব তাবতেরই। মুখ চোখ কান হাত পা সব দিয়ে জীব যেন পড়ে চল্লো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ—বড় গাছ, লাল ফুল, ছোট পাতা, কিম্বা জল পড়ে, হাত নাড়ে, খেলা করে, অথবা নূতন বটী, পুরাণ বাটী, কাল পাথর, সাদা কাপড়—শুধু চোখের পড়া; কিম্বা যেমন মেঘ ডাকে, অথবা কাক ডাকিতেছে, বাঁশী বাজিতেছে, বেড়াল কাঁদিতেছে, মা বকিতেছে—শুধু শোনার পড়া; অথবা যেমন—শীতল জল, তপ্ত দুধ, নরম গদি, শক্ত লোহা—শুধু পরশ করার পাঠ। ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে এই উপায়ে সবাই পড়ে চলেছে শিশুশিক্ষা থেকে বোধোদয় পর্যন্ত, এর বেশি পড়া সাড়ে পনেরো অানা মানুষ দরকারই বোধ করে না সারা জীবনে। বস্তু ও ঘটনার মোটামুটি বুদ্ধি হলেই চলে যায় সুখে স্বচ্ছন্দে প্রায় সকলেরই সাধারণ

www.bengaliebook.com

জীবনযাত্রা এবং এই মোটামুটি বুদ্ধির উদ্রেক করে দেওয়ার কাযে লেগে থাকতে থাকতে দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণের শক্তিও এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে কোন কিছুর সূক্ষ্ম দিকে বা গভীর দিকে যেতেই চায় না তারা। শিল্পকার্য সঙ্গীত, এবং কোন বিষয়ে পটুতা হয় না হ'তে পারে না ততক্ষণ, যতক্ষণ নানা ইন্দ্রিয়ের নিত্য এবং স্বাভাবিক ক্রিয়ার কতকটা অদল-বদল ঘটিয়ে না তোলা যায়। এমন কল সব আজকাল তৈরী হয়েছে যা চোখ যেমন করে দেখে ঠিক তেমনি করেই দেখে ও ধরে নেয় সৃষ্টির সামগ্রী চট্ করে নিমেষ ফেলতে! স্পর্শ করে কল, স্পর্শ ক'রে শিউরে উঠে, দুলে ওঠে গরম ঠাণ্ডার ওজন-মাপে এবং পরশের তন্ন তন্ন হিসেব লিখে চলে; বাদলা হবে কি ঝড় উঠবে তা বাতাসের পরশ পেয়েই বলে দেয় কল; উত্তর মেরুতে ভূমিকম্প হলে তার হিসেব রাখে দক্ষিণ সাগরের পরপারে বসে কল; আবার কল সে শুনছে, যা শুনছে তা লিখছে, যা লিখছে তা শুনিয়ে দিচ্ছে সুর করে বক্তৃতা দিয়ে আবৃত্তি অভিনয় করে পর্যন্ত। কাপড় কাচ্ছে কল, কাপড় ভাঁজ করে কাঁথা সেলাই করছে কল, দ্রুত দৌড়চ্ছে কল, আকাশে উড়ছে কল! এতে করে মনে হয় এই সমস্ত কল মিলিয়ে একটা কলের পুতুল যদি কোন দিন ছবি মূর্তি গান ইত্যাদি নানা জিনিষের সমালোচনা করতে এসে উপস্থিত হয় আমাদের মধ্যে তবে খুবই অদ্ভূত হবে সে ঘটনা, কিন্তু আরো অদ্ভূত হবে কলের পুতুলের ছবি মূর্তি গান কবিতা ইত্যাদির সমালোচনা। বস্তুতন্ত্রতা সেই কলের পুতুলে এত অভ্রান্ত রকমে থাকবে যে ছবি যদি প্রতিচ্ছবি, মূর্তি যদি প্রতিমূর্তি, গান যদি হরবোলার বুলি না হয় তো সে তখনি তার নিন্দা ও কঠিন সমালোচনা করে বসবে, কবিতা কল্পনা এ সবকে সে বলবে পাগলামি এবং ঠিক এখন সাধারণ মানুষ আমরা যেমন শিল্পশালায়, সঙ্গীতশালায় বা অভিনয়-ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে শিল্পকার্য যতটা মেলে ততটা তার বাহবা দিই, একটু বাস্তবিকতার ভ্রান্তি উৎপাদনের ব্যাঘাত হলে বলে বসি 'দূর ছাই', কলের পুতুলটিও ঠিক সেই ব্যবহারই করবে। সাধারণতঃ শরীর-যন্ত্রগুলো আমাদের প্রবল বস্তু-পরায়ণতা নিয়ে দেখতে শুনতে পরশ এবং পরখ করতেই পাকা হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। সারাজীবন বারে বারে একই জিনিষ দেখে শুনে, পরশ করে পরখ করতে করতে কাজের দক্ষতা এমন বেড়ে যায় হাত পা চোখ কানের, যে মেকি টাকা, ভেজাল ঘী, পাকা ও কাঁচা, সরেস ও নিরেস

ছোঁয়া মাত্র দেখা মাত্র শোনা মাত্রই তারা ধরে দিতে পারে; কিন্তু এটুকু হয় শুধু আশপাশের বস্তুগুলোর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়বশতঃ। শরীর-যন্ত্র, নিত্য ব্যবহারের নিত্য কাযের বস্তু ও ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে এই অভ্রান্ত বস্তু-পরিচয়ের পাঠ সাঙ্গ করেই থেমে রইলো, এই হলো সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা দর্শন স্পর্শন শ্রবণ দিয়ে যতটা এগোতে পারি তার চরম পরিণতি। মানুষের দেখা শোনা ছোঁয়া সমস্তই কায ও বস্তু এবং বাস্তবিকতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে রইলো, নিখুঁত করে চিনে নিতে পারলে, অভ্রান্তভাবে ধরতে পারলে বাইরের এটা ওটা সেটা, এ ও তা, এমন তেমন ইত্যাদি বস্তু ও ঘটনা এই যে জ্ঞান একে বলা যেতে পারে বস্তু-বুদ্ধি বা বাস্তব-বুদ্ধি—কিন্তু কিছুতেই একে বলা চলে না বস্তুর রসবোধ শিল্পবোধ সৌন্দর্যবোধ অথবা অর্থবোধ। মানুষের এই বস্তুগত দৃষ্টি চিরদিন তার স্বার্থ-বুদ্ধির সঙ্গেই জড়ানো থাকে। নিত্য জীবনযাত্রার সঙ্গে আশপাশ থেকে যারা এসে মিলছে তাদেরই খবর আমরা দিন রাত অভ্রান্তভাবে নিয়ে চল্লেম এই বস্তুগত দৃষ্টি দিয়ে। ময়রা যেন চমৎকার মিঠাই গড়ে চল্লো মিঠাইয়ের রসবোধ করার কোন অপেক্ষা না রেখেও! কিম্বা জহুরী রত্ন-পরীক্ষায় এমন পাকা হয়ে উঠলো যে হাতে নিয়েই বলতে পারলে সামগ্রীটা কাচ কি হীরে, সরেস কি নিরেস; অথবা শব্দে কান এত পরিষ্কার হল যে কোথা কোমল কোথা বা অতি-কোমল পর্দ্দায় ঘা পড়ছে তা শোনামাত্র ধরে দিলে মানুষ। কিন্তু এই হলেই ময়রার জহুরীর ও কালোয়াতের রসবোধ সৌন্দর্য ও সুষমাবোধ সম্পূর্ণ হয়েছে তা জোর করে বলা চলে না। বস্তু-জগতের সঙ্গে পরিচয় বুদ্ধির দিক দিয়ে ঘটিয়ে দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মানুষকে খুব দক্ষতা, চাতুর্য, বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা দিয়ে পাকা মানুষ কাযের মানুষ করে দেয় এটা যেমন সত্যি, আবার শুধু গুণগুলি নিয়েই মানুষ গুণী, কবি ও শিল্পী হয় না এটাও তেমনি সত্যি। সুরে কান হলেই যে মানুষ গান রচনা করতে পারে তা নয়, জহরৎ চিনলেই যে সবাই চমৎকার অলঙ্কার রচনা করতে পারে অথবা ভাল রসকরা গড়ে চল্লেই সে যে সৃষ্টির রসের রসিক হয়ে ওঠে তাও নয়। বহির্বাটির রাস্তা ঘাট নিয়ম-কানুন সমস্তই যেমন অন্দরমহলের সঙ্গে স্বতন্ত্র তেমনি বুদ্ধির প্রেরণা আর রসবত্তা বিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। সদর দুয়ার দিয়ে বুদ্ধির কাছে পৌঁছচ্চে সৃষ্টির খবরাখবর, চলাচল কোলাহল করে, অবিরাম অস্থিরগতিতে সমস্তই সেখানে যাচ্ছে আসছে—

কারো সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করার সময় সেখানে অল্পই মেলে! নিত্য দেখা শোনা দ্বারায় ভাল করে মুখচেনা ঘটলেও কিছুর সঙ্গে অবসর মতো রয়ে-বসে রসের সম্পর্ক পাতানো সদর রাস্তা এবং সদর বাড়ীতে ক্বচিৎ সম্ভব হয়; এই কারণেই মানুষের ঘর, কাছারি ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর, বৈঠকখানা, আফিস ঘর এমনি নানা কুঠরিতে ভাগ করা থাকে। অন্দরে অথবা বৈঠকখানার গানের ও নাচের মজলিসে প্রবেশ করতে হলে যেমন আফিসের চোগা চাপকান ছেড়ে উপস্থিত হতে হয়, কাযের দৃষ্টি কাযের কথা মায় কাযকে পর্যন্ত কড়া পাহারায় বাইরে আটকে, তেমনি রসবোধের রাজত্বে ঢোকবার কালে নিত্যকার দর্শন স্পর্শন শ্রবণের অনেকখানি পরিবর্তন করে চলে মানুষ—এটা কেবল মানুষেই পারে, ইতর জীব পারে না। কাযের সংস্পর্শ থেকে কিছুকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চেয়ে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখার অভ্যাস চোখ কান ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দেওয়ার ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার অপেক্ষা রাখে, তবে মানুষের শিল্পজ্ঞান রসবোধ জন্মায়। মানুষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে কখন? প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, স্তোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যখন সে মিলিত করে। মানুষের শরীর-যন্ত্রটাকে জীবনযাত্রার পথে নানা বিঘ্নবিপত্তি থেকে রক্ষা করে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নেবার কাযেই দক্ষ হয়ে উঠলো মানুষের ইন্দ্রিয় কটা নিজের নিজের পরিপূর্ণ শক্তি অনুসারে; দেখা শোনা ছোঁয়া ইত্যাদি নানা উপায়ে এইটুকুই হল। আর কাযভোলা দৃষ্টি সে হল অনন্যসাধারণ অস্বাভাবিক দৃষ্টি, শিশুকালের তরুণ দৃষ্টি কবির দৃষ্টি শিল্পীর দৃষ্টি। নিত্য কাযের ব্যাপার সরিয়ে একটা জিনিষে গিয়ে মানুষের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ নিবিষ্ট হল নিবিড়ভাবে যখন, তখনই মন পড়ল জিনিষে, এবং মনে ধরা না ধরার কথা তখনই উঠলো। চোখ কান সমস্তকে কেবলি—পাতা পড়ে, জল নড়ে ইত্যাদি কাযের পড়া থেকে ছুটি দিয়ে সৃষ্টির জিনিষের ও ঘটনার দিকে ছেড়ে দেওয়া গেল, এতে মানুষের পরশ ও পরখ করার একটা কৌতূহল দেখা দিলে। কাযের জগতের বাঁধাবাঁধি নিয়মে দেখা শোনা করতে অপটু থাকে শিশুকালে সব মানুষ স্বভাবতঃই, বাপ মাকে তারা কাজে খাটায় নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর চেয়ে, কাযেই সামান্য সামান্য জিনিষকেও বড় মানুষের চেয়ে বেশি কৌতূহলের সঙ্গে শিশুরা দেখবার শোনবার অবসর পায়, মন তাদের আকৃষ্ট হয় বস্তুর উপর ঘটনার দিকে অনেকখানি এবং

মন তাদের খেলেও অনেকখানি অনেক জিনিষের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অগাধ কৌতূহলে। শিশুকালের এই কৌতূহল দৃষ্টির কিছু কিছু রেশ্ মানুষের বয়সকালেও নানা জিনিষ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেখা যায়—চন্দ্রোদয় সূর্যোদয় শুকতারা ফোটাফুল মেঘের ঘটা বিদ্যুৎ কিম্বা এক টুকরো হীরে অদ্‌ভুত গড়নের ঢেলা অথবা বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার কি কিছু অথবা অদ্‌ভুত একটা সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদি নানা টুকিটাকি নিয়ে খুব বয়সেও মানুষ অনেক সময়ে নাড়াচাড়া করছে কৌতূহলের বশে দেখা যায়। দক্ষিণাবর্ত শাঁখকে লক্ষ্মীকে ধরে রাখতে খুব কাযের জিনিষ বলে দেখা আর কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্মীপেঁচার একটা পালকের চিত্র বিচিত্র নক্সা দেখা অথবা লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা বোনা কিম্বা ঘড়ির ঘণ্টা শোনা ও নূপুরের ধ্বনি শোনায় প্রভেদ হচ্ছে ঐ কৌতূহলটি নিয়ে। তরুণ দৃষ্টিতে সৃষ্টির সামগ্রী কৌতুকে রহস্যে ভরা দেখায়, কাযের সংস্পর্শে বড় হতে হতে মানুষ যতই এগোতে থাকে ততই এই দৃষ্টির তারুণ্য সে হারাতে থাকে এবং শেষে এই সমস্ত বিশ্ব তারি সংসারের কাযে লাগবার জন্যে রয়েছে এমনো একটা বিশ্বাস সে করে ফেলে, বিশ্বে যেটাকে কাযের জিনিস বলে সে নিজে বোধ করে না সেটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চায় না, আর ছবি কবিতা প্রায় সবই বাজের কোঠায় ফেলে দিয়ে চলে মানুষ! স্ত্রী-পুত্র পরিবার পাড়াপ্রতিবেশী এমন কি টেবিল চেয়ারগুলোকেও খালি প্রয়োজনের দেখা প্রয়োজনের সম্পর্ক নিয়ে উপভোগ করে চলেছে এমন শক্ত মানুষ বড় অল্প নেই একথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু সকালে খবরের কাগজ পড়ার সময় কানের কাছে ছেলেগুলো শুধু-শুধু হৈ চৈ বাধিয়ে দিলে, কিম্বা ডিক্‌সনারির পাতাটা ছিঁড়ে নৌকা বানিয়ে বর্ষার দিনে জলে ভাসালে, অথবা দস্তুর মাফিক সাড়ে দশটায় ঘড়ির কাঁটা পৌঁছলেই ছেলে ইস্কুলের জন্যে তৈরি না হয়ে বিছানায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়লে, ছেলে কাযের ব্যাঘাত করলে অকেজো হয়ে রইলো কাযের জিনিষ নষ্ট করলে এমনি শিশুচরিত্রকে কাযের চশমা দিয়ে উল্টো বুঝে নিজের চোখ কান লাল করে না তোলে এমন মানুষ কমই দেখি। কাযের জগতে চলাচল করতে করতে এই অত্যন্ত কাযের পরকলা এত শক্ত হয়ে আমাদের চোখে-দেখা, শুনে-দেখা ছুঁয়ে-দেখার উপরে বসে যায় যে মনে হয় চিরদিন এই ভাবে দেখে চলাই বুঝি সব মানুষেরই কায; কিন্তু অত্যন্ত ছেলে মানুষ যারা

তারা আমাদের এই ধারণা উল্টে দিয়ে যায়, কবিরা উল্টে দিয়ে যায়, শিল্পীরা উল্টে দিয়ে যায়, আর ঠিক সেই মানুষগুলিকেই আমরা বালক পাগল নির্বুদ্ধি বলে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার দাবি সপ্রমাণ করে করে চলি। কিন্তু সৌন্দর্যে ভরা, রসে ভরা, রংএ ভরা, রূপে ভরা, ভাব লাবণ্য সব দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর করে রচনা করা এই সৃষ্টির মাঝে মানুষ কেবল বুদ্ধিমত্তার সত্তা নিয়ে বর্তে থাকবে নয়ন ভরে কিছু দেখে নিতে চাইবে না, প্রাণভরে মন দিয়ে কিছু শুনে যেতে চাইবে না, পরশ করে পুলকিত হতে চাইবে না, মানুষ সমস্ত বিশ্বের রস, এ যিনি মানুষকে মন দিয়ে সৃষ্টি করলেন তাঁর ইচ্ছে কখনও হতে পারে না। এবং এই কথাই সপ্রমাণ করতে প্রথমেই এল কায-ভোলা কায-ভোলানো শিশু খুব কাযের জগতে অফুরন্ত কৌতূহল অকারণ হাসি কান্না ইত্যাদি নিয়ে। সেই শিশু, দিন রাত কাযে কর্মে ভরা মানুষের ঘরের মধ্যে এসে তার কৌতুক কৌতূহল যারা জাগালো—মাটির ঢেলা, কাঠের টুকরো—তাদের নিয়ে নিরিবিলি আপনার খেলাঘর বাঁধলে—কল্পনা পক্ষিরাজের অতি অপূর্ব আস্তানা, সেখানে কায হয়ে গেল একেবারে খেলা, খেলাই হয়ে উঠলো মস্ত কায! কিন্তু কাযের জগৎ সেই শিশুর উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, শিশুকাল যেমন শেষ হতে থাকলো অমনি কাযও কোন কোন শিশুকে আস্তে আস্তে আপনার ঘরের দিকে টেনে নিতে লাগলো, একটু একটু করে খেলাঘর ভেঙ্গে গেল এবং কচি ছেলেকে কাযের যন্ত্রতন্ত্রগুলো দাঁতে চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দিলে। আবার কোন ছেলেকে কায তেমন করে জোরে ধরতে পারলে না, কিম্বা কোন ছেলেটা কাযে পড়েও বাজের সাধনা অনেকখানি করে চল্লো, তারাই কাযের চাবুক এড়িয়ে গিয়ে কিম্বা সরে গিয়ে হয়ে উঠলো ভাবুক, অদ্ভুত কৌশলে তারা তাদের চোখে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা ইত্যাদি যে অত্যন্ত কাযের অফিস যোড়া তাদের পিঠে পক্ষিরাজের ডানা যুড়ে দিয়ে কায বাজাতে না গিয়ে, বাঁশি বাজাতে বেরিয়ে পড়লো জগতে। শিশুকালের হারানো চমৎকারি কাচ অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে সেইটে বার করে সাদাসিধে কাযের চোখে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখার উপরে যেমনি বেশ করে এঁটে দিলে মানুষ, অমনি স্বর্গ মর্ত পাতাল আবার তার কাছে তরুণ হয়ে দেখা দিলে, কৌতুকে কৌতূহলে ভরে উঠলো সৃষ্টির সামগ্রী! যে সব ইন্দ্রিয় কেবলি হিসেবের কাযে, পাহারার কাযে লেগেছিলো

তারা হয়ে উঠলো কৌতূহলপরায়ণ এবং সন্ধানী, দিনের পর দিন বস্তুকে নিয়ে ঘটনাকে নিয়ে উল্টে-পাল্টে খেলতে আর দেখতে অথবা শুনতে লেগে গেল; শুধু ‘জল নড়ে ফল পড়ে’ এ পড়ায় আর রুচি হল না, কেমন করে জল চলচে, কেমন করে ফুল ফুটছে ঝরছে, কিবা সুরে পাখী গাইছে, আকাশের তারা কেমন করে চাইছে ইত্যাদি কেমন তা জানার আগ্রহ এবং চেষ্টা জেগে উঠলো। সাদাসিধে রকমের বুদ্ধির চাষ করে চলাতেই চোখে-দেখা, শুনে-দেখা ছুঁয়ে-দেখা বদ্ধ রইলো না। চঞ্চল দৃষ্টি এ-ফুলে ও-ফুলে এখনো উড়ে পড়তে লাগলো বটে, কিন্তু হঠাৎ দৃষ্টির চঞ্চলতার মধ্যে এক একটা সম্‌ আর ফাঁক পড়তে লাগলো, প্রজাপতি যেন হঠাৎ ডানা দুখানা স্থির করে আলোর পরশ, ফুলের পাপড়ির রং এবং ফুলের ভিতরকার কথা ধরবার চেষ্টা করতে থাকলো! দর্শন স্পর্শন শ্রবণের যান্ত্রিকতা কতকটা দূর হয়ে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা একটু যেন বিকশিত হল। যে সব শরীর-যন্ত্রের কাযই ছিল বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাইরের প্রেরণায় চট্‌পট্‌ সাড়া দেওয়া নির্বিচারে, অন্তরের সঙ্গে মানুষ যেমনি তাদের মুক্ত করে দিলে অমনি ভিতরকার প্রেরণায় তারা ধীরে সুস্থে একটুখানি যত্নের সঙ্গে একটু কৌতূহল নিয়ে যেন আত্মীয়তা পাতাতে চল্লো বাইরের এটা ওটা সেটার সঙ্গে, একটু দরদ পৌঁছল দেখা শোনা ছোঁয়ার মধ্যে। এ একটা মস্ত ওলট-পালট ঘটলো হাত পা চক্ষু কর্ণের কাযের স্বাভাবিক ও যান্ত্রিক ধারার—উজান টান ধরলো যমুনায়। ফুলের পাতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাড়া ধরার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের যে যন্ত্রটা, সেটা থেকে থেকে আনমনে যদি ফুলের এবং পাতার শোভা নিরীক্ষণ করতে আরম্ভ করে কায ভুলে, তবে নিশ্চয়ই সবাই বলবে যন্ত্রটা বিগড়েছে—যে ভাবে দেখা যে ভাবে শোনা যন্ত্রটার উচিত ছিল তা করছে না। কিন্তু যন্ত্রের ঐরূপ ব্যবহার দেখে একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর বিপর্যয় শক্তি যে যন্ত্রটা লাভ করেছে তা কারু অগোচর থাকবে না। তেমনি ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ ক্রিয়ার মধ্যে নিরূপণ-ইচ্ছা নিবিষ্ট হবার চেষ্টা যারা ঘটায় অভ্যাস শিক্ষা ও সাধনার দ্বারায়, বলতেই হবে সেই সব মানুষের দেখা শোনা সমস্তই অনন্যসাধারণ বা অসামান্য রকমের একটা শক্তি পেয়েছে। এই যে কৌতূহল-প্রবণতা, দরদ দিয়ে সব জিনিষ দেখার অভ্যাস, কাযের দেখার প্রায় বিপরীত উপায়ে সৃষ্টির জিনিষকে আলিঙ্গন করে পরখ করা, ছেলেবেলাকার হারিয়ে-যাওয়া খেলাঘরের

কাজ-ভোলা দৃষ্টি,—একে ফিরে পাওয়া দরকার কি না, এ নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ দেখা যায় কিন্তু একদিনও মানুষ একটিবার সেই ছেলেবেলার দেখা শোনা খেলা ধূলোর মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলে না এমন ঘটনা মানুষে বিরল। চেষ্টা করলেই ছেলেবেলার সেই কাজ-ভোলা হারানো দৃষ্টি যে ফিরে পাওয়া যায় তা নয়। নাসার ডগায় দৃষ্টি স্থির করলেও, চাঁদ তারা মেঘ অথবা সূর্যের দিকে উদয়াস্ত হাঁ করে চেয়ে থাকলেও অথবা খাঁচায় কোকিল পুষে তার গান দিন রাত শুনে এবং দক্ষিণ বাতাসকে চাদর উড়িয়ে ছুঁয়েও যোগীর এবং ভাবুকের দৃষ্টি পাচ্ছে না কত যে লোক তার ঠিকানা নেই। সখ করে' নানা সৌখীন জিনিষের সাজসজ্জার দিকে অথবা বিচিত্রা এই বিশ্ব প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যের দিকে চাওয়া হল বিলাসীর চাওয়া। বেতাল পঁচিশের ভোজনবিলাসী শয্যাবিলাসী এরা সাতপুরু গদির তলায় একগাছি চুল, রাজভোগ চালে শবগন্ধ অতি সহজেই ধরতে পারতো, কিন্তু বিলাসীর দেখা প্রকাণ্ড রকম স্বার্থ নিয়ে দেখা, অত্যধিক মাত্রায় কাযের দেখা এ দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি কিম্বা কায-ভোলা শিশুর সরল দৃষ্টি একেবারেই নয়, অতিমাত্রায় বস্তুগত দৃষ্টিই এটা! এই ইন্দ্রিয়পরায়ণ দৃষ্টি নিয়ে শয়নবিলাসী, ভোজনবিলাসী দুটোতে মিলে বাসকসজ্জার কবিতা লিখতে চেষ্টা করলে যা হতো তা এই—

সুন্দরীর সহচরী ভাল জানে চর্য্যা।
রতন মন্দিরে করে মনোহর শয্যা॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুই ধারি।
ডৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকন মশারি॥
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ্ দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা॥

চিনির পানা কর্পূর চন্দন কালাগুরু বিছানা-বালিস লেপ-তোষক ইত্যাদি দিয়ে যে ত্রিপদী চৌপদী, সে গুলো কবিতা কিম্বা ভাবের তিন পায়া চার পায়া টেবিল চৌকি বল্লেও বলা চলে। বিলাসীর দৃষ্টির সঙ্গে ভাবুকের দৃষ্টির

কোনখানে যে তফাৎ তা স্পষ্ট ধরা যাবে দুই ভাবুকের লেখা বাসকসজ্জার বর্ণন দিয়ে; যথা—

অপরূপ রাইক রচিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, ধনী সাজয়ে
পুনঃ পুনঃ উঠয়ে চকিত॥

ধুয়োতেই, ভাব-সচকিত চাহনি নিভৃত নিকুঞ্জের অপরূপ শোভা মনকে দুলিয়ে দিলে; আবার যেমন—

আজ রচয়ে বাসক শেজ,
মুনিগণ চিত হেরি মুরছিত
কন্দর্পের ভাঙ্গে তেজ।
ফুলের অচির, ফুলের প্রাচীর
ফুলেতে ছাইল ঘর,
ফুলের বালিস আলিস কারণ
প্রতি ফুলে ফুলশর।

বিলাসীর দৃষ্টিতে ধরা পড়লো ভাল ভাল কাযের সাজ সরঞ্জাম যা টপ করে গিলে খেতে ইচ্ছে হয় তাই, আর ভাবুকের দৃষ্টিতে ধরা গেল সেইগুলো যাদের দিকে নয়ন ভরে দুদণ্ড চেয়ে দেখতে সাধ হয়। বিলাসীর দৃষ্টি স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে সৃষ্টির যথার্থ শোভা সৌন্দর্য ও রসের বিষয়ে মানুষটাকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কায-ভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি সৃষ্টির অপরূপ রহস্যের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে চলে মানুষকে। কাযেই ভাবুকের শোনা-দেখা বলা-কওয়ার মধ্যে শিশুসুলভ এমনতরো সরলতা ও কল্পনার প্রসার থাকে। ভাবুকদৃষ্টি এত অপরূপ অসাধারণভাবে দেখে-শোনে, দেখায়-শোনায় যে কাযের মানুষের দেখা-শোনা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে ভাবুকের চোখে দেখা ছবি কবিতা সমস্তই হেঁয়ালী বা ছেলেমান্ষির মতই লাগে। কাযের দৃষ্টি নিয়ে মানুষের মন কোন্খানে কি ভাবেই বা খেলা করছে, আর ভাবুকের দৃষ্টি নিয়েই বা মন কোথায় কি খেলছে কেমন করে, দেখলেই দুয়ের তফাৎ

স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমে কাযের কাজির দেখা দিয়ে লেখা মনের খেলা ঘরের দৃশ্য—

মন খেলাওরে দাণ্ডা গুলি
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল,
চম্পাকলী ধুলা ধুলী।

এইবার ভাবুকের দৃষ্টি কবির মনটিকে কোন কায-ভোলা জগতের খেলাঘরের ছুটির মাঝে ছেড়ে দিয়ে গেল তারি ছুটি গান—

"আকাশে আজ কোন চরণের আসা-যাওয়া,
বাতাসে আজ কোন পরশের লাগে হাওয়া,
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল-বাণী,
আজ উদাসীর বাঁশীর সুরে কে দেয় আনি,
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া।

কোন ফাগুনে যে ফুল ফোটা হল সারা,
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা,
বকুল তলায় কায-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে,
যে সব কথা ভাসিয়েছিলেম গানের সুরে,
ব্যথায় ভরে ফিরে আসে সে গান গাওয়া।"

কাযের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাঝে মনের মরুভূমির উপরে যেন হঠাৎ আকাশ থেকে শ্যামল ছায় নাম্‌লো, জল ভরে এলো চোখের কোণে, কান শুনলে বাঁশীর সুর উন্মনা হয়ে, কায-ভোলা মন বকুল তলার নিবিড় ছায়ায় খুঁজতে লাগলো ছেলেবেলার হারানো খেলার সাথীকে, আর গাইতে লাগলো ক্ষণে ক্ষণে—

"শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।"

www.bengaliebook.com

এমনিতরো ভাবুক দৃষ্টি দিয়ে সব মানুষের শিশুকাল সৃষ্টির যা কিছু—আকাশের তারা থেকে মাটির ঢেলাটাকে পর্যন্ত—একদিন দেখে চলেছিল, কিন্তু অবোলা শিশুকাল আমাদের কেমন দেখলে কেমন শুনলে সেটা খুলে বলতে পারলে না, এঁকে দেখাতে পারলে না। কবিতা ছবি ইত্যাদি লেখার কৌশল, ভাষার খুঁটিনাটি, ছন্দের হিসেব না জানার দরুণ শিশুকাল আমাদের কবির ভাষায় ছবির ভাষায় আপনাকে ব্যক্ত করতে পারলে না। শিশুর তরুণ দৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির সামগ্রীকে সখীভাবে খেলাবার সাথী বলে চেয়ে দেখবার শুনে দেখবার ছুঁয়ে দেখবার একটা আগ্রহ থাকে, সেই একাগ্রতা দিয়ে দেখা শোনা ছোঁয়ার রসটা ছেলেমেয়েরা উপভোগ করে মহানন্দে, কিন্তু সে আনন্দ ব্যক্ত করে কেবল অভিনয় ছাড়া আর কিছু দিয়ে এমন সাধ্য শিশুর পুঁজি নিয়ে হয় না। শিশু যখন একটা কিছু বর্ণনা করে তখন তার মুখ চোখ হাত পা সমস্তই যেন ঘটনাটাকে মূর্তি দিয়ে বাইরে হাজির করবার জন্যে আকুলি ব্যাকুলি করছে দেখা যায়, যেটা বড় হয়ে আমরা কবিতায় অথবা ছবিতে ব্যক্ত করি সেটা অভিনয় ক'রে ব্যক্ত করা ছাড়া শিশুকাল আর কিছুই করতে পারে না; এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে কেঁদে নেচে, কখন গলা জড়িয়ে, কখন ধূলায় লুটিয়ে, আধ আধ কথায় অতি মনোহর অতি চমৎকারী একটা নিজের অদ্ভুত রকমে সৃষ্টি করা ভাষায় শিশু আপনার দেখা শোনা সমস্তই ব্যক্ত করে চলে যে, বড় হয়ে যারা আপনাদের দৃষ্টি শ্রবণ স্পর্শনের উপরে অত্যন্ত কাযের চশমা এঁটে দিয়েছে তাদের বোঝাই মুস্কিল হয় শিশুকাল অনাসৃষ্টি কি দেখছে, কিবা দেখাতে চাচ্ছে, কি শুনছে কিবা শোনাচ্ছে! শিশুর হৃদয় যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ করে নেয় বিশ্বচরাচরকে, একমাত্র ভাবুক মানুষই সেই ভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন শুনতে পারেন, এবং অবোলা শিশু যেটা বলে যেতে পারলে না সেইটেই বলে যান ভাবুক কবিতায় ছবিতে,—রেখার ছন্দে লেখার ছন্দে সুরের ছন্দে অবোলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরন্ত আনন্দ আর খেলা দিয়ে ভরা শিশুকালের দিন-রাতগুলোর জন্যে সব মানুষেরই মনে যে একটা বেদনা আছে, সেই বেদনা ভরা রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন মানুষের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক—যাঁরা শিশুর মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন। খুব খানিকটা ন্যাকামোর ভিতর দিয়ে নিজেকে এবং নিজের

বলা কওয়া গুলোকে চালিয়ে নিয়ে গেলেই আমাদের সৃষ্টির ও দৃষ্টির মধ্যে তারুণ্য ফিরে পাওয়া সহজেই যাবে এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা—শিশুকাল ন্যাকামি দিয়ে আপনাকে ব্যক্ত করে না, সে যথার্থই ভাবুক এবং আপনার চারিদিককে সে সত্যই হৃদয় দিয়ে ধরতে চায় বুঝতে চায় এবং বোঝাতে চায় ও ধরে দিতে চায়। শুধু সে যা দেখে শোনে সেটা ব্যক্ত করার সম্বল তার এত অল্প যে, সে খানিকটা বোঝায় নানা ভঙ্গি দিয়ে, খানিক বোঝাতে চায় নানা আঁচড় পোঁচড় নয় তো ভাঙ্গা ভাঙ্গা রেখা লেখা ও কথা দিয়ে,—এইখানে কবির সঙ্গে ভাবুকের সঙ্গে পাকা অভিনেতার সঙ্গে শিশুর তফাৎ। দৃষ্টি দুজনেরই তরুণ কেবল একজন সৃষ্টি করার কৌশল একেবারেই শেখেনি, আর একজন সৃষ্টির কৌশলে এমন সুপটু যে কি কৌশলে যে তাঁরা কবিতা ও ছবির মধ্যে শিশুর তরুণ দৃষ্টি আর অস্‌ফুট ভাষাকে ফুটিয়ে তোলেন তা পর্যন্ত ধরা যায় না।

ন্যাকামো দিয়ে শিশুর আবোল তাবোল আধ-ভাঙ্গা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে, অথবা শিশুর হাতের অপরিপক্ক ভাঙ্গাচোরা টানটোন আঁচড় পোঁচড় চুরি করে বসে বসে কেবলি শিশু-কবিতা শিশু-ছবি লিখে চল্লেই মানুষ কবি শিল্পী ভাবুক বলতে পারে নিজেকে এবং কাজগুলোও তার মন-ভোলানো হয়, এ ভুল যারা করে চলে তারা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে কিন্তু শিশুকেও ভোলায় না, শিশুর বাপ-মাকেও নয়। ছেলে-ভুলানো ছড়া একেবারেই ছেলেমান্‌ষি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি—

"ও পারেতে কাল রং, বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ ঝম্‌
এ পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙ্গা টুক্‌ টুক্‌ করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে!"

অজানা কবির গান ছেলেমান্‌ষি মোটেই নয়, এতে ছেলে বুড়ো সবার মন ভুলিয়ে নেয়। আমাদের খুব জানা কবি এই সুরেই সুর মিলিয়ে বাঁধলেন এরি মত সরল সুন্দর ভাষায় ও ছন্দে আপনার কথা—

"ওই যে রাতের তারা

জানিস্ কি মা কারা?
সারাটি-খন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমন ধারা।
আমার যেমন নেইক ডানা
আকাশেতে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেমনি ওদের পা নেই বলে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর পরে।"

আমাদের তরুণ-চোখের নয়নতারা একদিন আকাশের তারার দিকে চেয়ে সে সব কথা ভেবেছিল, কিন্তু যে ভাবনা ব্যক্ত করতে পারেনি আমাদের শিশুকাল, এতকাল পরে সেই ভাবনা ফুটে উঠলো কবির ভাষায়।

কাযের চশমা পরানো দৃষ্টি যেটা বড় হয়ে অবধি মানুষ দর্শন স্পর্শন শ্রবণের উপরে লাগিয়ে চলাফেরা করছে, সেটার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে চল্লে তারাগুলো মিট্‌মিটে আলোর কিম্বা খুব মস্ত মস্ত পৃথিবীর মতও দেখায়, কিন্তু আকাশের তারার মাটিতে নেমে আসা দেখা অথবা আকাশে বসে তারাগুলো যে কথা ভাবছে সেটা শুনিয়ে দেওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না উক্ত চশমা দিয়ে দেখে। ভাবুক যাঁরা, সচরাচর যান্ত্রিক দৃষ্টি যাঁদের নয়, তাঁদেরই পক্ষে সহজ হয় শিশুদের মতো হৃদয় দিয়ে আত্মীয়ভাবে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে বিশ্বের গোপন কথা বলা, আর গদ্যময় কাযের সাধারণ চশমা দিয়েই দেখলেম অথচ দেখতে চাইলেম ভাবুকের মতো গাঁথতে চাইলেম পদ্য—কিন্তু পদ্য কেন, ভাল একটা গদ্যও রচা গেল না সেই যান্ত্রিক দৃষ্টি নিয়ে—কল্পনা ভাবুকতা এ সবের বদলে সাধারণ কথা এবং কাযের কথাই সেখানে বিকট ছাঁদে আমাদের সামনে হাজির হল; যথা—

"মন্ত্রী রূপে চারিদিকে যত তারাগণ
ঘেরিয়াছে নলিনীরে শৈবাল যেমন।

www.bengaliebook.com

শশী আর তারাবৃন্দ গগনে শোভিত
দেখিলেই মনোপথ হয় প্রফুল্লিত॥”

চাঁদকে ঘিরে তারাগুলো যখন সারারাত কি যেন মন্ত্রণা করছিল, নিশ্চয়ই এই কবিতার কবি সেই সময় লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছিলেন, নয় তো খুব কাযের চশমা পরে মকদ্দমার নথি পড়ছিলেন। সুতরাং ‘মনোপথ’ যাতে ‘প্রফুল্লিত’ হয় এমন একটা সামগ্রী তিনি দিয়ে যেতে পারলেন না, কিন্তু ধরতেও পারলেন না চোখ কান হাত পা কিছু দিয়েই।

“ভোলা” “বাঁকা” হিন্দুস্থানীতে এ দুটোর অর্থ সুশ্রী, আবার কুব্‌জাও বাঁকা শ্যামও বাঁকা, একজন সুন্দর বাঁকা একজন যৎকুচ্ছিত বাঁকা; তেমনি একথা যদি কেউ বোঝেন যে সব জিনিষকে সোজাসুজি সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে না দেখে বাঁকা রকম করে দেখলেই কিম্বা উল্টো পাল্টা করে দেখালেই নিজের দৃষ্টির মধ্যে এবং নিজের বলা কওয়া লেখা ইত্যাদির মধ্যে ভাবুকতা রস সৌন্দর্য প্রভৃতি ভরে উঠবে কানায় কানায়, তবে তার মত ভুল আর কিছু হবে না।

ভাবুকের কায-ভোলা দৃষ্টি অত্যন্ত কাযের সামগ্রী। ধানক্ষেতটা ঠিক কাযের মানুষ হিসেবে না দেখলেও ক্ষেত ও মাঠের সৌন্দর্য যে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে তার কাছে ধরা পড়ে এবং সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখা মাঠের বর্ণনা ও ছবি খুব কাযের চশমা দিয়ে দেখা ও দেখানো মাঠের রূপটার চেয়ে মনোরম পরিষ্কার হয়ে যে ফুটে ওঠে ভাবুকের লেখায় বর্ণে বর্ণে, তা এই কাযের চশমা আর ভাবের চশমা দিয়ে দেখা ক্ষেত আর মাঠের দুটি বর্ণনা থেকে পরিষ্কার ধরা যাবে।

প্রথম কাযের চশমা দিয়ে দেখা মাঠ বর্ণন, মাষ্টার মশায় যেন উপদেশ দিলেন শিশুকে—যে মাঠে ছুটাছুটিই করতে চায় তাকে—

“হে বালক! মাঠে গিয়ে দেখে এস তুমি
কত কষ্টে চাষা লোক চষিতেছে ভূমি॥

পরিপাটি করে মাটি হ’য়ে সাবধান

তবে তায় শস্য হয়—ছোলা মুগ ধান।”

এই কাযের দৃষ্টি দিয়ে মাঠকে তো দেখাই গেল না, শস্য কেমন করে হয়, মাটি পরিপাটি হয় কিসে, তাও দেখলেম না; মাটি পরিপাটিরূপে বর্ণন ও দর্শন কি করে হয় তা জানতে কাযেই ভাবুকের কাছে দৌড়োতেই হল আমাদের। সেখানে গিয়ে শস্যক্ষেত্রের এক অপরূপ রূপ দেখলেম—

নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্কশালিঃ
বিলীনপদ্মঃ প্রপতত্তুষারঃ

কিম্বা যেমন—

পরিণত-বহুশালি-ব্যাকুল-গ্রাম-সীমা
সততমতিমানজ্ঞক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ॥

নিছক কাযের দৃষ্টি দিয়ে কাযের মানুষের কাছে মাঠখানা কৃষিতত্ত্বের ও নীতিশাস্ত্রের বইয়ের পাতার মতোই দেখালো, মাঠের সবুজ প্রসার কেমন করে গ্রামের কোন্ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তা দেখলে ভাবুক। কাযের দৃষ্টি দেখলে মুগ মুসুরী ছোলা কলা ধান ফলানো হচ্ছে মাঠের পাট করে, কিন্তু ধান পেকে কোথায় সোনার মতো ঝক্‌ছে, লোধ্র গাছ গ্রামের ধারে কোথায় ফুল ফুটিয়েছে, রাঙ্গা, সবুজ, নানা বর্ণের শস্য, শিশিরে নুয়ে পড়া পদ্মফুল এসব কিছু ধরতে পারলে না অত্যন্ত কাযের কাজি দৃষ্টিটা, অথচ মাঠের ছবি যথার্থ যদি দিতে হয় কি দেখতে হয় মাঠ কেমন করে চষা হয় এটা দেখানোর চেয়ে মাঠে কোথায় কি রং লেগেছে কি ফুল ফুটেছে ইত্যাদি নানা হিসেব না নিলে তো চলে না, সে হিসেবে ভাবুক দৃষ্টি ঠিক দেখার মতো দেখাই দেখলে বলতে হবে।

কাযের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে সৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ করে। কাযের মানুষ দেখে কেম্বিসটা পর্দা কি ব্যাগ অথবা জাহাজের পাল প্রস্তুতের বেশ উপযুক্ত, কিন্তু ভাবুক অমন মজবুত কাপড়টা একটা ছবি দিয়ে ভরে দেবারই ঠিক উপযোগী ঠাউরে নেয়। সাদা পাথর, কাযের দৃষ্টি বলে সেটা

পুড়িয়ে চুণ করে ফেল, ভাবুক দৃষ্টি বলে সেটাতে মূর্তি বানিয়ে নেওয়াই ঠিক। নির্মম স্বার্থদৃষ্টি, কাযের চোখ নিয়েই সাধারণ মানুষ নিজের মুঠোয় ফুটন্ত ফুলগুলোর গলা চেপে ধরে বলির পাঁঠার মতো, সেগুলোকে বাগানের বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পূজোর ঘরের দিকে চলে, আর ভাবুক যে দৃষ্টি নিয়ে ফুলের দিকে চায় তাতে স্বার্থের ভার এত অল্প যে প্রজাপতি কি মৌমাছির পাতলা ডানার অত্যন্ত লঘু অতি কোমল পরশও তার কাছে হার মানে। অতি মাত্রায় সাধারণ অত্যন্ত কাযের দৃষ্টি সেটা ফুলের গুচ্ছকে পরকালের পথ পরিষ্কারের ঝাঁটা বলেই দেখছে, ছেলেবেলার কৌতূহল-দৃষ্টি সেটা রাঙ্গা ফুলের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে ডাকাতের মতো বাগান থেকে বাগানের শোভাকে লুটে নিয়ে খেলতে চাচ্ছে। কিম্বা বিলাসের দৃষ্টি যেটা ফুলগুলোর বুকে সূঁচ বিঁধে বিঁধে ফুলের ফুলশয্যা রচনা করে তার উপরে লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন করে ফুলের শোভা মলিন করে দিয়ে যাচ্ছে। এদের চেয়ে ভাবুকের দৃষ্টি কতখানি নিঃস্বার্থ নির্মল অথচ আশ্চর্যরকম ঘনিষ্ঠভাবে ফুলকে দেখলে, ভাবুকের লেখাতেই ধরা রয়েছে—

"চল চলরে ভঁবরা কঁবল পাস
তেরা কঁবল গাবৈ অতি উদাস।
খোঁজ করত বহ বার বার
তন বন ফুল্যৌ ভার ভার॥"
—কবীর

কবি কালিদাস এই দৃষ্টি দিয়েই দুষ্মন্ত রাজাকে দেখালেন শকুন্তলার রূপ—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ......মধুনবমনাস্বাদিতরসম্!

কিন্তু রাজার বিদূষকের ইন্দ্রিয়পরায়ণ দৃষ্টি অত্যন্ত মোটা পেটের মতই মোটা ছিল, কাযেই রাজার কাছে শকুন্তলার বর্ণন শুনে সে পিণ্ডি খেজুর আর তেঁতুলের উপমা রাজাকে শোনাতে বসে গেল। রাজা বিদূষককে ধমকে বলেন—

অনবাপ্তচক্ষুঃফলোঽসি, যেন ত্বয়া দ্রষ্টব্যানাং পরং ন দৃষ্টম্॥

তুমি দর্শনীয় বস্তুর যেটি দেখবার যোগ্য সেইটি যখন দেখতে পেলে না তখন তুমি বিফলই চক্ষু পেয়েছো।

রাবণটার চেয়ে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা সমস্তই রামের দেখার চেয়ে দশগুণ বেশি ছিল—

"কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটা বদন
রাক্ষসের রাজা সেই লঙ্কার রাবণ।
ত্রিভুবন তাঁহার ভয়েতে কম্পবান
মনুষ্য রামেরে সেটা করে কীটজ্ঞান।"

রাবণের দশটা মাথার মধ্যে কি ভয়ঙ্কর রকম বস্তুগত বুদ্ধিই দিনরাত প্রবেশ করতো তার দশ দিকে বিস্‌তৃত দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদির রাস্তা ধরে, ভাবলেও অবাক হতে হয়। কিন্তু সীতার পণ ভাঙ্গা সুসাধ্য হল বালক রামের—কুড়ি-হাত রাবণের নয়। কেননা ধনুকভঙ্গের সময় রামের মনটি রামের হাতের পরশে গিয়ে যুক্ত হয়েছিল, আর রাবণের মন নিশ্চয়ই সীতার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিল, ধনুক তোলা ধনুক ভাঙ্গা যে ক'টা আঙ্গুলে হতে পারে তাদের ডগাতেও পৌঁছোয়নি সময়মতো।

দিনরাতের মধ্যে যে সব ঘটনা হঠাৎ ঘটে কিম্বা আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয় প্রতিদিনের বাঁধা চালের মধ্যে সেগুলোকে মানুষ খুব কাযে ব্যস্ত থাকলেও অন্ততঃ এক পলের জন্যেও মন দিয়ে না দেখে থাকতে পারে না। হঠাৎ পূব কি পশ্চিম আকাশ রঙ্গে রাঙ্গা হয়ে উঠলো; দৃষ্টির সঙ্গে মন তখনি যুক্ত হয়ে দেখে কি হল; পাড়ায় ট্রামের ঘন্টার টুং টাং এর উপরে হঠাৎ কোন সকালে বাঁশীর সুর বাজলে মন বলে ওঠে, কি শুনি? হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস ঘরের ঝাপটা নাড়িয়ে দিলে, মন যেন ঘুম ভেঙ্গে চমকে বলে, শীত গেল নাকি দেখি! পাড়ার যে ছেলেটা প্রতিদিন বাড়ির সামনে দিয়ে ইস্কুলে যায় তাকে দু'একদিনেই চিনে নিয়ে চোখ ছেলেটার দিকে ফেরা থেকে ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু সেই ছেলেটা হঠাৎ বাঁশী বাজিয়ে বর সেজে দুয়োর গোড়া দিয়ে শোভাযাত্রা করে যখন চলে তখন নয়ন মন শ্রবণ সবাই দৌড়ে দেখতে চলে—আর সেই দেখাটাই মনের মধ্যে লুকোনো রস জাগিয়ে দেয়

হঠাৎ। তাং রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্তো, নার্য্যোন জগ্‌মুর্ব্বিষয়ান্তরাণি তথাপি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরৈব প্রবিষ্টা। —যা হঠাৎ এল তার দিকে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের আকৃষ্ট হবার একটা চেষ্টা থেকে থেকে জাগে আমাদের সকলেরই। কিন্তু বাইরে থেকে প্রেরণাসাপেক্ষ চোখ কান ইত্যাদির এই কৌতূহল সব সময়ে জাগিয়ে রাখতে পারেন কেবল ভাবুকেরাই—বিশ্ব-জগৎ একটা নিত্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখা ধরা থাকে ভাবুকের রেখার টানে, লেখার ছাঁদে, বর্ণে ও বর্ণনে, কাযেই বলা চলে বুদ্ধির নাকে চড়ানো চলতি চশমার ঠিক উল্টো এবং তার চেয়ে ঢের শক্তিমান চশমা হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমাখানি।

এমন মানুষ নেই যার শ্রবণের সঙ্গে ছুটির ঘণ্টা আর কাযে যাবার ঘণ্টার ছেলেবেলা থেকেই বিশেষ যোগাযোগ আছে; কিন্তু সচরাচর এত কাযের ভিড়ে মানুষকে ঘিরে থাকে যে ভাবুক, মন দিয়ে এই ঘণ্টা শুনে যতক্ষণ না বলে দেন ঘণ্টা দুটো কি বলে ততক্ষণ ঘণ্টাটা শোনাই আমাদের হয় নি—যথার্থভাবে একথা বলা যায়। সবারই কানে আসে সন্ধ্যা পূজোর শঙ্খধ্বনি, সন্ধ্যায় আঁধার-করা ছবি চোখে পড়ে সবারই, কিন্তু সেই শঙ্খধ্বনি সন্ধ্যারাগের সঙ্গে মিলিয়ে সুর দিয়ে ছন্দ দিয়ে একটি অপরূপ রূপ ধরিয়ে যখন ভাবুক মানুষ আমাদের শুনিয়ে দিলেন দেখিয়ে দিলেন কেবল তখনই তো সন্ধ্যা, সন্ধ্যাপূজা এমন কি সন্ধ্যাকালের এই পৃথিবীকে যথার্থভাবে দেখতে শুনতে পেলেম আমরা—

"সন্ধ্যা হল গো—
ওমা সন্ধ্যা হল বুকে ধর
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর॥
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
আঁধার মাঝে হোক্ না জড়॥
আর আমারে বাইরে তোমার

www.bengaliebook.com

কোথাও যেন না যায় দেখা
তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন-সাঁঝের রশ্মিরেখা॥

আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি!
আমার বলে যাহা আছে, মা
তোমার করে সকল হর॥"

বুক সন্ধ্যার বুকের স্পন্দন অনুভব করলে, নয়নের দৃষ্টি অতল কালোর স্নেহভরা পরশ নিবিড় করে উপভোগ করলে, ফিরে এলো নতুন করে তরুণ দৃষ্টির করুণ চাহনি, নতুন করে জাগালো প্রাণভরে শুনে নেবার, গেয়ে ওঠবার ইচ্ছা, সারা সংসারে ছড়ানো জীবনের দিনগুলো সাঁঝের আঁধারের মধ্যে দিয়ে মিল্লো এসে একেবারে।

সন্ধ্যা তারার কোলের কাছটিতে রহস্য নিকেতনে, আলো আর কালোর ছন্দে প্রাণকে দুলিয়ে দিলে, রাতের সুরে গিয়ে মিল্লো দিনের সুর, আঁধারে গিয়ে মিশলো—আলো। একেবারে ঢেলে দেওয়া গেল সব স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজকে গভীর রিক্ততার প্রশান্ত আলিঙ্গনে। সন্ধ্যা, কতদিন ধরে যার সঙ্গে দেখা-শোনা হয়ে আসছে তাকে এমন করে দেখা ক'জন দেখলে? নিত্য সন্ধ্যার হাওয়াটা গড়ের মাঠে গিয়ে খেয়ে এসে এবং পূজো-বাড়িতে গিয়ে শাঁখঘণ্টা শুনে এসে আমরা পুঁথিগত ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রগুলোর চেয়ে একটুও অধিক দেখতে শুনতে পেলেম না। কিন্তু কবীর দুছত্রে সমস্ত সন্ধ্যার প্রাণটি একমুহূর্তে টেনে আনলেন আমাদের দিকে—

"সাঁঝ পড়ে দিন বীতরে
চকরী দীন্হা রোয়।
চল চকরা বা দেশকো
জঁহা রৈন ন হোয়॥"

এ কোন্ অগম্য দেশের খবর এসে পৌঁছল! রাত্রির পরপারে যুগল তারার রাজত্বে যাবার সকরুণ ডাক, ভীরু-পাখীর গলার সুর ধরে' এ কোন্ চির-

www.bengaliebook.com

মিলনের বাণী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছল যারা দেখেও দেখছে না, শুনেও শুনছে না, ধরেও ধরতে পারছে না তাদের কাছে!

যে চোখের দেখায় সন্ধ্যার অন্ধকার রাত্রির কালিমা শুধু আমাদের শঙ্কা আর সংশয়-বুদ্ধিই জাগিয়ে তোলে, ভাবুকের দেখা কি সেই চলতি চোখ দিয়ে দেখা, না তেমন শোনা দিয়ে, তেমন পরখ দিয়ে চেয়ে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা? এ সে ভাবুকের কবির শিল্পীর সেই দিব্য দৃষ্টি, যা অন্ধকারে আলো দেখলে, দুঃখের পরশেও আনন্দ পেল, অসীম স্তব্ধতার ভিতরে সন্ধান পেয়ে গেল সুরের—

"তিঁবির সাঁঝকা গহিরা আবৈ
ছাবৈ প্রেম মন অসেঁ
পশ্চিম দিগকী খিড়কী খোলো
ডুবহু প্রেম গগন মেঁ।
চেত-সংবল-দল রস পিয়োরে
লহর লেহ যা তনমেঁ॥
সংখ ঘণ্টা সহ নাই বাজে
শোভা-সিন্ধু মহল মেঁ॥"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, আঁধারের প্রেম তনু মনকে আবৃত করলে, আলো যে দিকে অস্ত যাচ্ছে সেই দুয়ার খোলো, এই সন্ধ্যাকাশের মত বিস্তৃত অন্ধকারের প্রেমে নিমগ্ন হও, চিত্ত-শতদল পান করুক রাত্রির রস, মনে লাগুক, মনে ধরুক অতল কালোর প্রেম-লহরী, সীমাহীন গভীরে বাজ্‌তে থাকুক আরতির শঙ্খঘণ্টা, মিলনের বাঁশি,—আঁধার-সমুদ্রে ফুটে উঠুক অপরূপ রূপ।

এ যে হৃদয়ে এসে মিলতে চাইলো নূতনতরো দেখা শোনা ছোঁয়া দিয়ে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে। আগে আসছিল মানুষের বাইরেটা তার বুদ্ধির গোচরে ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় যন্ত্রে ধরা, এখন চল্লো মানুষের অন্তরটা বাইরের সঙ্গে মিলতে হাতে হাতে চোখে চোখে গলায় গলায়—বাইরের আসা এবং বেরিয়ে যাওয়া এরি ছন্দ আবিষ্কৃত হ'ল ভাবুক মানুষের জীবনে। অভিনিবেশ করে

বস্তুতে ঘটনাতে নিবিষ্ট হবার শিক্ষা ও সাধনায় আপনার কার্যকরী ইন্দ্রিয়-শক্তি সকলকে নতুনতরো শক্তিমান করে তুল্লেন যে মুহূর্তে ভাবুক—সৌন্দর্যে অর্থে সম্পদে সৃষ্টির জিনিষ ভরে উঠলো, জগৎ এক অপরূপ বেশে সেজে দাঁড়ালো মানুষের মনের দুয়ারে; বারমহল ছেড়ে অভ্যাগত এল যেন অন্দরের ভিতর ভালবাসার রাজত্বে। রসের স্বাদ অনুভব করলে মানুষ, যেটা সে কিছুতে পেতে পারতো না যদি সে ইন্দ্রিয় সমস্তকে কেবলি প্রহরী ও মন্ত্রীর কায দিয়ে বসিয়ে রাখতো বুদ্ধির কোঠার দেউড়িতে। এই নতুন শিক্ষা, নতুন সাধনা যখন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো লাভ করলে, তখন মানুষের কণ্ঠ শুধু বলা-কওয়া হাঁক-ডাক করেই বসে রইলো না; সে গেয়ে উঠলো। হাতের আঙ্গুলগুলো নানা জিনিষ স্পর্শ করে নরম গরম কঠিন কি মৃদু ইত্যাদির পরখ করেই ক্ষান্ত হল না, তারা সংযত হয়ে তুলি বাটালি সূঁচ হাতুড়ি এমনি নানা জিনিষকে চালাতে শিখে নিলে, বীণা-যন্ত্রের উপরে সুর ধরতে লাগলো হাত আঙ্গুলের আগা, শুধু লোহার তারকে তার মাত্র জেনেই ক্ষান্ত হল না, সুরের তার পেয়ে যন্ত্রের পর্দায় পর্দায় বিচরণ করতে থাকলো আঙ্গুলের পরশ গুন্ গুন্ স্বরে ফুলের উপরে ভ্রমরের মতো, কোলের বীণার সঙ্গে যেন প্রেম করে চল্লো হাত, কাণ শুনতে লাগলো প্রেমিকের মতো কোলের বীণার প্রেমালাপ। সরু সূঁচের, সোনার সূতোর, রংএ ভরা তুলির সজীব ছন্দ ধরে তালে তালে চল্লো আঙ্গুল, হাতুড়ি বাটালির ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করতে শিক্ষা নিলে শিল্পীর হাত—কাযের ভিড় থেকে মানুষের চোখ ও হাত, সেই সঙ্গে মনও ছুটি পেয়ে খেলাবার ও ডানা মেলবার অবসর পেয়ে গেল।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি—এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তো নয়, সৃষ্টির বাইরে যা তাকেও ধরবার জন্যে ভাবুক আরো এক নতুন নেত্র খুল্লেন—খুবই প্রখর দৃষ্টি যার এমন যে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র তাকেও হার মানালে মানুষের এই মানস-নেত্র, চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না,—দূরবীক্ষণের দূরদৃষ্টিরও অগম্য যে স্থান। মানুষ এই আর এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীয়ান্ হয়ে নিজের মনের দেখা নিয়ে বিশ্বরাজ্যের পরপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল—সেই রাজত্বে যেখানে সৃষ্টির অবগুণ্ঠনে নিজকে আবৃত করে স্রষ্টা রয়েছেন গোপনে—

"যথাদর্শে তথাত্মনি যথাপ্‌স্যুৎপরিব তথা গন্ধর্ব্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে৷"

এই ব্রহ্মলোক যেখানে ছায়া-তপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধর্বলোক যেখানে রূপ ও সুর উভয়ে জলের উপরে যেন তরঙ্গিত হচ্ছে, এবং আত্মার মধ্যে যেখানে নিখিলের সমস্তই দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত দেখা যাচ্ছে, সমস্তই দিব্য দৃষ্টিতে পরশ ও পরখ করে নিলে মানুষ। দর্শকের ও শ্রোতার জায়গায় বসে মানুষ দেখবার মতো করে দেখলে, শোনবার মত করে শুনে নিলে নিখিলের এই রূপের লীলা সুরের খেলা, এবং এরও ওপরে যে লীলাময় মানুষকে সমস্ত পদার্থ সমস্ত বস্তুর সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে একই নাট্যশালায় নাচিয়ে গাইয়ে চলেছেন তাঁকে পর্যন্ত ছুঁয়ে এল মানুষ নেপথ্য সরিয়ে। দেখা শোনা পরশ করার চরম হয়ে গেল, তারপর এল দেখানোর পালা। মানুষ এবারে আর এক নতুন অদ্‌ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভূতপূর্ব সৃষ্টি সাধন করে গুণী শিল্পী হয়ে বসলো। এই দৃষ্টিবলে আপনার কল্পনালোকের মনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি বার করে আনতে লাগলো। যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, দ্রষ্টা হয়ে বসলো দ্বিতীয় স্রষ্টা। অরূপকে রূপ দিয়ে, অসুন্দরকে সুন্দর করে, অবোলাকে সুর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, রঙ্গহীনকে রং দিয়ে চল্লো মানুষ—

"প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা'
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে॥"

মত ও মন্ত্র

শিল্পকে পাওয়া আর বাস্তব শিল্পকে পাওয়ার মানেতে তফাৎ আছে— "There is true and false realisation, there is a realisation which seeks to impress the vital Essence of the subject and there is a realisation which bases its success upon its power to present a deceptive illusion." —R. G. Hatton. বহির্জগতের কাল্পনিক প্রতিলিপিই চিত্র, মনোজগতে ধরা নানা বস্তুর যে স্মৃতি তার আলেখ্যই চিত্র,—এ দুটোই মত, মন্ত্র নয়। বাইরে যা দেখছি খুঁটে খুঁটে তার কাপি নেওয়া কিম্বা চোখ উল্টে ভিতরের দিকে

বাইরেরই যে সব স্মৃতি রয়েছে জমা তার হুবহু ছাপ তোলায় তফাৎ একটুও নেই, দুটোই একজাতির চিত্র—এও ছাপ সেও ছাপ, কাপি ছবি নয়। ফটো যন্ত্র বাইরের গাছপালার ছাপ নেয়, আর আচার্য জগদীশচন্দ্রের কল গাছের ভিতরকার ব্যাপারের রেকর্ড তোলে, দুটোই কিন্তু কল, artist নয় ; ধর, কোন উপায়ে যদি কল দুটোই বেঁচে উঠে কাজে লেগে যায় তা হ'লেও তারা কি artist, একথা বলাতে পারবে আপনাদের? চোখের সামনে সূর্যোদয় আর অতীত সমস্ত সূর্যোদয়ের স্মৃতিচিত্র (memory picture) দুয়ের মধ্যেও না হয় রং চংএর তফাৎ হ'ল, কিন্তু তাই বলে একটা আর্ট আর অন্যটা আর্ট নয়, স্মৃতির যথাযথ প্রতিলিপিই আর্‌ট, সামনের যথাযথটা আর্ট নয়, কিম্বা সামনেরটাই আর্ট আর মনেরটা ঠিক তার উল্টো জিনিষ, এ তর্ক উঠতেই পারে না, কেননা যথাযথ প্রতিলিপি, তা সে এ-পিঠেরই হোক বা ও-পিঠেরই হোক, সে কাপি, এবং যারা তা করছে তারা নকলই করছে, কেউ আসল গড়ছে না। মুখস্থ আউড়ে গেল পাখী একটু না হয় ভুল করে তার পাঠ, বলে গেল ছেলে পরিষ্কার বইখানার পাতা খুলে—দু'জনেই পুনরুক্তি করলে, অন্যের কথার প্রতিধ্বনি দিলে, বানিয়ে দুটো রূপকথা বল্লে না, ছড়া কাটলে না, কেননা কল্পনা নেই দুজনেরই, কাজেই রচনা করলে না তারা কেউ, সুতরাং আর্টিষ্ট হবার দিকেও গেল না এরা, নকলনবিশ হয়েই রইল। কল্পনাশূন্য চোখের দেখা বা ওই ভাবে চোখে দেখার স্মৃতি শিল্প-শব্দকল্পদ্রুম লিখতে হ'লে এর মানে দিতে হবে গাছের জড় বা শিকড় ; জড় সে জগৎকে আঁকড়ে রয়েছে, খুব কাজের জিনিষ কল্পনা এবং রচনার রস যেমনি শিকড়ে লাগলে আমনি ডাল পাল বিস্তার না করে সে থাকতে পারলে না। নিশ্চল মাটির তলায় অন্ধকার ছেড়ে সে প্রকাশিত হ'ল আলোর জগতে, ভাবের বাতাস লাগলো তার দেহে, ফুটলো পাতা হ'য়ে ফুল হ'য়ে ফল হ'য়ে, হাওয়ায় দুল্লো রূপের ডালি, রসের রচনা বীজের মধ্যে যতটা বস্তু এবং শিকড়ের মধ্যে যতটা সঞ্চয় ছিল তাই নিয়ে! বাইরেটা এবং বাইরের স্মৃতিটা শিল্পীর ভাণ্ডার, শিল্পীর কল্পনালক্ষ্মী সেখান থেকে এটা ওটা সেটা নিয়ে নানা সামগ্রী বানিয়ে পরিবেশন করেন। মূর্খেরাই কেবল এই ভাণ্ডারকে হোটেল এবং দোকান বলে' ভ্রম করে যেখানে ready-made সমস্ত পাওয়া যায়—"People regard Nature as a store-house of ready-made ornaments instead of a book of reference for ideas and principles to be thought out with

diligence and applied with care. Ready-made ornaments are too often like ready-made clothes badly fitting and ill-suited to the subject.–Frank Jackson.

যে গড়ছে বা আঁকছে তার মনের কল্পনার সংস্পর্শ-শূন্য ছবি কলে এঁকেছে মানুষ, হাতেও গড়েছে কেষ্টনগরের পুতুল,—ঘটনার যথাযথ প্রতিরূপ। শিল্পের যতগুলো কৌশল, রূপ, প্রমাণ, ভাবলাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ, anatomy, perspective, shade-and-light, depth, space, movement ইত্যাদির নিয়মাবলী নির্ভুল ও সম্পূর্ণভাবে মেনে চল্লো কেষ্টনগরের কারিগরের গড়নটি কিন্তু এই বাস্তবের নিয়ম মেনে চলার ফলে একটা গ্রীক প্রস্তরমূর্তির সঙ্গে কি ঘুরণী পাড়ার মাটির পুতুলটিকে সমান করে তুলতে পারলে, না এইটেই প্রমাণ করলে যে মানুষ চেষ্টা করলে কলের চেয়ে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ নকল নিতে পাকা হয়ে উঠতে পারে? বাস্তবের দিকে যেমন দেখা গেল, কল্পনাশূন্য বাস্তব ছবি নেওয়া চল্লো বহির্জগতের, তেমনি অন্তর্জগতের বাস্তবস্পর্শ-শূন্য নিছক কল্পনার একটা কিছু ধরবার চেষ্টা করা যাক। কিন্তু কোথায় তেমন জিনিষ ? সত্যপীরের মাটির ঘোড়া, কালীঘাটের পট, নতুন বাঙলার আমাদের ছবি, পুরোণো বাংলার দশভুজা এর একটাও নিছক কাল্পনিক জিনিষ নয়, এরা সবাই বাস্তবকে ধরে তবে তো প্রকাশ হ'ল? মন যে বাস্তবকে স্পর্শ করেই আছে, নানা বস্তুর নানা ভাবের স্মৃতি জমা হচ্ছে মনে। নিছক কল্পনা সে মনেই উঠতো মনেই থাকতো যদি না বাস্‌তব-জগতের ভাব ও রূপের সংস্পর্শে সে আসতো। অসীমের কল্পনা তাও সীমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়, সমুদ্রের অসীম বিস্তার ডাঙার সীমারেখাতে এসে না মিল্লে ছবি হয় না, নকল যা তার সঙ্গে কল্পনার একটুও যোগ নেই কিন্তু বাস্তব জিনিষের সঙ্গে আমার স্মৃতির সঙ্গে কল্পনার যোগ সসীম থেকে আরম্ভ করে' অসীমের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে দেখা যাচ্ছে। এই চোখের সামনে যে বিদ্যমান সৃষ্টি এটার মূলে দেখি সৃষ্টির কল্পনা রয়েছে, তাই এ এত বিচিত্র ও মনোহর—একটা গাছ আর একটার, একটি ফুল আর একটির, এক জীব আর এক জীবের, এক দিন আর এক দিনের মতো নয়; নীল আকাশ একই চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ে পলে পলে আলো-অন্ধকারে নতুন থেকে নতুন স্বপ্ন রচনা করে চলেছে চিরকাল ধরে, পুরোণো আর হতে চাচ্ছে না এই পৃথিবী, শুধু এর পিছনে রচয়িতার কল্পনা

এবং দর্শকের কল্পনা কাজ করছে বলেই। বহির্জগৎ যেমন সৃষ্টি, তেমনি ঐ সত্যপীরের ঘোড়া, সেটা ঘোড়া নয় অথচ ঘোড়া, কালীঘাটের পট যেটা প্রকৃতির নয় কিন্তু নানা রূপ ধরেছে এটার ওটার সেটার রেখা নানা রঙ্গের নানা তাক বাকের সাহায্যে, এরাও সৃষ্টি; দেখতে কেউ বড় সৃষ্টি, কেউ ছোট সৃষ্টি, কেউ ভাল সৃষ্টি, কেউ হয় তো বা অনাসৃষ্টি, কিন্তু সৃষ্টি, নকলের মতো প্রতিবিম্ব নয়।

যে শিল্পজগৎ সত্য কল্পনার দ্বারা সজীব নয় সে বুদ্‌বুদের উপরে প্রতিবিম্বিত জগৎ-চিত্রটির মতো মিথ্যা ও ভঙ্গুর; দর্পণের উপরেই তার সমস্তখানি কিন্তু দর্পণের কাচ ও পারার এবং বুদ্‌বুদের জলবিন্দুটির যতটুকু সত্তা—তাও তার নেই। রচনা যেখানে রচয়িতার স্মৃতি ও কল্পনার কাছে ঋণী সেইখানেই সে আর্ট, যেখানে সে অন্যের রচনা ও কল্পনার কাছে ঋণী সেখানে সে আর্ট নয়, আসলের নকল মাত্র। হোমার, মিল্টন দুজনেই অন্ধ ও কবি কিন্তু বিদ্যমান ও অবিদ্যমানের দুয়েরই ঋণ বিষয়ে তাঁরা অন্ধ ছিলেন না তাঁরা বাস্তব কল্পনা করে' গেছেন অন্ধ কল্পনা করেননি। কালিদাস, ভবভূতি চক্ষুষ্মান কবি কিন্তু তাঁরাও কল্পনা বাদে বাস্তব কিম্বা বাস্তব বাদে কল্পনার ছবি রেখে যান নি। গানের সুর সম্পূর্ণ কাল্পনিক জিনিষ কিন্তু এই বাস্তব জগতের বায়ুতরঙ্গের উপর তার প্রতিষ্ঠা হ'ল, কথার ছবির সঙ্গে সে আপনাকে মেলালে তবে সে সঙ্গীত হয়ে উঠলে,—অনাহত আপনাকে করলে আহত বাতাস ধরে, কিন্তু হরবোলার বুলি বাস্তব জগতের সঠিক শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি দিলে সেইজন্য সে সঙ্গীত হওয়া দূরের কথা খুব নিকৃষ্ট যে টপ্পা তাও হ'ল না। বাস্তবকে কল্পনা থেকে কতখানি সরালে কিম্বা কল্পনাকে বাস্তব থেকে কতটা হঠিয়ে নিলে art হয় এ তর্কের মীমাংসা হওয়া শক্ত, কিন্তু কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, চোখে-দেখা জগতের সঙ্গে মনে-ভাবা জগতের মিলন না হলে যে art হবার জো নেই এটা দেখাই যাচ্ছে। "One of the hardest thing in the world is to determine how much realism is allowable to any particular picture." —Burn Jones. এই হ'ল ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ চিত্রকর Burn Jonesএর কথা। অনেক দিন ধরে চিত্র এঁকে যে জ্ঞান লাভ করলেন শিল্পী তারি ফলে বুঝলেন যে বস্তুতন্ত্রতা ছবিতে কতখানি সয় তা ঠিক করা মুস্কিল। ইংরেজ শিল্পী এখানে কোন মত

দিলেন না, ছবি আঁকতে গেলে সবারই যে প্রশ্ন সামনে উদয় হয় তাই লিখলেন, কিন্তু আমাদের দেশে মত দেওয়া যেমন সুলভ, মত ধরে চলাও তেমনি সাধারণ—কে চিত্রবিদ তার সম্বন্ধে পরিস্কার মত, কি চিত্র তারও বিষয়ে পাকা শেষ মত প্রচারিত হ'ল এবং সেই সব মতের চশমা পরে' ভারতবর্ষের চিত্রকলার আদর্শগুলোর দিকে চেয়ে দেখে' অজন্তার শিল্পও আমাদের শ্রদ্ধেয় অক্ষয়চন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের চোখে কি ভাবে পড়লে তার পরিষ্কার ছবি কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীর কষ্টিপাথর থেকে তুলে দিলেম—"যাহা ছিল তাহা নাই। যাহা আছে সেই অজন্তাগুহার চিত্রাবলী, তাহাতে যাহা আছে, তাহা কিন্তু চিত্র নহে চিত্রাভাস। তাহা পুরাতন ভারতচিত্রের অসম্যক্ নিদর্শন, চিত্র-সাহিত্যদর্পণের দোষ-পরিচ্ছেদের অনায়াসলভ্য উদাহরণ। তাহা কেবল বিলাসব্যসনমুক্ত যোগযুক্ত অনাসক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিভৃত নিবাসের ভিত্তি বিলেপন...ভারতচিত্রোচিত প্রশংসা লাভের অনুপযুক্ত। তাহা এক শ্রেণীর পূর্ত কর্ম ...তাহাতে যাহা কিছু চিত্রগুণের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অযত্নসম্ভূত আকস্মিক,...চিত্র-গুণের এবং চিত্র-দোষের যথাযথ পর্যবেক্ষণে যাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট অজন্তা-গুহা চিত্রাবলী ভারত চিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন বলিয়া মর্যাদা লাভ করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের তুলিকাসম্পাতে এই সকল ভিত্তি-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহারাও পুরাতন ভারতবর্ষে 'চিত্রবিৎ' বলিয়া কথিত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা নমস্য; কিন্তু চিত্রে নহে, চরিত্রে। তাঁহাদের ভিত্তি-চিত্রও প্রশংসার্হ; কিন্তু কলা-লালিত্যে নহে, বিষয়-মাহাত্ম্যে।" (শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র, ভারত চিত্র চর্চ্চা)। মতের চশমা দিয়ে দেখলে অজন্তার ছবিতে কেন চাঁদের মধ্যেও অপরিণতি ও কলঙ্ক দেখা যায় এবং সেই দোষ ধরে বিশ্বকর্মাকেও বোকা বলে' উড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু সৃষ্টির প্রকাশ হ'ল স্রষ্টার অভিমতে, শিল্পের প্রকাশ হ'ল শিল্পীর অভিমতটি ধরে', ব্যক্তিবিশেষের বা শাস্ত্রমতবিশেষের সঙ্গে না মেলাই তার ধর্ম, কাযেই কলঙ্ক ও অপরিণতি যেমন হয় চাঁদের পক্ষে শোভার কারণ, শিল্পের পক্ষেও ঠিক ঐ কথাটাই খাটে। চিত্র-ষড়ঙ্গের কতখানি পরিপূর্ণতা পেলে চিত্র চিত্র হবে চিত্রাভাস হবে না, মডেল ড্রয়িং কতখানি সঠিক হ'লে তবে অজন্তার ছবিকে বলব চিত্র আর কতখানি কাঁচা থাকলে অজন্তার চিত্রাবলী হবে "চিত্র সাহিত্যদর্পণের দোষ-পরিচ্ছেদের অনায়াসলভ্য

উদাহরণ” তা বলা কঠিন, তবে পাকা ড্রয়িং হলেই যে সুন্দর চিত্র হয় না এটা বিখ্যাত ফরাসি শিল্পী রোঁদা বলেছেন—“It is a false idea that drawing in itself can be beautiful. It is only beautiful through the truths and the feeling that it translates….There does not exist a single work of art which owes its charm only to balance of line and tone and which makes appeal to the eye alone.” —Rodin. আদর্শ জিনিষটি নিছক অবিদ্যমান জিনিষ, বস্তুতঃ তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলন অসম্ভব, ধর্মে-কর্মে, শিল্পে সমাজে, ইতিহাসে, কোন দিক দিয়ে কেউ মেলেনি, না মেলাই হ’ল নিয়ম। সৃষ্টিকর্তার নিরাকার আদর্শ যা আমরা কল্পনা করি তার সঙ্গে সৃষ্ট বস্তুগুলো এক হ’য়ে মিল্লে সৃষ্টিতে প্রলয় আসে, তেমনি শাস্ত্রের আদর্শ গিয়ে শিল্পে মিল্লে শিল্প লোপ পায়—থাকে শুধু শাস্ত্রের পাতায় লেখা ভারত-শিল্পের ছ’ছত্র শ্লোক মাত্র। দাঁড়ি পাল্লা বাটখারা ইত্যাদি নিয়ে চাল ডাল ওজন করা চলে, ছবির চারিদিকের গিল্টির ফ্রেমখানাও ওজন করা যায়, ছবির কাগজটা—মায় রংএর ডেলা, রংএর বাক্স, তুলি এমন কি শিল্পীকে পর্যন্ত সঠিক মেপে নেওয়া চলে, কিন্তু শিল্পরস যে অপরিমেয় অনির্বচনীয় জিনিষ, শাস্ত্রের বচন দিয়ে তার পরিমাণ করবে কে? তাই শাস্ত্রকারদের মধ্যে যিনি রসিক ছিলেন, শিল্প সম্বন্ধে লেখবার বেলায় মতের আকারে মনোভাব প্রকাশ করলেন না তিনি; শিল্পের একটি স্তোত্র রচনা করে অলঙ্কারশাস্ত্রের গোড়া পত্তন করলেন, যথা—“নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্তপরতন্ত্রাং। নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধীতি ভারতী কবের্জয়তি॥” নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা আনন্দের সঙ্গে একীভূত অনন্তপরতন্ত্র নবরসরুচির নির্মিতিধারিণী যে কবি ভারতী তাঁর জয়। শুধু ভারতশিল্পের জন্য নয়, কাব্যচিত্র ভাস্কর্য সঙ্গীত নাট্য নৃত্য সব দেশের সব শিল্পের সবার জন্য এই মন্ত্রপূত সোণার পঞ্চপ্রদীপ ভারতবর্ষ ছেড়ে যে মানুষ একদিনও যায়নি সে জ্বালিয়ে গেছে। মতের ফুৎকারে এ কোন দিন নেভ্‌বার নয়, কেননা রস এবং সত্য এই দুই একে অমৃতে সিঞ্চিত করেছে। সূর্যের মতে দীপ্যমান এই মন্ত্র, এর আলোয় সমস্ত শিল্পেরই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, কল্পনারাজ্য ও বাস্তবজগৎ যেমন পরিষ্কার করে দেখা যায় এমন আর কিছুতে নয়। মতগুলো আলেয়ার মত বেশ চক্‌মকে ঝকঝকে কিন্তু

আলো দেয় যেটুকু তার পিছনে অন্ধকার এত বেশী যে, সেই আলেয়ার পিছনে চলতে বিপদ পদে পদে।

শিল্প সম্বন্ধে বা যে কোন বিষয়ে যখন মানুষ মত প্রচার করতে চায় তখন একটা সৃষ্টিছাড়া আদর্শ আঁকড়ে না ধরলে মতটা জোর পায় না; "খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে"। শিল্প বিষয়ে মত যাঁরা দিলেন তাঁদের কাছে আদর্শই হ'ল মুখ্য বিষয়, আর শিল্পটা হ'ল গৌণ; শিল্পের মন্ত্রগুলো তা নয়, শিল্পকেই মুখ্য রেখে তারা উচ্চারিত হ'ল। এই মত থেকে দেখি ভারত-শিল্প মিশর-শিল্প চীন-শিল্প পাশ্চাত্য-শিল্প প্রাচ্য-শিল্প—এখানে শিল্পে শিল্পে ভিন্ন, শিল্পীতে শিল্পীতে ভিন্ন, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কারু মতে বেরাল-চোখ কারু মতে পদ্ম-আঁখি; কারু মতে সাদা কারু মতে কালো হ'ল ভাল, কিন্তু রসের ও সৌন্দর্যের যে মন্ত্র স্তন্যধারার মতো বিভিন্ন শিল্পকে এক করেছে সেটি প্রাণের রাস্তা ধরে' চলেছে, মতের এতটুকু নালা বেয়ে নয়, কাজেই সে ধার দিয়ে শিল্পের বড় দিকটাতেই আমাদের নজর পড়ে। শিল্পের আপনার একটা যে জগৎজোড়া আদর্শ রয়েছে তাকেই লক্ষ্য করে চলেছে এ যাবৎ সব শিল্পী ও সব শিল্প তাই রক্ষে, না হ'লে শাস্ত্রের মতের পেষণে শিল্পকে ফেল্লে এক দিনে শিল্প ছাতু হ'য়ে যেতো। ভারতীয় মতে বিশুদ্ধ ছাতু কিম্বা ইউরোপীয় মতে পরিষ্কার ধবধবে বিস্কুটের গুঁড়োর পুনরাবির্ভাবের জন্য শিল্পার্থীরা প্রাণপাত করতে উদ্যত হয়েছে, এ দৃশ্য অতি মনোরম এটা বেদব্যাস বল্লেও আমি বলব নহি নহি, এভাবে শিল্পকে পাওয়া না পাওয়াই। যা এক কালে হ'য়ে গেছে তা সম্ভব হবে না কোন দিন—"Efforts to revive the art principles of the past will at best produce an art that is still-born. It is impossible for us to live and feel, as did the ancient Greeks. In the same way those who strive to follow the Greck methods in sculpture achieve only a similarity of form, the work remaining soulless for all the time. Such imitation is mere aping." –Kandinsky. যে সমস্ত শিল্প সম্ভূত হয়ে গেছে তাদের আজকের দিনে আবার সম্ভব করে তোলবার চেষ্টা—যে একবার জন্মেছে তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করাবার চেষ্টার মতোই পাগলামি। বিদ্যমান ছবি যা বাতাসের মধ্যে আলোর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার বিরাট কল্পনার প্রেরণায় অত্যাশ্চর্য রূপ পেয়ে এসেছে তাকে চারকোণা এতটুকু কেম্বিসে তেল-জলের সাহায্যে দ্বিতীয় বার জন্ম দিতে চায় কোন পাগল?

অগ্নিশিখাকে যতই সঠিক নকল কর সে আলো দেবে না তাপও দেবে না ; শুধু ভ্রান্ত একটা সাদৃশ্য দেবে 'ইব'তে গিয়ে যার শেষ। বায়ুগতিতে পতাকার বিচলন দেখাতে পারলেই যদি মানুষ শাস্ত্রমতে চিত্রবিদ হ'ত—তবে ছবি যারা আঁকে এবং ছবি যারা দেখে সবাইকে বায়স্কোপের কর্তার পায়ের তলায় মাথা নোয়াতে হত। শিল্পীর কল্পনায় শিল্পের জিনিষ আগুন হয়ে জ্বলে, বাতাস হয়ে বয়, জল হ'য়ে চলে, উড়ে আসে মনের দিকে সোনার ডানা মেলে, নিয়ে চলে বিদ্যমান ছাড়িয়ে অবিদ্যমান কল্পনা ও রসের রাজত্বে দর্শক ও শ্রোতার মন—এই জন্যেই শিল্পের গৌরব করে মানুষ। বায়স্কোপের চলন্ত বলন্ত ভয়ঙ্কর রকমের বিদ্যমানের পুনরুক্তিকে মানুষ 'সশ্বাস ইব' অতএব চিত্র বলে তখনি মত প্রকাশ করে যখন তার বায়ু বিষম কুপিত হয়েছে। এখনকার ভারত-শিল্পের সাধনা অনাগত অজ্ঞাত যা তারি সাধন না হয়ে যদি পূর্বগত প্রাচীন ও আগত আধুনিক এবং সম্ভূত শিল্পের আরাধনাই হয় সবার মতে, তবে কলাদেবীর মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি যথেষ্ট উঠবে কিন্তু এক লহমার জন্যেও শিল্পদেবতা সেখানে দেখা দেবেন না; "যস্যামতঃ তস্য মতং যস্য ন বেদ সঃ'। বিদ্যমান যে জগৎ তাকে প্রতিচ্ছবি দ্বারা বিদ্যমান করা মানে পুনরুক্তি দোষে নিজের আর্টকে দুষ্ট করা। বিদ্যমান জগৎ বিদ্যমানই তো রয়েছে, তাকে পুনঃ পুনঃ ছবিতে আবৃত্তি করে ড্রয়িং না হয় মানুষ পেলে, রূপকে চিনতে শিখলে, রংকে ধরতে শিখলে—কিন্তু এতো প্রথম পাঠ। এইখানেই যে ছেলে পড়া শেষ করলে সে কি শিল্পের সবখানি পেলে? অথবা মানুষের চেষ্টা তার কল্পনাতেই রয়ে গেল, অবিদ্যমান অবস্থাতেই মূকের স্বপ্ন দর্শনের মতো হ'ল ছেলেটির দশা! অন্ধের রূপকল্পনার মতো অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মধ্যে ধরতে সক্ষম রইলো সে নির্বাক ও চক্ষুহারা? একে রইলো বাইরে বাঁধা, অন্যে রইলো ভিতরে বাঁধা।

শিল্পকে জানতে হ'লে যেখান থেকে কেবল মতই বার হ'চ্ছে সেই টোলে গেলে আমাদের চলবে না। ঋষি ও কবি এবং যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা তাঁদের কাছে যেতে হবে চিত্রবিদ্‌কে। এর উত্তর কবীর দিয়েছেন চমৎকার—

"জিন বহ চিত্র বনাইয়া
সাঁচা সূত্রধারি

www.bengaliebook.com

কহহী কবীর তে জন ভলে
চিত্র বংত লেহি বিচারি।"

যিনি এই চিত্রের রচয়িতা তিনি সত্য সূত্রধর; সেইজন শ্রেষ্ঠ, যে চিত্রের সহিত চিত্রকরকেও নিলো বিচার করে'।

"বিদ্যমান এই যে জগৎ-চিত্র এর উৎপত্তিস্থান অবিদ্যমানের মধ্যে",—চিত্রের রহস্য এক কথায় প্রকাশ করলেন ঋষিরা।

ঘটনের মূলে রচনের মূলে শিল্পের মূলে শিল্পী না শাস্ত্র-এ বিষয়ে পরিষ্কার কথা বল্লেন ঋষি—"সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" কল্পনাতীত প্রদীপ্ত পুরুষ, নিমেষে নিমেষে ঘটনা সমস্তের জাতা তিনি। অমুক শর্মার না বিশ্বকর্মার অভ্রান্ত শিল্পের প্রসাদ পেতে হবে মানুষ শিল্পীকে? সে সম্বন্ধে ঋষিদের আশীর্বচন উচ্চারিত হ'ল, "হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ। ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবত্ত্বাং প্রসীদতু"।

হংস এল সাদা হয়ে, শুক এল সবুজ হয়ে, ময়ূর এল বিচিত্র হয়ে, তারা সেই ভাবেই জগৎচিত্রের মধ্যে গত হয়েই রইল, অবিদ্যমানকে জানতে পারলে না। রচনাও করতে পারলে না কল্পনাও করতে চাইলে না। মানুষ মনের মধ্যে ডুব দিয়ে অবিদ্যমানের মধ্যে বিদ্যমানকে ধরলে, —সে হ'ল শিল্পী, সে রচনা করলে, চিহ্নবর্জিত যা ছিল তাকে চিহ্নিত করলে, পাথরের রেখায় রঙ্গের টানে সুরের মীড়ে গলার স্বরে।

বর্ষার মেঘ নীল পায়রার রং ধরে এল, শরতের মেঘ সাদা হাঁসের হাল্কা পালকের সাজে সেজে দেখা দিলে, কচি পাতা সবুজ ওড়না উড়িয়ে এল বসন্তে, নীল আকাশের চাঁদ রূপের নূপুর বাজিয়ে এল জলের উপর দিয়ে, কিন্তু এদের এই অপরূপ সাজ দেখবে যে সেই মানুষ এল নিরাভরণ নিরাবরণ, শীত তাকে পীড়া দেয়, রৌদ্র তাকে দগ্ধ করে, বাস্তব জগৎ তার উপরে অত্যাচার করে বিশ্বচরাচরে রহস্যের দুর্লঙঘ্য প্রাচীরের মধ্যে তাকে বন্দী করতে চায়—এই মানুষ স্বপন দেখলে অগোচরের অবাস্তবের অসম্ভবের অজানার, সেই দেখার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি বদল করে' নিলে সৃষ্টির

বাইরে এবং সৃষ্টির অন্তরে যে তার সঙ্গে অদ্বিতীয় শিল্পীর অপরাজিত প্রতিনিধি মানুষ মনোজগতের অধিকারী বহির্জগতের প্রভু।

শিল্প ও দেহতত্ত্ব

কিছুর নোটিস যে দিচ্ছে, ঘটনা যেমন ঘটেছে তার সঠিক রূপটির প্রতিচ্ছায়া দেওয়া ছাড়া সে বেচারা অনন্যগতি; সে যদি ভাবে সে একটা কিছু রচনা করছে তো সেটা তার মস্ত ভ্রম। ডুবুরি সমুদ্রের তল ঘেঁটে মুক্তার শুক্তি তুলে আনে, খুবই সুচতুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার, কিন্তু সে কি বলাতে পারে আপনাকে মুক্তাহারের রচয়িতা, না, যে পাহাড় পর্বত দেশে বিদেশে ঘুরে' ফটোগ্রাফ তুলে আনছে সে নিজেকে চিত্রকর বলে' চালিয়ে দিতে পারে আর্টিষ্ট মহলে? একটুখানি বুদ্ধি থাকলেই আর্টের ইতিহাস লেখা চলে, কিন্তু যে জিনিষগুলো নিয়ে আর্টের ইতিহাস তার রচয়িতা ইতিহাসবেত্তা নয় রসবেত্তা—নেপোলিয়ান বীর রসের অ◌ার্টিষ্ট, তাঁর হাতে ইউরোপের ইতিহাস সৃষ্ট হল, সীজার আর্টিষ্ট গ'ড়লে রোমের ইতিহাস। যে ডুবে' তোলে সে তোলে মাত্র বুদ্ধিবলে; আর যে গড়ে' তোলে সে ভাঙাকে জোড়া লাগায় না শুধু, সে বেজোড় সামগ্রীও রচনা করে' চলে মন থেকে। ইতিহাসের ঘটনাগুলো পাথরের মতো সুনির্দিষ্ট শক্ত জিনিষ, এক চুল তার চেহারার অদল বদল করার স্বাধীনতা নেই ঐতিহাসিকের, আর ঔপন্যাসিক কবি শিল্পী এঁদের হাতে পাষাণও রসের দ্বারা সিক্ত হয়ে কাদার মতে নরম হয়ে যায়, রচয়িত তাকে যথা ইচ্ছা রূপ দিয়ে ছেড়ে দেন। ঘটনার অপলাপ ঐতিহাসিকের কাছে দুর্ঘটনা, কিন্তু আর্টিষ্টের কাছে সেটা বড়ই সুঘটন বা সুগঠনের পক্ষে মস্ত সুযোগ উপস্থিত করে দেয়। ঠিকে যদি ভুল হয়ে যায় তবে সব অঙ্কটাই ভুল হয়; অঙ্কনের বেলাতেও ঠিক ওই কথা। কিন্তু পাটিগণিতের ঠিক আর খাঁটি গুণীদের ঠিকের প্রথা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র;—নামতা ঠিক রইলো তে অঙ্ককর্তা বল্লেন, ঠিক হয়েছে, কিন্তু নামেই ছবিটা ঠিক মানুষ হলো কি গরু গাধা বা আর কিছু হলো, রসের ঠিকানা হলো না ছবির মধ্যে, অঙ্কনকর্তা বলে' বসলেন, ভুল! ঐতিহাসিকের কারবার নিছক ঘটনাটি নিয়ে, ডাক্তারের কারবার নিখুঁত হাড়মাসের anatomy নিয়ে, আর আর্টিষ্টদের কারবার অনির্বচনীয় অখণ্ড রসটি নিয়ে। আর্টিষ্টের কাছে ঘটনার ছাঁচ পায় না রস, রসের ছাঁদ পেয়ে বদলে যায় ঘটনা, হাড়মাসের

ছাঁচ পায় না শিল্পীর মানস কিন্তু মানসের ছাঁদ অনুসারে গড়ে' ওঠে সমস্ত ছবিটার হাড় হদ্দ, ভিতর বাহির। একটা গাছের বীজ, সে তার নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি যেমনটি পেয়েছে সেই ভাবেই যখন হাতে পড়লো, তখন সে গোলাকার কি চেপ্টা ইত্যাদি, কিন্তু সে থলি থেকে মাটিতে পড়েই রসের সঞ্চার নিজের মধ্যে যেমনি অনুভব করলে অমনি বদলে চল্লো নিজেই নিজের আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই; যার বাহু ছিল না চোখ ছিল না, যে লুকিয়ে ছিল মাটির তলায় নীরস কঠিন বীজকোষে বদ্ধ হ'য়ে, সে উঠলে মাটি ঠেলে, মেলিয়ে দিলে হাজার হাজার চোখ আর হাত আলোর দিকে আকাশের দিকে বাতাসের উপরে, নতুন শরীর নতুন ভঙ্গি লাভ করলে সে রসের প্রেরণায়, গোলাকার বীজ ছত্রাকার গাছ হয়ে শোভা পেলে, বীজের anatomy লুকিয়ে পড়লো ফুলের রেণুতে পাকা ফলের শোভার আড়ালে। বীজের হাড় হদ্দ ভেঙে তার anatomy চুরমার করে' বেরিয়ে এল গাছের ছবি বীজকে ছাড়িয়ে। গাছ যে রচলে তার রচনায় ছাঁদ ও anatomyর দোষ দেবার সাহস কারু হল না, উল্টে বরং কোন কোন মানুষ তারই রচনা চুরি করে' গাছপালা আঁকতে বসে গেল—বীজতত্ত্বের বইখানার মধ্যে ফেলে রেখে দিলে যে অস্থি-পঞ্জরের মতো শক্ত পিঞ্জরে বদ্ধ ছিল বীজের প্রাণ তার প্রকৃত anatomyর হিসেব। বীজের anatomy দিয়ে গাছের anatomyর বিচার করতে যাওয়া, আর মানুষী মূর্তির anatomy দিয়ে মানস মূর্তির anatomyর দোষ ধরতে যাওয়া সমান মূর্খতা। Anatomyর একটা অচল দিক আছে, যেটা নিয়ে এক রূপের সঙ্গে আর রূপের সুনির্দিষ্ট ভেদ, কিন্তু anatomyর একটা সচল দিকও আছে সেটা নিয়ে মানুষে মানুষে বা একই জাতের গাছে গাছে ও জীবে জীবে বাঁধা পার্থক্য একটুখানি ভাঙে—কোন মানুষ হয় তাল গাছের মতো, কেউ হয় ভাঁটার মতো, কোন গাছ ছড়ায় ময়ূরের মতো পাখা, কেউ বাড়ায় ভূতের মতো হাত! প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বইখানাতে দেখবে মেঘের সুনির্দিষ্ট গোটাকতক গড়নের ছবি দেওয়া আছে—বৃষ্টির মেঘ, ঝড়ের মেঘ—সবার বাঁধা গঠন কিন্তু মেঘে যখন বাতাস লাগলো রস ভরলো তখন শাস্ত্র-ছাড়া সৃষ্টি-ছাড়া মূর্তি সব ফুটতে থাকলো, মেঘে মেঘে রং লাগলো অদ্‌ভুত অদ্‌ভুত, সাদা ধোঁয়া ধুমধাম করে সেজে এল লাল নীল হলদে সবুজ বিচিত্র সাজে, দশ অবতারের রং ও মূর্তিকে ছাড়িয়ে দশ সহস্র অবতার! সচিত্র প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পুঁথি খুলে সে সময় কোন্ রসিক চেয়ে

www.bengaliebook.com

দেখে মেঘের রূপগুলোর দিকে? এই যে মেঘের গতিবিধির মতো সচল সজল anatomy, একেই বলা হয় artistic anatomy, যার দ্বারায় রচয়িতা রসের আধারকে রসের উপযুক্ত মান পরিমাণ দিয়ে থাকেন। মানুষের তৃষ্ণা ভাঙতে যতটুকু জল দরকার তার পরিমাণ বুঝে জলের ঘটি এক রকম হ'ল, মানুষের স্নান করে' শীতল হ'তে যতটা জল দরকার তার হিসেবে প্রস্তুত হ'ল ঘড়া জালা ইত্যাদি; সুতরাং রসের বশে হ'ল আধারের মান পরিমাণ আকৃতি পর্যন্ত। যার কোন রসজ্ঞান নেই সেই শুধু দেখে পানীয় জলের ঠিক আধারটি হচ্ছে চৌকোনা পুকুর, ফটিকের গেলাস নয়, সোণার ঘটিও নয়। গোয়ালের গরু হয়তো দেখে পুকুরকে তার পানীয় জলের ঠিক আধার, কিন্তু সে যদি মানুষকে এসে বলে, 'তোমার গঠন সম্বন্ধে মোটেই জ্ঞান নেই, কেন না জলাধার তুমি এমন ভুল রকমে গড়েছ যে পুকুরের সঙ্গে মিলছেই না', তবে মানুষ কি জবাব দেয়?

ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ামূলক। ঐতিহাসিককে রচনা করতে হয় না, তাই তার মাপকাঠি ঘটনাকে চুল চিরে' ভাগ করে দেখিয়ে দেয়, ডাক্তারকেও জীবন্ত মানুষ রচনা করতে হয় না, কাযেই জীবন্মৃত ও মৃত মানুষের শবচ্ছেদ করার কাযের জন্য চলে তার মাপকাঠি, আর রচয়িতাকে অনেক সময় অবস্তুকে বস্তুজগতে, স্বপ্নকে জাগরণের মধ্যে টেনে আনতে হয়, রূপকে রসে, রসকে রূপে পরিণত করতে হয়, কাযেই তার হাতের মাপকাঠি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের, রূপকথার সোণার রূপোর কাটির মতো অদ্‌ভুত শক্তিমান। ঘটনা যাকে কুড়িয়ে ও খুঁড়ে তুলতে হয়, ঠিক ঠিক খোন্তা হল তার পক্ষে মহাস্ত্র, মানুষের ভৌতিক শরীরটার কারখানা নিয়ে যখন কারবার, ঠিক ঠিক মাংসপেশী অস্থিপঞ্জর ইত্যাদির ব্যবচ্ছেদ করার শূল ও শলাকা ইত্যাদি হ'ল তখন মৃত্যুবাণ, কিন্তু রচনা প্রকাশ হবার আগেই এমন একটি জায়গার সৃষ্টি হয়ে বসে যে সেখানে কোদাল, কুড়ুল, শূল, শাল কিছু চলে না, রচয়িতার নিজের অস্থিপঞ্জর এবং ঘটাকাশের ঘটনা সমস্ত থেকে অনেক দূরে রচয়িতার সেই মনোজগৎ বা পটাকাশ, যেখানে ছবি ঘনিয়ে আসে মেঘের মতো, রস ফেনিয়ে ওঠে, রং ছাপিয়ে পড়ে আপনা আপনি। সেই সমস্ত রসের ও

রূপের ছিটেফোঁটা যথোপযুক্ত পাত্র বানিয়ে ধরে' দেয় রচয়িতা আমাদের জন্যে। এখন রচয়িতা রস বুঝে' রসের পাত্র নির্বাচন করে' যখন দিচ্ছে তখন রসের সঙ্গে রসের পাত্রটাও স্বীকার না করে' যদি নিজের মনোমত পাত্রে রসটা ঢেলে নিতে যাই তবে কি ফল হবে? ধর রৌদ্ররসকে একটা নবতাল বা দশতাল মূর্তির আধার গড়ে' ধরে' আনলেন রচয়িতা, পাত্র ও তার অন্তর্নিহিত রসের চমৎকার সামঞ্জস্য দিয়ে, এখন সেই রচয়িতার আধারকে ভেঙে রৌদ্ররস যদি মুঠোম হাত পরিমিত anatomy-দোরস্ত আমার একটা ফটোগ্রাফের মধ্যে ধরবার ইচ্ছে করি তো রৌদ্র হয় করুণ নয় হাস্যরসে পরিণত না হয়ে যাবে না; কিম্বা ছোট মাপের পাত্রে না ঢুকে রসটা মাটি হবে মাটিতে পড়ে'।

হারমোনিয়ামের anatomy, বীণার anatomy, বাঁশীর anatomy রকম রকম বলেই সুরও ধরে রকম রকম; তেমনি আকারের বিচিত্রতা দিয়েই রসের বিচিত্রতা বাহিত হয় আর্টের জগতে, আকারের মধ্যে নির্দিষ্টতা সেখানে কিছুই নেই। হাড়ের পঞ্জরের মধ্যে মাংসপেশী দিয়ে বাঁধা আমাদের এতটুকু বুক, প্রকাণ্ড সুখ প্রকাণ্ড দুঃখ প্রকাণ্ড ভয় এতটুকু পাত্রে ধরা মুস্কিল। হঠাৎ এক-এক সময়ে বুকটা অতিরিক্ত রসের ধাক্কায় ফেটে যায়; রসটা চাইলে বুককে অপরিমিত রকমে বাড়িয়ে দিতে, কিম্বা দমিয়ে দিতে, আমাদের ছোট পিঁজ্‌রে হাড়ে আর তাঁতে নিরেট করে বাঁধা স্থিতি-স্থাপকতা কিম্বা সচলতা তার নেই, অতিরিক্ত ষ্টিম্ পেয়ে বয়লারের মতো ফেটে চৌচির হয়ে গেল। রস বুকের মধ্যে এসে পাত্রটায় যে প্রসারণ বা আকুঞ্চন চাইলে, প্রকৃত মানুষের anatomy সেটা দিতে পারলে না; কাজেই আর্টিষ্ট যে, সে রসের ছাঁদে কমে বাড়ে ছন্দিত হয় এমন একটা সচল তরল anatomy সৃষ্টি করে' নিলে যা অন্তর এবং বাইরে সুসঙ্গত ও সুসংহত। রসকে ধরবার উপযুক্ত জিনিষ বিচিত্র রং ও রেখা সমস্ত গাছের ডালের মতো, ফুলের বোঁটার মতো, পাতার ঝিলিমিলির মতো তারা জীবনরসে প্রাণবন্ত ও গতিশীল। ফটোগ্রাফারের ওখানে ছবি ওঠে—সীসের টাইপ থেকে যেমন ছাপ ওঠে—ছবি ফোটে না। পারিজাতের মতো বাতাসে দাঁড়িয়ে আকাশে ফুল ফোটানো আর্টিষ্টের কায, সুতরাং তার মন্ত্র মানুষের শরীর-যন্ত্রের হিসেবের খাতার লেখার সঙ্গে এমন কি বাস্তব জগতের হাড়হদ্দের খবরের

সঙ্গে মেলানো মুস্কিল। অভ্র-বিজ্ঞানের পুঁথিতে আবর্ত সম্বর্ত ইত্যাদি নাম-রূপ দিয়ে মেঘগুলো ধরা হয়েছে—কিন্তু কবিতা কি গান রচনার বেলা ঐ সব পেঁচালো নামগুলো কি বেশী কাযে আসে? মেঘের ছবি আঁকার বেলাতেও ঠিক পুঁথিগত ঘোরপেঁচ এমন কি মেঘের নিজমূর্তিগুলোর হুবহু ফটোগ্রাফও কাযে আসে না। রচিত যা তার মধ্যে বসবাস করলেও রচয়িতা চায় নিজের রচনাকে। সোণার খাঁচার মধ্যে থাকলেও বনের পাখী সে যেমন চায় নিজের রচিত বাসাটি দেখতে, রচয়িতাও ঠিক তেমনি দেখতে চায় নিজের মনোগতটি গিয়ে বসলো নিজের মনোমত করে' রচা রং রেখা ছন্দোবন্ধ ঘেরা সুন্দর বাসায়। কোকিল সে পরের বাসায় ডিম পাড়ে–নামজাদা মস্ত পাখী। কিন্তু বাবুই সে যে রচয়িতা, দেখতে এতটুকু কিন্তু বাসা বাঁধে বাতাসের কোলে—মস্ত বাসা। আমাদের সঙ্গীতে বাঁধা অনেকগুলো ঠাট আছে, যে লোকটা সেই ঠাটের মধ্যেই সুরকে বেঁধে রাখলে সে গানের রচয়িতা হল না, সে নামে রাজার মতো পূর্ব্বপুরুষের রচিত রাজগীর ঠাটটা মাত্র বজায় রেখে চল্লো ভীরু, কিন্তু যে রাজত্ব পেয়েও রাজত্ব হারাবার ভয় রাখলে না, নতুন রাজত্ব জিতে নিতে চল্লো সেই সাহসীই হল রাজ্যের রচয়িতা বা রাজা এবং এই স্বাধীনচেতারাই হয় সুরের ওস্তাদ। সুর লাগাতে পারে তারাই যারা সুরের ঠাট মাত্র ধরে' থাকে না, বেসুরকেও সুরে ফেলে।

মানুষের anatomyতেই যদি মানুষ বদ্ধ থাকতো, দেবতাগুলোকে ডাকতে যেতে পারতো কে? কার জন্যে আসতো নেমে স্বর্গ থেকে ইন্দ্ররথ, পুষ্পক রথে চড়িয়ে লঙ্কা থেকে কে আনতো সীতাকে অযোধ্যায়? ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু আপনার anatomy ভাঙতে সুরু করলে, বানরের মতো পিঠের সোজা শিরদাঁড়াকে বাঁকিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো—দুই পায়ে ভর দিয়ে গাছে গাছে ঝুল্‌তে থাক্‌লো না। প্রথমেই যুদ্ধ হল মানুষের নিজের anatomyর সঙ্গে, সে তাকে আস্তে আস্তে বদলে' নিলে আপনার চলনবলনের উপযুক্ত করে। বীজের anatomy নাশ করে যেমন বার হ'ল গাছ, তেমনি বানরের anatomy পরিত্যাগ করে' মানুষের anatomy নিয়ে এল মানুষ; ঠিক এই ভাবেই medical anatomy নাশ করে আর্টিষ্ট আবিষ্কার করলে artistic anatomy, যা রসের বশে কমে বাড়ে, আঁকে বাঁকে, প্রকৃতির সব জিনিষের মতো—গাছের ডালের মতো, বৃন্তের মতো, পাপড়ির মতো, মেঘের ঘটার মতো,

জলের ধারার মতো। রসের বাধা জন্মায় যাতে এমন সব বস্তু কবিরা টেনে ফেলে দেন,–নিরঙ্‌কুশাঃ কবয়ঃ। লয়ে লয়ে না মিল্লে কবিতা হ'ল না, এ কথা যার একটু কবিত্ব আছে সে বলবে না; তেমনি আকারে আকারে না মিল্লে ফটোগ্রাফ হল না বলতে পারি, কিন্তু ছবি হল না একথা বলা চলে না। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' শুনতে বেশ লাগলো, 'ছেলেটি কার্তিকের মতো' দেখতে বেশ লাগলো, কিন্তু কবিতা লিখলেই কি কাশীদাসী সুর ধরতে হবে, না ছেলে আঁকতে হলেই পাড়ার আদুরে ছেলের anatomy কাপি করলেই হবে? গণেশের মূর্তিটিতে আমাদের ঘরের ও পরের ছেলের anatomy যেমন করে ভাঙা হয়েছে তেমন আর কিছুতে নয়। হাতী ও মানুষের সমস্তখানি রূপ ও রেখার সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে একটা নতুন anatomy পেয়ে এল, কাযেই সেটা আমাদের চক্ষে পীড়া দিচ্ছে না, কেন না সেটা ঘটনা নয়, রচনা। আরব্য-উপন্যাসের উড়ন্ত সতরঞ্চির কল্পনা বাস্তবজগতে উড়োজাহাজ দিয়ে সপ্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কি আমাদের কাছে নগণ্য হয়েছিল, না, অবাধ কল্পনার সঙ্গে গল্পের ঠাট মিলছে কিন্তু বিশ্বরচনার সঙ্গে মিলছে না দেখে' গালগল্প রচনার বাদশাকে কেউ আমরা দুষেছি? প্রত্যেক রচনা তার নিজের anatomy নিয়ে প্রকাশ হয়; ঠাট বদলায় যেমন প্রত্যেক রাগরাগিণীর, তেমনি ছাঁদ বদলায় প্রত্যেক ছবির কবিতার রচনার বেলায়। ধর যদি এমন নিয়ম করা যায় যে কাশীদাসী ছন্দ ছাড়া কবিরা কোনো ছন্দে লিখতে পারবে না—যেমন আমরা চাচ্ছি ডাক্তারি anatomy ছাড়া ছবিতে আর কিছু চলবে না—তবে কাব্যজগতে ভাবের ও ছন্দের কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়,—সুরের বদলে থাকে শুধু দেশজোড়া কাশী আর রচয়িতার বদলে থাকে কতকগুলি দাস। কাযেই কবিদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে 'কবয়ঃ নিরঙ্‌কুশাঃ' বলে', কিন্তু বাস্তবজগৎ থেকে ছাড়া পেয়ে কবির মন উড়তে পারবে যথাসুখে যথাতথা, আর ছবি আট্‌কে থাকবে ফটোগ্রাফারের বাক্সর মধ্যে—জালার মধ্যে বাঁধা আরব্য-উপন্যাসের জিন্‌-পরীর মতো সুলেমানের সিলমোহর আঁটা চিরকালই, এ কোন্‌দেশী কথা? ইউরোপ, যে চিরকাল বাস্তবের মধ্যে আর্টকে বাঁধতে চেয়েছে সে এখন সিলমোহর মায় জালা পর্যন্ত ভেঙে কি সঙ্গীতে, কি চিত্রে, ভাস্কর্যে, কবিতায়, সাহিত্যে, বাঁধনের মুক্তি কামনা করছে; আর আমাদের আর্ট যেটা চিরকাল মুক্ত ছিল তাকে ধরে ডানা কেটে

পিঁজ্‌রের মধ্যে ঠেসে পুরতে চাচ্ছি আমরা। বড় পা'কে ছোট জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে চীনের রাজকন্যার যা ভোগ ভুগতে হয়েছে সেটা কসা জুতোর একটু চাপ পেলেই আমরা অনুভব করি—পা বেরিয়ে পড়তে চায় চট্‌ করে' জুতো ছেড়ে, কিন্তু হায়! ছবি—সে কিনা আমাদের কাছে শুধু কাগজ, সুর—সে কিনা শুধু খানিক গলার শব্দ, কবিতা—সে শুধু কিনা ফর্মা বাঁধা বই; তাই তাদের মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে চুরে চামড়ার থলিতে ভরে দিতে কষ্টও পাইনে ভয়ও পাইনে।

অন্যথা-বৃত্তি হল আর্টের এবং রচনার পক্ষে মস্ত জিনিষ, এই অন্যথা-বৃত্তি দিয়েই কালিদাসের মেঘদূতের গোড়া পত্তন হল, অন্যথা-বৃত্তি কবির চিত্ত মানুষের রূপকে দিলে মেঘের সচলতা এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের বাচালতা। এই অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাইলেন যথা— "ধূমজ্যোতিসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ক মেঘঃ, সন্দেশার্থাঃ ক্ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ"। ধূম আলো আর জল-বাতাস যার শরীর, তাকে শরীর দাও মানুষের, তবে তো সে প্রিয়ার কাণে প্রাণের কথা পৌঁছে দেবে? বিবেক ও বুদ্ধি মাফিক মেঘকে মেঘ রেখে কিছু রচনা করা কালিদাসও করেন নি, কোন কবিই করেন না। যখন রচনার অনুকূল মেঘের ঠাট কবি তখন মেঘকে হয়তো মেঘই রাখলেন কিন্তু যখন রচনার প্রতিকূল ধূম জ্যোতি জল বাতাস তখন নানা বস্তুতে শক্ত করে, বেঁধে নিলেন কবি। এই অন্যথা-বৃত্তি কবিতার সর্ব্বস্ব, তখনো যেমন এখনো তেমন, রসের বশে ভাবের খাতিরে রূপের অন্যথা হচ্ছে—

"শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন পথভোলা
ঐ যে পূরব গগন জুড়ে, উত্তরী তার যায় রে উড়ে
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা!
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে,
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্‌ খানে,
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে, ঐ ত আমার লাগায় মনে,
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ তোলা।"

ভাব ও রসের অন্যান্য বৃত্তি পেয়ে মেঘ এখানে নতুন সচল anatomyতে রূপান্তরিত হল। এখন বলতে পারো মেঘকে তার স্বরূপে রেখে কবিতা লেখা যায় কি না? আমি বলি যায়, কিন্তু অভ্র-বিজ্ঞানের হিসেব মেঘের রূপকে যেমন ছন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখায়, সে ভাবে লিখলে কবিতা হয় না, রংএর ছন্দ বা ছাঁদ, সুরের ছাঁদ, কথার ছাঁদ দিয়ে মেঘের নিজস্ব ও প্রত্যক্ষ ছাঁদ না বদলালে কবিতা হ'তে পারে না, যেমন—

"আজি বর্ষা রাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ অ◌ালো মেশে।
বেণু বনের মাথায় মাথায়
রং লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধরায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে।"

মনে হবে অপ্রাকৃত কিছু নেই এখানে, কিন্তু কালো শুধু বলা চল্লো না, কোমল কালো না হ'লে ভেসে চলতে পারলো না আকাশে বাতাসে রংএর স্রোত বেয়ে কবির মানসকমল থেকে খসে-পড়া সুর-বোঝাই পাপড়িগুলি সেই দেশের খবর আনতে যে দেশের বাদল বাউল একতারা বাজাচ্ছে সারা বেলা। সকালের প্রকৃত মূর্তিটা হল মেঘের কালোয় একটু আলো কিন্তু টান-টোনের কোমলতা পাতার হিলিমিলি নানা রংএর ঝিলিমিলির মধ্যে তাকে কবি হারিয়ে দিলেন; মেঘের শরীর আলোর কম্পন পেলে, ফটোগ্রাফের মেঘের মতো চোখের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো না। বর্ষার শেষ-রাত্রে সত্যিকার মেঘ যে ভাবে দেখতে দেখতে হারিয়ে যায়, সকালের মধ্যে মিলিয়ে দেয় তার বাঁধারূপ, ঠিক সেই ভাবের একটি গতি পেলে কবির রচনা। সকালে মেঘে একটু আলো পড়েছে এই ফটোগ্রাফটি দিলে না কবিতা; আলো, মেঘ, লতা-পাতার গতিমান ছন্দে ধরা পড়লো শেষ বর্ষার চিরন্তন রস এবং মেঘলোকের লীলা-হিল্লোল। রচনার মধ্যে এই যে রূপের রসের চলাচল গতাগতি, এই নিয়ে হল তফাৎ ঘটনার নোটিসের সঙ্গে রচনার প্রকৃতির। নোটিস সে নির্দেশ করেই থামলো, রচনা চলে গেল গাইতে গাইতে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে মনের থেকে মনের দিকে

এক কাল থেকে আর এক কালে বিচিত্র ভাবে। কবিতায় বা ছবিতে এই ভাবে চলায়মান রং রেখা রূপ ও ভাব দিয়ে যে রচনা তাকে আলঙ্কারিকেরা গতিচিত্র বলেন—অর্থাৎ গতিচিত্রে রূপ বা ভাব কোন বস্তুবিশেষের অঙ্গবিন্যাস বা রূপসংস্থানকে অবলম্বন করে' দাঁড়িয়ে থাকে না কিন্তু রেখার রংএর ও ভাবের গতাগতি দিয়ে রসের সজীবতা প্রাপ্ত হ'য়ে আসা-যাওয়া করে। বীণার দুই দিকে বাঁধা টানা তারগুলি সোজা লাইনের মতো অবিচিত্র নির্জীব আছে—বলছেও না চলছেও না। সুর এই টানা তারের মধ্যে গতাগতি আরম্ভ করলে অমনি নিশ্চল তার চঞ্চল হ'ল গীতের ছন্দে, ভাবের দ্বারা সজীব হ'ল, গান গাইতে লাগলো, নাচতে থাকলো তালে তালে। পর্দায় পর্দায় খুলে গেল সুরের অসংখ্য পাপড়ি, সোজা anatomyর টানা পাঁচিল ভেঙ্গে বার হ'ল সুরের সুরধুনী-ধারা, নানা ভঙ্গিতে গতিমান। আকাশ এবং মাটি এরি দুই টানের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের anatomy-দোরস্ত শরীর। দুই খোঁটায় বাঁধা তারের মতো, এই হল ডাক্তারি anatomyর সঠিক রূপ। আর বাতাসের স্পর্শে আলোর আঘাতে গাছ-ফুল-পাতা-লতা এরা লতিয়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে শাখা প্রশাখার আঁকা বাঁকা নানা ছন্দের ধারায়; এই হচ্ছে artistic anatomyর সঠিক চেহারা । আর্টিষ্ট রসের সম্পদ নিয়ে ঐশ্বর্যবান, কাযেই রস বণ্টনের বেলায় রসপাত্রের জন্য তাকে খুঁজে বেড়াতে হয় না কুমোরটুলি, সে রসের সঙ্গে রসপাত্রটাও সৃষ্টি করে' ধরে দেয় ছোট বড় নানা আকারে ইচ্ছা মতো। এই পাত্রসমস্যা শুধু যে ছবি লিখছে তাকেই যে পূরণ করতে হয় তা নয়, রসের পাত্রপাত্রীর anatomy নিয়ে গণ্ডগোল রঙ্গমঞ্চে খুব বেশী রকম উপস্থিত হয়। নানা পৌরাণিক ও কাল্পনিক সমস্ত দেবতা উপদেবতা পশুপক্ষী যা রয়েছে তার anatomy ও model বাস্তবজগৎ থেকে নিলে তো চলে না। হরেরামপুরের সত্যি রাজার anatomy রাজশরীর হলেও রঙ্গমঞ্চের রাজা হবার কাযে যে লাগে তা নয়, একটা মুটের মধ্যে হয়তো রাম রাজার রসটি ফোটাবার উপযুক্ত anatomy খুঁজে পাওয়া যায়। নারীর anatomy হয়তো সীতা সাজবার কালে লাগলো না, একজন ছেলের anatomy দিয়ে দৃশ্যটার মধ্যে উপযুক্ত রসের উপযুক্ত পাত্রটি ধরে দেওয়া গেল। পাখীর কি বানরের কি নারদের ও দেবদেবীর ভাব ভঙ্গি চলন বলন প্রভৃতির পক্ষে যে রকম শরীরগঠন উপযুক্ত বোধ হল অধিকারী সেই হিসেবে পাত্র পাত্রী নির্বাচন বা সজ্জিত

করে’ নিলে—যেখানে আসল মানুষের উচ্চতা রচয়িতার ভাবনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে না সেখানে রণ্‌পা দিয়ে anatomical মাপ বাড়িয়ে নিতে হ’লো, যেখানে আসল দুহাতের মানুষ কাজে এল না সেখানে গড়া হাত গড়া ডানা ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি ভাঙ্গাচোরা দিয়ে নানা রসের পাত্র-পাত্রী সৃষ্টি করতে হল বেশ-কারকে,—রচয়িতার কল্পনার সঙ্গে অভিনেতার রূপের সামঞ্জস্য এইভাবে লাভ করতে হল নাটকে! কল্পনামূলক যা তাকে প্রকৃত ঘটনার নিয়মে গাঁথা চলে না, আর ঘটনামূলক নাটক সেখানেও একেবারে পাত্র-পাত্রীর সঠিক চেহারাটি নিয়ে কায চলে না, কেননা যে ভাব যে রস ধরতে চেয়েছেন রচয়িতা, তা রচয়িতার কল্পিত পাত্র-পাত্রীর চেহারার সঙ্গে যতটা পারা যায় মেলাতে হয় বেশ-কারকে। এক-একজন বেশ সুঠাম সুশ্রী, পাঠও করতে পারলে বেশ, কিন্তু তবু নাটকের নায়ক-বিশেষের পার্ট তাকে দেওয়া গেল না, কেননা সেখানে নাটক রচয়িতার কল্পিতের সঙ্গে বিশ্ব-রচয়িতার কল্পিত মানুষটির anatomy গঠন ইত্যাদি মিল্লো না। ছবিতেও তেমনি কবিতাতেও তেমনি, ভাবের ছাঁদ অনেক সময়ে মানুষের কি আর কিছুর বাস্তব ও বাঁধা ছাঁদ দিয়ে পুরোপুরি ভাবে প্রকাশ করা যায় না, অদল-বদল ঘটাতেই হয়, কতখানি অদল-বদল সয় তা আর্টিষ্ট যে রসমূর্তি রচনা করছে সেই ভাল বুঝবে আর কেউ তো নয়। চোখে দেখছি যে মানুষ যে সব গাছপালা নদ-নদী পাহাড়-পর্বত আকাশ—এরি উপরে আলো-আঁধার ভাব-ভঙ্গি দিয়ে বিচিত্র রস সৃজন করে’ চল্লেন যাঁর আমরা রচনা তিনি, আর এই যে নানা রেখা নানা রং নানা ছন্দ নানা সুর এদেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত করলে মানুষ নিজের কল্পিতটি। মানুষ বিশ্বের আকৃতির প্রতিকৃতি নিজের রচনায় বর্জন করলে বটে, কিন্তু প্রকৃতিটি ধরলে অপূর্ব কৌশলে যার দ্বারা রচনা দ্বিতীয় একটা সৃষ্টির সমান হয়ে উঠলো। এই যে অপূর্ব কৌশল যার দ্বারা মানুষের রচনা মুক্তিলাভ করে ঘটিত জগতের ঘটনা সমস্ত থেকে, এটা কিছুতে লাভ করতে পারে না সেই মানুষ যে এই বিশ্বজোড়া রূপের মূর্ত দিকটার খবরই নিয়ে চলেছে, রসের অমূর্ততা মূর্তকে যেখানে মুক্ত করছে সেখানের কোন সন্ধান নিচ্ছে না, শুধু ফটোযন্ত্রের মতো আকার ধরেই রয়েছে, ছবি ওঠাচ্ছে মাত্র ছবি ফোটাচ্ছে না। মানুষের মধ্যে কতক আছে মায়াবাদী কতক কায়াবাদী; এদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ লেগেই আছে। একজন বলছে, কায়ার উপযুক্ত পরিমাণ হোক

ছায়ামায়া সমস্তই, আর একজন বলছে তা কেন, কায়া যখন ছায়া ফেলে সেটা কি খাপে খাপে মেলে শরীরটার সঙ্গে, না নীল আকাশ রংএর মায়ায় যখন ভরপুর হয় তখন সে থাকে নীল, বনের শিয়রে যখন চাঁদনী মায়াজাল বিস্তার করলে তখন বনের হাড়হদ্দ সব উড়ে গিয়ে শুধু যে দেখ ছায়া, তার কি জবাব দেবে? মায়াকে ধরে রয়েছে কায়া, কায়াকে ঘিরে রয়েছে মায়া; কায়া অতিক্রম করছে মায়া দিয়ে আপনার বাঁধা রূপ, মায়া সে নিরূপিত করছে উপযুক্ত কায়া দ্বারা নিজকে। জাগতিক ব্যাপারে এটা নিত্য ঘটছে প্রতি মুহূর্তে। জগৎ শুধু মায়া কি শুধু কায়া নিয়ে চলছে না, এই দুইয়ের সমন্বয় চলেছে; তাই বিশ্বের ছবি এমন চমৎকার ভাবে আর্টিষ্টের মনটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে! এই যে সমন্বয়ের সূত্রে গাঁথা কায়া-মায়া ফুল আর তার রংএর মতো শোভা পাচ্ছে—anatomyর artistic ও inartistic সব রহস্য এরি মধ্যে লুকোনো আছে। রূপ পাচ্ছে রসের দ্বারা অনির্বচনীয়তা, রস হচ্ছে অনির্বচনীয় যথোপযুক্ত রূপ পেয়ে, রূপ পাচ্ছে প্রসার রসের, রস পাচ্ছে প্রসার রূপের, এই একে একে মিলনে হচ্ছে দ্বিতীয় সৃজন আর্টে, তারপর সুর, ছন্দ, বর্ণিকা, ভঙ্গ ইত্যাদি তৃতীয় এসে তাকে করে' তুলেছে বিচিত্র ও গতিমান। ওদিকে এক রচয়িতা এদিকে এক রচয়িতা, মাঝে রয়েছে নানা রকমের বাঁধা রূপ; সেগুলো দুদিকের রঙ্গ-রসের পাত্র-পাত্রী হয়ে চলেছে–বেশ বদলে' বদলে' ঠাট বদলে' বদলে'—অভিনয় করছে নাচছে গাইছে হাসছে কাঁদছে চলাফেরা করছে! রচকের অধিকার অ াছে রূপকে ভাঙতে রসের ছাঁদে। কেননা রসের খাতিরে রূপের পরিবর্ত্তন প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম, দিন চলেছে, রাত চলেছে, জগৎ চলেছে রূপান্তরিত হ'তে হ'তে, ঋতুতে ঋতুতে রসের প্রেরণাটি চলেছে গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত রূপের নিয়ম বদলাতে বদলাতে পাতায় পাতায় ফুলে ফলে ডালে ডালে! শুধু এই নয়, যখন রস ভরে' উঠলো তখন এতখানি বিস্তীর্ণ পাত্রেও রস ধরলো না—গন্ধ হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো রস, রংএ রংএ ভরে' দিলে চোখ, উথলে পড়লো রস মধুকরের ভিক্ষাপাত্রে, এই যে রসজ্ঞানের দাবী এ সত্য দাবী, সৃষ্টি কর্ত্তার সঙ্গে স্পর্দ্ধার দাবী নয়, সত্যাগ্রহীর দাবী। ডাক্তারের দাবী ঐতিহাসিকের দাবী সাধারণ মানুষের দাবী নিয়ে একে তো অমান্য করা চলে না। আর্টিষ্ট যখন কিছুকে যা থেকে তা'তে রূপান্তরিত কর্‌লে তখন সে যা-তা কর্‌লে তা নয়, সে প্রকৃতির

নিয়মকে অতিক্রম করলে না, উল্টে বরং বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপমুক্তির নিয়মকে স্বীকার করলে, প্রমাণ করে চল্লো হাতে কলমে, আর যে মাটিতেই হোক বা তেল রংএতেই হোক রূপের ঠিক ঠিক নকল করে চল্লো। সে আঙ্গুরই গড়ুক বা আমই গড়ুক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু সে দিয়ে যেতে পারলে না, সে অভিশপ্ত হল, কেননা সে বিশ্বের চলাচলের নিয়মকে স্বীকার করলে না প্রমাণও করলে না কোন কিছু দিয়ে, অলঙ্কারশাস্ত্রমতো তার কায পুনরাবৃত্তি এবং ভ্রান্তিমৎ দোষে দুষ্ট হল। রক্ত চলাচলের খাদ্য চলাচলের পক্ষে যে ভৌতিক শরীরগঠন অস্থিসংস্থান তার মধ্যে রসাধার আর একটি জিনিষ আছে যার anatomy ডাক্তার খুঁজে পায়নি এ পর্যন্ত। বাইরের শরীর আমাদের বাঁধা ছাঁচে ঢালা আর অন্তর্দেহটি ছাঁচে ঢালা একেবারেই নয় সুতরাং সে স্বাধীনভাবে রসের সম্পর্কে আসে, এ যেন এতটুকু খাঁচায় ধরা এমন একটি পাখী যার রসমূর্তি বিরাটের সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে, বচনাতীত সুর বর্ণনাতীত বর্ণ তার। এই পাখীর মালিক হয়ে এসেছে কেবল মানুষ আর কোন জীব নয়। বাস্তব জগৎ যেখানে সীমা টানলে রূপের লীলা শেষ করলে সুর থামালে আপনার, সেইখানে মানুষের খাঁচায় ধরা এই মানস পাখী সুর ধরলে, নতুন রূপে ধরে’ আনলে অরূপের রূপ—জগৎ সংসার নতুন দিকে পা বাড়ালে তবেই মুক্তির আনন্দে। মানুষ তার স্বপ্ন দিয়ে নিজেকেই যে শুধু মুক্তি দিচ্ছে তা নয় যাকে দর্শন করছে যাকে বর্ণন করছে তার জন্যে মুক্তি আনছে। আটঘাট বাঁধা বীণা আপনাকে ছাড়িয়ে চলেছে এই স্বপ্নে, সুরের মধ্যে গিয়ে বাঁশী তার গাঁঠে গাঁঠে বাঁধা ঠাট ছাড়িয়ে বার হচ্ছে, এই স্বপ্নের দুয়ার দিয়ে ছবি অতিক্রম করেছে ছাপকে, এই পথে বিশ্বের হৃদয় দিয়ে মিলছে বিশ্বরূপের হৃদয়ে, এই স্বপ্নের পথ। বীণার সেই anatomyটাই বীণার সত্য anatomy, এ সত্য আর্টিষ্টমাত্রকেই গ্রহণ করতে হয় আর্টের জগতে ঢোকার আগেই, না হ’লে সচরাচরকে ছাড়িয়ে সে উঠতে ভয় পায়। পড়া পাখী যা শুন্‌লে তারই পুনরাবৃত্তি করতে থাক্‌লো, রচয়িতার দাবী সে গ্রহণ করতে পারলে কি? মানুষ যা দেখলে তাই এঁকে চল্লো রচয়িতার দাবী নিতে পারলে কি সে? নিয়তির নিয়মে যারা ফুল পাতার সাজে সেজে এল, রঙ্গীন ডানা মেলে’ নেচে চল্লো গেয়ে চল্লো, তারা কেউ এই বিশ্বসংসারে রচয়িতার দাবী নিতে পারলে না, এক যারা স্বপন দেখলে স্বপন ধরলে সেই অাটিষ্টরা ছাড়া। পাখী পারলে না রচয়িতার দাবী নিতে

কিন্তু আকাশের পাখীকে ধরার ফাঁদ যে মানুষ রচনা করলে মাটিতে বসে' সে এ দাবী গ্রহণ করলে, নিয়তিকৃত নিয়ম রহিতের নিয়ম যারা পদে পদে প্রমাণ করে চল্লো নিজেদের সমস্ত রচনায়, তারাই দাবী দিতে পারলে রচয়িতার। কবীর তাই বল্লেন—"ভরম জঞ্জাল দুখ ধন্দ ভারি"—ভ্রান্তির জঞ্জাল দূর কর, তাতে দুঃখ ও দীনতা আর ঘোর সংশয়; "সত্ত দাবী গহো আপ নির্ভয় রহো"—তোমার যে সত্য দাবী তাই গ্রহণ কর নির্ভয় হও। যে মানুয রচয়িতার সত্য দাবী নেয়নি কিন্তু স্বপন দেখলে ওড়বার, সে নিজের কাঁধে পাখীর ডানা লাগিয়ে উড়তে গেল, পরীর মতো দেখতে হ'ল বটে সে, কিন্তু পরচুলো তার বাতাস কাট্‌লে না, ঝুপ করে পড়ে ম'রলো সে; কিন্তু যে রচয়িতার সত্য দাবী গ্রহণ করলে তার রচনা মাধ্যাকর্ষণের টান ছাড়িয়ে উড়লো তাকে নিয়ে লোহার ডানা বিস্তার করে' আকাশে। মানুষ জলে হাঁটবার স্বপন দেখলে রচয়িতার দাবী গ্রহণ করলে না—ডুবে' ম'রলো দু'পা না যেতে, রচয়িতার রচনা পায়ের মতো একেবারেই দেখতে হল না কিন্তু গুরুভাবের দ্বারা সে জলের লঘুতাকে জয় করে' স্রোতের বাধাকে তুচ্ছ করে' চলে গেল সে সাত সমুদ্র পার। মানুষ নিমেষে তেপান্তর মাঠ পার হবার স্বপন দেখলে রচয়িতার দাবী নিতে পারলে না, খানিক পথে দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হ'ল তার anatomy-দোরস্ত শরীর, তৃষ্ণায় বুক ফেটে ম'রলো সে হরিণের মতো, ঘোড়াও দৌড় অবলম্বন করে' যতটা যেতে চায় নির্বিঘ্নে তা পারলে না, রণক্ষেত্রে ঘোড়া মায় সওয়ার পড়ে' ম'রলো! রচয়িতা নিয়ে এল লোহার পক্ষিরাজ ঘোড়া—যেটা ঘোড়ার মতো একেবারেই নয় হাড়হদ্দ কোন দিক দিয়ে,—সৃজন করে' উঠে বসলো, আপন পর সবাইকে নিয়ে নিমেষে ঘুরে এল যোজন বিস্তীর্ণ পৃথিবী নির্ভয়ে! যা নিয়তির নিয়মে কোথাও নেই তাই হ'ল, জলে শিলা ভাসলো আকাশে মানুষ উড়লো, ঘুমোতে ঘুমোতে পৃথিবী ঘুরে' এল রচনায় চড়ে' মানুষ! প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত আচরণে দোষ এখানে তো আমাদের চোখে পড়ে না। মানুষ যখন আয়নার সামনে বসে' চুল ছাঁটে, টেরি বাগায়, ছিটের সার্টে বাংলা anatomyর সৌন্দর্য ঢেকে সাহেবি ঢঙে ভেঙে নেয় নিজের দেহ, কাজল টেনে চোখের টান বাড়িয়ে প্রেয়সী দেখা দিলে বলে বাহবা,—চুলের খোঁপার ঘোরপেঁচ দেখে' বাঁধা পড়ে—নিজের কোন সমালোচনা যে মানে না তার কাছে, তখন

সে ছবির সামনে এসে anatomyর কথা পাড়ে কেন সে আমার কাছে এক প্রকাণ্ড রহস্য।

ইজিপ্টের লোক এককালে সত্যিই বিশ্বাস করতো যে, জীবন কায়া ছেড়ে চলে যায় আবার কিছুদিন পরে সন্ধান করে’ করে’ নিজের ছেড়ে ফেলা কামিজের মতো কায়াতেই এসে ঢোকে। এইজন্যে কায়ার মায়া তারা কিছুতে ছাড়তে পারেনি, ভৌতিক শরীরকে ধরে’ রাখার উপায় সমস্ত আবিষ্কার করেছিল, একদল কারিগরই তৈরি হয়েছিল ইজিপ্টে, যারা ‘কা’ প্রস্তুত করতো; তাদের কাযই ছিল যেমন মানুষ ঠিক সেই গড়নে পুত্তলিকা প্রস্তুত করা, গোরের মধ্যে ধরে’ রাখার জন্য; ঠিক এই সব ‘কা’-নির্মাতাদের পাশে বসে’ ইজিপ্টের একদল রচয়িতা artistic anatomyর বৃহত্ত ও অন্যথা-বৃত্ত দিয়ে পুত্তলিকা বা ‘কা’-নির্মাতাদের ঠিক বিপরীত রাস্তা ধরে’ গড়েছিল কত কি তার ঠিক নেই, দেবতা মানুষ পশু পক্ষী সবার anatomy ভেঙে চুরে তারা নতুন মূর্তি দিয়ে অমরত্বের সিংহাসনে বসিয়ে গেল। ইজিপ্টের এই ঘটনা হাজার হাজার বৎসর অাগে ঘটেছিল; কায়া-নির্মাতা কারিগর ও ছায়া-মায়ার যাদুকর দুই দলই গড়লে কিন্তু একজনের ভাগ্যে পড়লো মূর্ত—যা কিছু তাই, আর এক জনের পাত্রে ঝরলো অমূর্ত রস স্বর্গ থেকে,—এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোন যুগের আর্টের ইতিহাসে হয়নি হবার নয়। ইজিপ্ট তো দূরে, পাঁচ হাজার দশ হাজার বছর আরো দূরে, এই আজকের আমাদের মধ্যে যা ঘটছে, তাই দেখ না কেন; যারা ছাপ নিয়ে চলেছে মর্ত্য জগতের রূপ সমস্তের, তারা মূর্ত জিনিষ এত পাচ্ছে দেখে’ সময়ে সময়ে আমারও লোভ হয়,—টাকা পাচ্ছে হাততালি পাচ্ছে অহংকে খুব বেশী করে পাচ্ছে। আর এরূপ যারা করছে না তারা শুধু আঁকা বাঁকা ছন্দের আনন্দটুকু, ঝিলিমিলি রঙ্গের সুরটুকু বুকের মধ্যে জমা করছে, লোহার সিন্দুক কিন্তু রয়েছে খালি; বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই কালে কালে খুব আদর করে’ আর্টিষ্টদের যা সম্ভাষণ করেছে তা উর্দ্দূতে বলতে গেলে বলতে হয়—খেয়ালী, হিন্দীতে—বাউর বা বাউল, আর সব চেয়ে মিষ্টি হ’ল বাংলা—পাগল। কিন্তু এই পাগল তো জগতে একটি নেই, উপস্থিত দশবিশ লক্ষ কিম্বা তারও চেয়ে হয়তো বেশী এবং অনুপস্থিত ভবিষ্যতের সব পাগলের সর্দার হ’য়ে যে রাজত্ব করছে, উল্কার মতো জ্যোতির্ময় সৃষ্টি রচনা সমস্ত

সে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে পথে-বিপথে সৃজনের উৎসব করতে করতে। এমন যে খেয়ালের বাউল, জগতের আগত অনাগত সমস্ত খেয়ালী বা আর্টিষ্ট হ'ল তার চেলা, তার পথ চলতে ঢেলাই হোক মাণিকই হোক যাই কুড়িয়ে পেলে অমনি সেটাকে যে খুব বুদ্ধিমানের মতো ঝুলিতে লুকিয়ে রাতারাতি আলো আঁধারের ভ্রান্তি ধরে' চোখে ধূলো দিয়ে বাজারে বেচে এল তা নয়—মাটির ঢেলাকে এমন করে' ছেড়ে দিলে যে সেটা উড়ে এসে যখন হাতে পড়লো তখন দেখি সোণার চেয়ে সেটা মূল্যবান, আসল ফুলের চেয়ে হ'য়ে গেছে সুন্দর! বাঙলায় আমাদের মনে আর্টের মধ্যে অস্থিবিদ্যার কোন্ খানে স্থান, এই প্রশ্নটা ওঠবার কয়েক শত বৎসর আগে এই পাগলের দলের একজন আর্টিষ্ট এসেছিল। সে জেগে বসে' স্বপন দেখলে—যত মেয়ে শ্বশুর ঘরে রয়েছে আসতে পারছে না বাপের বাড়ী, একটা মূর্তিতে সেই সবারই রূপ ফুটিয়ে যাবে! আর্টিষ্ট সে বসে গেল কাদা মাটি খড় বাঁশ রং তুলি নিয়ে, দেখতে দেখতে মাটির প্রতিমা সোণার কমল হয়ে ফুটে' উঠলো দশ দিকে সোণার পাপড়ি মেলে! এ মূর্তি বাঙলার ঘরে ঘরে দেখবে দুদিন পরে, কিন্তু এরও উপরে ডাক্তারি শাস্ত্রের হাত কিছু কিছু পড়তে আরম্ভ হয়েছে সহরে। বাঙলার কোন অজ্ঞাত পল্লীতে এই মূর্তির মূল ছাঁচ যদি খোঁজ তো দেখবে—তার সমস্তটা artistic anatomyর নিয়মের দ্বারায় নিয়তির নিয়ম অতিক্রম করে' শোভা পাচ্ছে ব্যতিক্রম ও অতিক্রমের সিংহাসনে।

শিল্প ও ভাষা

"বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে॥"

বাঙ্গলা ভাষা যে বোঝে সেই এ শ্লোকটা শুনলেই বলবে—'বুঝলেম', কিন্তু 'ভারতী' কাগজের মলাটের নিচে থেকে টেনে বার ক'রে আজকালের একখানা ছবি সবার সামনে যদি ধরে দিই, সাড়ে পনেরো আনার চেয়ে বেশি লোক বলবে, 'বুঝলেম না মশায়!' এই শেষের ঘটনা ঘটতে পারে, হয় যে ছবিটা লিখেছে সেই আর্টিষ্টের ছবির ভাষায় বিশেষ জ্ঞান না থাকায়, অথবা যে ছবি দেখেছে চিত্রের ভাষার দৃষ্টিটা তার যদি মোটেই না থাকে। ভারতীর বন্দনাটা যে ভাষায় লেখা সেই ভাষাটা আমাদের সুপরিচিত আর 'ভারতী'র

ছবিখানা যে ভাষায় রচা সে ভাষাটা একেবারেই আমাদের অপরিচিত; সেই জন্য চিত্র-পরিচয় পড়েও ওটা বুঝলেম না এমনটা হতে বাধা কোন্‌খানে? চীনেম্যানের কানের কাছে খুব চেঁচিয়ে সরস্বতীর স্তোত্র পাঠ করলেও সে বুঝবে না, কিন্তু ছবির ভাষার বেলায় সে অনেকখানি বুঝবে, কেননা ছবির ভাষা অনেকটা সার্বজনীন ভাষা। ‘আবর্‌’ কথাটা ফরাসীকে বল্লে সে গাছ বুঝবে, আবার ‘আবর্‌’ শব্দ হিন্দুস্থানীর কাছে মেঘরূপে দেখা দেবে, ইংরেজ সে শব্দটার কোনরূপ অর্থ আবিষ্কার করতে পারবে না, কিন্তু আঁকার ভাষায় ‘আবর্‌’ হয় গাছ নয় অভ্র স্বরূপ হয়ে দেখা দেয়; কথিত ভাষার মতো কৃত্রিম উপায়ে জোর ক’রে চাপিয়ে দেওয়া রূপ নিয়ে নয়। সুতরাং ছবির ভাষার মধ্যে, বলতেই হয়, অপরিচয়ের প্রাচীর এত কম উঁচু যে সবাই এমন কি ছেলেতেও সেটা উল্লঙ্ঘন সহজেই করতে পারে, কিন্তু ঐ একটু চেষ্টা যার নেই তার কাছে ঐ এক হাত প্রাচীর দেখায় একশো হাত দুর্গপ্রাকার,—ছবি ঠেকে সমস্যা। কবির ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে’ মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন ক’রে ইঙ্গিত করতে করতে, আবার এই কথিত ভাষা যেটা আসলে কানের বিষয় এখন সেটা ছাপার অক্ষরের মূর্তিতে চোখ দিয়েই যাচ্ছে সোজা মনের মধ্যে; ‘নবঘনশ্যাম’ এই কথাটা—ছাপা দেখলেই রূপ ও রং দুটোর উদ্রেক করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে!

নাটক যখন পড়া হয় কিম্বা গ্রামোফোনের মধ্য দিয়ে শুনি তখন কান শোনে আর মন সঙ্গে সঙ্গেই নটনটীদের অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি মায় দৃশ্যপটগুলো পর্যন্ত চোখের কোন সাহায্য না নিয়েই কল্পনায় দেখে চলে, ছবির বেলায় এর বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—চোখ দেখলে রূপের ছাপগুলো, মন শুনে চল্লো কানের শোনার অপেক্ষা না রেখে ছবি যা বলছে তা; বায়স্কোপের ধরা ছবি, চোখে দেখি শুধু তার চলা ফেরা, ছবি কিন্তু যা বল্লে সেটা মন শুনে নেয়।

কবির মাতৃভাষা যদি বাঙ্গলা হয় তবে বাঙ্গলা খুব ভাল ক’রে না শিখলে ইংরেজ সেটি বোঝে না; তেমনি ছবির ভাষা অভিনয়ের ভাষা এসবেও দ্রষ্টার চোখ দোরস্ত না হলে মুস্কিল। মুখের কথা একটা না একটা রূপ ধরে

আসে, কাগ্ বগ্ বল্লেই কালো সাদা দুটো পাখী সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির! শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রংএর সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে—রূপ-কথা, অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা বলা নিয়ে চলন্তি ভাষা! কবিতার ছবির অভিনয়ের ভাষার মতো সুর আর রূপ দিয়ে বাক্যসমূহকে যথোপযুক্ত স্থান কাল পাত্র ভেদে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মতো সাজিয়ে গুজিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিলে তবেই যাত্রা সুরু ক'রে দিলে বাক্যগুলো, চল্লো ছন্দ ধরে, যথা—

"করিবর—রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্গেত—গেহা
অমল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জরী
জিনি অপরূপ সুন্দর দেহা॥"

কিন্তু বাক্যগুলোকে ভাষার সূত্রে নটনটী সূত্রধার এদের মতো বাঁধা হ'ল না, তখন কেবলি বাক্য সকল শব্দ করলে—ও, এ, হে, হৈ, ঐ কিম্বা খানিক নেচে চল্লো পুতুলের মতো কিন্তু কোন দৃশ্য দেখালে না বা কিছু কথাও বল্লে না, কোলাহল চলাচল হ'ল খানিক, বলাবলি হল না, যেমন—

"হল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মতি
হয় শান্ত কি ক্ষান্ত কৃতান্ত গতি
করি গঞ্জিত গুঞ্জিত ভৃঙ্গ সবে
ত্যজি মৃত্যু কি চিত্ত কি নিত্য রবে?"

শোলোক্টা কি যেন বলতে চাইলে কিন্তু খাপছাড়া ভাবে, এ যেন কেউ তুরকী আরবী পড়ে ফরাশি মিশালে! কিন্তু কথাকে কবি কথা বলালেন ভাষা দিয়ে, চালিয়ে দিলেন ছন্দ দিয়ে, কথাগুলো তবে সজাগ সজীব অভিনেতার মতো নেচে গেয়ে বাঁশি বাজিয়ে চল্লো পরিষ্কার।

"'চলিগো, চলিগো, যাইগো চলে'।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগনতলে।

বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।”

ছবির বেলাতেও এমনি, সুর সার কথাবার্তা এসবের সূত্রে রূপকে না বেঁধে, আঁকা রূপগুলো অমনি যদি ছেড়ে দেওয়া যায় পটের উপরে, তবে তারা একটা একটা বিশেষ্যের মতো নিজের নিজের রূপের তালিকা দ্রষ্টার চোখের সামনে ধরে চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে থাকে, বলে না চলে না—পিদুম, ফুল, ফুলদানি, বাবু, রাজা, পণ্ডিত, সাহেব কিম্বা অমুক অমুক অমুক এর বেশি নয়; কিন্তু প্রদীপ আঁকলেম, তার কাছে ফেলে দিলেম পোড়া সল্‌তে, ঢেলে দিলেম তেলটা পটের উপর—ছবি কথা ক’য়ে উঠলো,— “নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্‌”।

ছবিকে ইঙ্গিতের ভাষা দিয়ে বলানো গেল, চলানো গেল। নাট্যকলা প্রধানতঃ ইঙ্গিতেরই ভাষা বটে কিন্তু তার সঙ্গেও কথিত ভাষার সঙ্কেত অনেকখানি না জুড়লে নাটকাভিনয় করা চলে না—এই ‘লেকচার’ লিখছি সামনে এতটুকু ‘টোটো’ ছেলেটা বোবা নটের মতো নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে চল্লো, ভেবেই পাইনে তার অর্থ! হঠাৎ অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে শিশু নট বাক্য আর সুর জুড়ে দিলে অং অং ভুস্‌ ভুস্‌, বোঁ বন্‌, বন সোঁ শন্‌ শন্‌, হিং টিং ছট্‌ ফট্‌, আয় চট্‌ পট্‌, লাগ লাগ ভোজবাজি, চোর বেটাদের কারসাজি, ঠিক দুপুরে রদ্দুরে, তাল পুকুরে উত্‌তুরে, কার আজ্ঞে? না, কথিত ভাষার আজ্ঞে পেয়ে বোবা ইঙ্গিত যাদু-মন্ত্র কথা ক’য়ে ফেল্লে, যেন ঘুড়ি উড়িয়ে চল্লো ঘুরে ফিরে।

ছবির ভাষা, কথার ভাষা, অভিনয়ের ভাষা ও সঙ্গীতের ভাষা এই রকম নানা ভাষা এ পর্যন্ত মানুষ কাযে খাটিয়ে আসছে। এর মধ্যে সঙ্গীত শুধু যা বলতে চায়, কিম্বা যখন কাঁদাতে চায় বা হাসাতে চায়, কাকুতি মিনতি জানাতে চায় তখন ছবির ভাষা ও কথার ভাষাকে অবলম্বন না করেও নিজের স্বতন্ত্র ভাষার মীড় মূর্ছনা ইত্যাদি দিয়ে সুব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে। রং এর ভাষারও এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আছে—আকাশের রূপ নেই কিন্তু রংএর আভাস

দিয়ে সে কথা বলে। কিন্তু আর সব ভাষা কথিত চিত্রিত অভিনীত সমস্তই এ ওর আশ্রয় অপেক্ষা করে। সুর আর রূপ, বলা ও দেখা, এরা সব কেমন মিলে জুলে কায করে দু একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। মধুর বাক্যগুলো কানের জিনিষ হলেও মাধবীলতার মতো চোখের দেখা সহকারকে আশ্রয় না করে পারে না। দৃশ্য বা ছবিকে আশ্রয় না করে কিছু বলা কওয়া একেবারেই চলে না তা নয়, যেমন—

“কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর।
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে
এতদিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে।”

এখানে মনোভাব বাচন হল, কোন রূপ কোন ভঙ্গি, ছবি বা অভিনয়ের সাহায্য না নিয়েও। বাচনের বেলায় বাক্য স্বাধীন কিন্তু বর্ণনের বেলায় একেবারে পরাধীন, যেমন—

‘একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন।’

নব যৌবন আর বৃন্দাবনের বসন্ত শোভার ছবি বাক্যগুলোর মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকাচ্ছে!

‘অ◌ার কাল হৈল মোর কদম্বের তল
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল।’

বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো কালো যমুনা তার ধারে কদমতলা, তার ছায়ায় সহচরী সহিত রাধিকা—

‘আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন।’

রাধিকার রত্ন অলঙ্কারের ঝিকমিকি থেকে দূরের কালো পাহাড়ের ছবি দিয়ে Landscapeটা সম্পূর্ণ হল, ছবি মিলে গেল কথার সঙ্গে, কান চোখ

দুয়ের রাস্তা একত্র হয়ে সোজা চল্লো মনোরাজ্যে! এর পর আর ছবি নেই বর্ণনা নেই শুধু কথা দিয়ে বাচন—

‘এত কাল সনে অামি থাকি একাকিনী
এমন ব্যথিত নাহি শুনএ কাহিনী।’

এ বারে কথিত ভাষার ছবির সাক্ষাদ্দর্শন—

‘জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়—
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল
নিমিষে নিমিখ নাহি রয়।
সই দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে!’

একেবারে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছবি-দেখা কথার ভাষা দিয়ে! এইবার অঙ্গভঙ্গি আর চলার সঙ্গে কথার যোগাযোগ পরিষ্কার দেখাবো—

‘চলিতে না পারে রসের ভরে
আলস নয়ানে অলস ঝরে
ঘন ঘন সে যে বাহিরে যায়
আন ছলে কত কথা বুঝায়।’

চোখের সামনে চলাফেরা সুরু ক’রে দিলে কথার ভাষা অভিনয় করে নানা ভঙ্গিতে।

চিত্রিত ভাষা কথিত ভাষা অভিনীত ভাষা এসব যদি এ ওর কাছে লেনা দেনা করে চল্লো তবে কথিত ভাষার ব্যাকরণ অলঙ্কারের সূত্র আইন কানুন ইত্যাদির সঙ্গে আর দুটো ভাষার ব্যাকরণাদির মিল থাকতে বাধ্য। কথার ব্যাকরণে যাকে বলে ‘ধাতু’, ছবির ব্যাকরণে তার নাম ‘কাঠামো’ (form)। ধারণ করে রাখে বলেই তাকে বলি ধাতু। ধাতু ও প্রত্যয় একত্র না হ’লে কথিত ভাষার শব্দরূপ পাই না, ছবির ভাষাতেও ঠিক ঐ নিয়ম—মাথা হাত পা ইত্যাদি রেখে দিয়ে একটা কাঠামো বা ফর্মা বাঁধা গেল। কিন্তু সেটা বানর

না নর এ প্রত্যয় বা বিশ্বাস কিসে হবে যদি না ছবিতে নর বানরের বিশেষ প্রত্যয় দিই! শুধু এই নয়, বিভক্তি যিনি ভাগ করেন ভঙ্গি দেন, তাঁর চিহ্ন ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে কাঠামোয় জুড়ে দেওয়া চাই। বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে নানা বস্তুর সঙ্গে নানা বস্তুতে সন্ধি সমাস করার সূত্র আছে, ছবির ব্যাকরণে, বচন ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় এমন কি মুগ্ধবোধের সবখানি অলঙ্কারশাস্ত্রের সবখানির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া চলে ছবির ব্যাকরণ আর অলঙ্কারের ধারাগুলো। কথিত ভাষার বেলায় 'ভৃ' ধাতু গক্ প্রত্যয় করে যেমন 'ভৃঙ্গ', ছবির ভাষায় কালো ফোঁটার উপরে দুটো রেফ্ যোগ করলেই হয় 'দ্বিরেফ্ ভৃঙ্গ' আবার ভৃঙ্গের কালো ফোঁটায় রেফ্ না দিয়ে শুণ্ড প্রত্যয় দিলে হয় 'ভৃঙ্গার' যেমন 'ভৃ' ধাতুতে 'গিক' প্রত্যয় জুড়লে হয় 'ভৃঙ্গি'।

ছবি লেখার উৎসাহ নেই কিন্তু ছবির ব্যাকরণ লেখার আস্থা আছে এমন ছাত্র যদি পাই তো চিত্রকরে আর বৈয়াকরণে মিলে এই ভাবে আমরা ছবি দেওয়া একটা ব্যাকরণ রচনা করতে পারি, কিন্তু এ কাজে নামতে আমার সাহস নেই কেননা ব্যাকরণ বলে জিনিষটা আমার সঙ্গে কি কথিত ভাষা কি চিত্রিত ভাষা দুয়ের দিক দিয়েই চিরকাল ঝগড়া করে বসে আছে। সংকীর্তিত ভাষা যেমন, তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা, ব্যাকরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে এইটে যদি সাব্যস্ত হল তবে এও ঠিক হ'ল যে ছবি দেখা শুধু চোখ নিয়ে চলে না ভাষা-জ্ঞানও থাকা চাই দ্রষ্টার, ছবি-স্রষ্টার পক্ষেও ঐ একই কথা। 'রসগোল্লা খেতে মিষ্টি, টাপুর টুপুর পড়ে বৃষ্টি', এটা বুঝতে পারে না পাঠশালায় না গিয়েও এমন ছেলে কমই আছে, কিন্তু শিশুবোধের পাঠ থেকে ভাষা-জ্ঞান বেশ একটু না এগোলে—

'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বন মাঝে!'

এটা বোঝা সম্ভব হয় না চট্ ক'রে বালকের। শুধু অক্ষর কিম্বা কথা অথবা পদ কিম্বা ছত্রের পর ছত্র লিখতে পারলে অথবা চিনে চিনে পড়তে পারলেই সুন্দর ভাষায় গল্প কবিতা ইত্যাদির লেখক বা পাঠক হয়ে ওঠা যায় একথা কেউ বলে না, ছবি অভিনয় নর্তন গান ইত্যাদির বেলায় তবে সে কথা খাটবে কেন! যেমন চিঠি লিখতে পারে অনেকে তেমনি ছবিও লিখতে

পারে একটু শিখলে প্রায় সবাই, কিন্তু লেখার মতো লেখার ভাষা, আঁকার মতো আঁকার ভাষার উপর দখল ক'জনে পায়? কাযেই বলি যে ভাষাই হোক তাতে স্রষ্টাও যেমন অল্প তেমনি দ্রষ্টাও ক্বচিৎ মেলে। ভাষাজ্ঞানের অভাব বশতঃ ফুলকে দেখারূপে আঁকা এক ফুলের ভাষা শুনে নিজের ভাষায় ফুলকে বর্ণনা করায় তফাৎ আছে কে না বলবে!

বাঙ্গলা দেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা, কিন্তু সেই অপ্রচলিত ভাষা চলিত বাঙ্গলার সঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্‌ভুত ভাষা হয়ে প্রচলিত যেমনি হ'ল, অমনি বাঙ্গলার পণ্ডিত সমাজে খুব চলন হল সেই ভাষার, সবাই লিখলে কইলে বুঝলে বুঝালে সেই মিশ্র ভাষায়, চলিত বাঙ্গলায় খাঁটি বাঙ্গলায় লেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়লো, ফল হ'ল—এক কালের চলতি ভাষা সহজ কথা সমস্তই দুর্বোধ্য হয়ে পড়লো, এমন কি কথার অক্ষর মূর্তিটা চোখে স্পষ্ট দেখলেও কথাটার ভাব-অর্থ ইত্যাদি বোঝা শক্ত হয়ে পড়ল। বাঙ্গলা অথচ অপ্রচলিত কথাগুলোর বেলায় যদি এটা খাটে তবে ছবির ভাষার বেলায় সেটা খাটবে না কেন? ছবির মূর্তির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা বোঝাও দুঃসাধ্য হয়ে যে পড়ে তার প্রমাণ দেশের ইতিহাসে ধরা থাকে, আর সেইগুলোর নাম হয় অন্ধযুগ, এই অন্ধতার মধ্য দিয়ে আমাদের মতো পৃথিবীর অনেকেই চলেছে সময় সময়! চোখে দেখা মাত্রেই সবখানি বোঝা না গেল সে ছবি ছবিই নয় একথা না হয় শিল্পীর উপরে জবরদস্তিতে চালানো গেল, কিন্তু আমাদের নিজ বাঙ্গলার মুখের কথা আমরা অনেক সময়ে নিজেরাই বুঝিনে বোঝাতেও পারিনে ভাষাতে পণ্ডিতেরা না বুঝিয়ে দিলে, তবে কি বলবো বাঙ্গলা ভাষা বলে বস্তুটা বস্তুই নয়?—'ছীয়াল', 'ছিমনী', 'ছোলঙ্গ' এই তিনটেই বাংলা কথা, কিন্তু বুঝলে কিছু? ফরিদপুরের ছেলে 'ছোলঙ্গ' বলতেই বোঝে, বহরমপুরের লোক বোঝে না, বাঙ্গলা শব্দকোষ না আয়ত্ত হ'লে ওয়েবষ্টার জ্ঞান নিয়েও বুঝতে পারে না 'ছোলঙ্গ' হচ্ছে বাতাবি লেবু, লারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর। 'ছিয়াল', 'ছিমনী' এ দুটোও বাঙ্গলা কিন্তু বাঙ্গলার সাধুভাষা বলে কৃত্রিম ভাষা নিয়ে যারা ঘরকন্না করছেন তাঁরা এর একটাকে শৃগালের অপভ্রংশ আর একটাকে ইংরাজি চিম্‌নি কথার বাঙ্গলা বলেই ধরবেন কিন্তু এ দুটোই তা নয়—ছীয়াল মানে শ্রীল বা শ্রীমান ও শ্রীমতী, আর ছিম্‌নী মানে পাথর-কাটা

'ছেনী', শৃগালও নয় চিমনিও নয়। দুশো বছর আগে যে ভাষা চলিত ভাষা ছিল, পট ও পাটার ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির ভাষাও অপ্রচলিত হয়ে গেছে; সুতরাং যে শোলোক্‌টা এবারে বলবো তা বাঙ্গলা হলেও আমাদের কাছে চীনে ভাষারই মতো দুর্বোধ্য—

"ঘাত বাত হাত ঘর জোহি অয়লাহু
ন ভেতল চোলে অারে সবে অকলাহু।'

পরিচিত বাংলায় আন্দাজে আন্দাজে এর যতটা ধরা গেল তার তর্জমা করলেম, তবে অনেকটা বোধগম্য হল ভাবার্থটা—

ঘাট বাট হাট ঘর করিনু সন্ধান
চোরে না পাইরা মোরা হইনু হয়রান।

দুই তিন শত বছরের আগেকার বাঙ্গালী যে চলিত ভাষায় কথা কইতো তাই দিয়েই উপরের কবিতাটা লেখা, আজকের আমরা সে ভাষা দখল করিনি অথবা ভুলে গেছি, কবিতা দুর্বোধ হল সেইজন্য, ভাষার দোষেও নয় কবির দোষেও নয়।

কথিত ভাষার হিসেব পণ্ডিতেরা এইরূপ দিয়েছেন—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, মিশ্র অথবা সংস্কৃত, ভাষা আর বিভাষা। আর্টের ভাষাতেও এই ভাগ, যথা–শাস্ত্রীয় শিল্প Academic art, লোকশিল্প Folk art, পরশিল্প Foreign art, মিশ্রশিল্প Adapted art. লোকশিল্পের ভাষা হল—পটপাটা গহনাগাটি ঘটিবাটি কাপড়চোপড় এমনি যে সব art শাস্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে না মিল্লেও মন হরণ করে। শাস্ত্র ব্যাকরণ ইত্যাদি 'পণ্ডিতানাম্ মতম্' যে art এর সঙ্গে যোগ দেয়নি কিন্তু 'যত্র লগ্নং হি হৃৎ' হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে, শুক্রাচার্যের মতে তাই হল লোকশিল্পের ভাষার রূপ। আর যা 'পণ্ডিতানাম্ মতম্' যেমন দেবমূর্তি-রচনা শিল্প শাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত অথবা রাজা বা পণ্ডিতগণের অভিমত শিল্প সেই হল শিল্পের সংস্কৃত ভাষা—কোথাও লোকশিল্পের চলিত ভাষাকে মেজে ঘষে সেটা প্রস্তুত, কোথাও প্রাচীন লুপ্ত ভাষাকে চলিতের সঙ্গে মিলিয়ে নব কলেবর দিয়েও সাধুভাষারূপে সেটা প্রস্তুত করা হয়। পরশিল্প হ'ল যেমন গান্ধারের শিল্প, একালের অয়েল

পেণ্টিং। মিশ্রশিল্প চীনের বৌদ্ধশিল্প, জাপানের নারা মন্দিরের শিল্প, এসিয়ার ছাঁচে ঢালা এখনকার ইয়োরোপীয় শিল্প, গ্রীসের ছাঁচে ঢালা স্থানবিশেষের বৌদ্ধশিল্প এবং এখনকার বাঙ্গলার নবচিত্রকলা পদ্ধতি! সুতরাং সব ছেড়ে দিয়ে বাঙ্গলার নব চিত্রকলাকেই ধ'রে দেখা যাক—ছবিগুলো সমস্যা হয়ে উঠলে তো বড় বিপদ! ছবির ছবিত্ব চুলোয় গেল, সেগুলো হয়ে উঠলো ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব এবং বর-ঠকানো কূট প্রশ্ন! নব চিত্রকলার এ ঘটনা যে ঘটেনি তা অস্বীকার করবার যে নেই যখন সবাই বলছে, কিন্তু ছবিটা যে সমস্যার মতো ঠেকে সেটা ছবির বা ছবি লিখিয়ের দোষে অথবা ছবি দেখিয়ের দোষে সেটা তো বিচার করা চাই! "বায়বা যাহি দর্শতে মে সোমা অরং কৃতাঃ, তেষাং পাহি শ্রুবী হবং!" সব অন্ধকার ছবির সমস্যার চেয়ে ঘোরতর সমস্যা আমাদের মতো অজ্ঞানের কাছে, কিন্তু বেদের পণ্ডিতের কাছে এটা একেবারেই সমস্যা নয়! ছবি যেমন তেমনি রাজাও রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সৈন্য-সামন্ত, ধূম-ধাম, হাঁক-ডাক, দ্বারপাল, দুর্গ ইত্যাদির দুর্গমতা নিয়ে একটা মস্ত সমস্যার মত ঠেকেন প্রজার কাছে, কিন্তু উপযুক্ত মানুষ বলে রাজার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে—সেখানে রাজা হন রাজামহাশয়—দুর্গম সমস্যা নয়, তেমনি ছবি মূর্তির সত্তা হ'ল সুন্দর ছবি বা সুন্দরমূর্তি বা শুধু ছবি শুধু মূর্তিতে। রাজাকে উপযুক্ত মানুষের সত্তার দিক দিয়ে দেখার পক্ষেও যেমন দুর্গদ্বার ইত্যাদির বাধা আছে এবং কারো কারো কাছে নেইও বটে, ছবি মূর্তির সত্তার বোধের বেলাতেও ঠিক একই কথা। ছবিকে মূর্তিকে শুধু ছবি মূর্তির দিক দিয়ে বুঝতে পারলে আর সব দিক সহজ হয়ে যায় কিন্তু এ কাজটাও যে সবাই সহজে দখল করতে পারে—হঠাৎ ছবি মূর্তি দেখেই তাদের সত্তার দিক দিয়ে তাদের ধরা চট্ করে যে হয়—তা নয়, সেই ঘুরে ফিরে আসে পরিচয়ের কথা।

সুরের ভাষা যে না বোঝে সঙ্গীত তার কাছে প্রকাণ্ড প্রহেলিকা, দুর্বোধ শব্দ মাত্র! সুতরাং এটা ঠিক যে মানুষ কথা কয়েই বলুক অথবা সুর গেয়ে বা ছবি রচে' কিম্বা হাতপায়ের ইসারা দিয়েই বলুক সেটা বুঝতে হলে যে বোঝাতে চলেছে তারও তেমন ভাষা ইত্যাদির জটিলতা ভেদ করা চাই।

কথায় যেমন ছবি ইত্যাদিতেও তেমনি যখন কিছু বাচন করা হ'ল তখন সবাই সেটা সহজে বুঝলে, না হলে বাচন ব্যর্থ হ'ল। 'হুঁকো নিয়ে এস', এটা

ব্যাকরণ আড়ম্বর অলঙ্কার ইত্যাদি না দিয়ে বল্লেম, তবে হুকোবরদার বুঝলে পরিষ্কার, দরজার দিকে আঙ্গুল হেলিয়ে বল্লেম, "যাও", বেরিয়ে গেল হুকোবরদার, একটা মটর-কারের ছবি এঁকে দোকানের দরজার উপর ঝুলিয়ে দিলে সবাই বুঝলে এখানে মটর-কার পাওয়া যায় কিন্তু বর্ণনের বেলায় ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদির অবগুণ্ঠন আর আবরণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া গেল কথা ছবি সুর সার সমস্ত, কেমন করে সে বোঝে ভাষার গতিবিধির সঙ্গে যার মোটেই পরিচয় হয় নি!

দেবমাতা অদিতি তিনি স্বর্গেই থাকেন সুতরাং দেবভাষাতেই তাঁর অধিকার হল। একদিন তিনি শুনলেন জল সব চলেছে কি যেন বলতে বলতে! দেবমাতা বামদেবকে শুধালেন, "ঋষি! অ-ল-লা এইরূপ শব্দ করিতে করিতে জলবতী নদীগণ আনন্দ-ধ্বনি করতঃ গমন করিতেছে, তুমি উহাদের জিজ্ঞাসা কর, উহারা কি বলিতেছে?" অদিতির মতো, ঋষিরও যদি জলের ভাষাজ্ঞান জলের মতো না হতো, তবে তিনিও শুধু অ-ল-লাই শুন্‌তেন, কিন্তু ঋষি আপনার প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা নিয়ে বিশ্বের ভাষা বুঝে নিয়েছিলেন, জল কি বলে, মেঘ কি বলে, নদী সমুদ্র কি বলে, সমস্তই তিনি অবগত ছিলেন, কাজেই মেঘ থেকে ঝ'রে-পড়া জলের সেদিনের কথাটি দেবভাষাতে তর্জমা করে অদিতিকে জানানো তাঁর সুসাধ্য হল, যথা— 'জলবতী নদীগণ ইহাই বলিতেছে, মেঘসকলকে ভেদ করে জলসমূহের এমন শক্তি কোথায়? ইন্দ্র মেঘকে বিনাশ করতঃ জলসমূহ মুক্ত করেন, মেঘের আবরণ ইন্দ্রই ভেদ করেন।'

অ-র-ণ্য এই কটা অক্ষর জুড়ে দিলেই মূর্তিমান অরণ্যটা আমাদের চোখ দিয়ে সাঁ করে গিয়ে আজকাল প্রবেশ করে মনে, কিন্তু ভাষা যখন অক্ষরমূর্তি ধরেনি, শব্দমূর্তি দৃশ্যমূর্তিতে চলেছে তখন দেখি শুধু অরণ্য এইটে বাচন মাত্র করে দিয়েই ঋষির ভাষা স্তব্ধ হচ্ছে না, কিন্তু ছন্দে সুরে, অরণ্যের ভাষা শব্দ আর নানা রহস্য ধরে ধরে তবে অরণ্যের সত্তা আবিষ্কার কর্‌তে কর্‌তে চলেছে ঋষির ভাষা জিজ্ঞাসা আর বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে— "অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি, কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি নত্বা ভীরিব বিদন্তি॥ বৃষারাবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ। আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে॥ উতগাব ইবাদন্তুত বেশ্মেব দৃশ্যতে। উতো

অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি॥ গামং গৈষ আ-হ্বয়তি দার্বং গৈষো অপাবধীৎ। বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষাদিতি মন্যতে॥ ন বা অরণ্যানিহংত্যন্যশ্চেন্নাভি গচ্ছতি। স্বাদো ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে॥ আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নাসকৃষিবলাং। প্রাহং মৃগানাং মাতরমরণ্যানি মশংসিষং॥” ১৪৬ দেবমুনি ঋক্‌দেব॥

“হে অরণ্যানি! হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে লুপ্ত হও (কত দূরেই তুমি চলিয়াছ)! অরণ্যানি, তুমি গ্রামের বার্ত্তাই লও না, তোমার ভয় নাই এমনি ভাবে একাকী আছ।

“জন্তুরা বৃষের ধ্বনিতে কি যেন বলিতেছে, উত্তর সাধক পক্ষীরা চিচ্চিক স্বরে যেন তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে। এ যেন বীণার ঘাটে ঘাটে ঝনৎকার দিয়া কাহারা অরণ্যানীর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। বোধ হয় অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী সকল বিচরণ করিতেছে, কোথাও অট্টালিকার মত কি দৃশ্যমান, ছায়ালোকে মণ্ডিত সায়ংকালের অরণ্য যেন কত শত শকট ওখান হইতে বাহির করিয়া দিতেছে! কে ও! গাভী সকলকে ফিরিয়া ডাকিতেছে, ও কে! কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে, অরণ্যের মধ্যে যে লোক বাস করে সেই লোক বোধ করে সন্ধ্যাকালে যেন কোথায় কে চীৎকার করিয়া উঠিল! বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারো প্রাণবধ করে না, অন্যান্য শ্বাপদ জন্তু না আসিলে ওখানে কোন আশঙ্কা নাই। নানা স্বাদু ফল আহার করিয়া অরণ্যে সুখে দিন যাপন করা যায়, মৃগনাভি গন্ধে সুরভিত অরণ্য সেখানে কৃষিগণ নাই, অথচ বিনা কর্ষণেই প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হয়। মৃগগণের জননীস্বরূপা এমন যে অরণ্যানী তাঁহাকে এইরূপে আমি বর্ণন করিলাম।”

এখন উপরের এই অরণ্য বর্ণনার একটা তর্জমা বাঙ্গলায় না করে ছবির ভাষায় করলে অনেকের পক্ষে বোঝা সহজ হতো সবাই বল্‌বে। ভাল কথা—বর্ণনাটা ছবিতে ধরতে আর্ট স্কুলের পরীক্ষার দিনে কাঁচা আধপাকা পাকা সব আর্টিষ্টদের হাতে দেওয়া গেল, ফল কি হল দেখ। কচি আর্টিষ্ট যে ছবি দিয়ে শুধু বাচন করতেই জানে সে অরণ্যানী এইটুকু মাত্র একটা বনের দৃশ্যে বাচন মাত্র করে হাত গুটিয়ে বসলো—আর তো বাচন করবার কিছু পায় না। পক্ষীর চিক্ চিক্ বৃষের রব বীণার ঝনৎকার এ সবতো ছবিতে ধরা

যায় না, বাকি সমস্তটা মরীচিকার মতো এই দেখতে এই নেই। এদের স্থিরতা দিয়ে ছবিতে ধরলে সমস্তটা মাটি। কিন্তু আধপাকা আর্টিষ্ট little learning বা স্বল্প শিক্ষা যাকে ভীষণ সমস্ত পরীক্ষায় ভুলিয়ে নিয়ে চলে, সে ‘অরণ্য’ কথাটি মাত্র ছবিতে বাচন করে খুসি হলো না; সে নির্বাচন করতে বসে গেল—যেন যা হচ্ছে, যেন যা দেখা যাচ্ছে এমনি নব ছায়ারূপ মায় কস্তুরীগন্ধী সোনার মৃগটাকে পর্যন্ত রং রেখার ফাঁদে ধরতে চল্লো মহা উৎসাহে। প্রজাপতিকে যেমন ছেলেরা কুঁড়োজালিতে ধরে সেই ভাবে সব ধরলে ছবিতে চিত্রভাষায় নীতিপরিপক্ক আর্টিষ্ট, কিন্তু দেখা গেল ধরা মাত্র সব চিত্র পুত্তলিকার মত কাঠ হয়ে রইলো, ঋষির গতিশীল বর্ণনা দুর্গতিগ্রস্ত হয়ে গিলটির ফ্রেমের ফাঁস গলায় দিয়ে অপঘাত মৃত্যু লাভ করলে। তারপর এল পাকা শিল্পীর পালা। সে ঋক্‌বেদের সূক্তটা হাতে পেয়েই তার সমস্ত রসটা মন দিয়ে পান করে ফেল্লে, তারপর ছবির শাদা কাগজে মোটা মোটা করে লিখলে—ছবি মানে Book illustration নয়, একমাত্র stage craft এই বর্ণনার illustration চিত্র শব্দ আলো ছায়া এবং নানা গতিবিধি ইত্যাদি দিয়ে ফুটিয়ে দিতে পারে নিখুঁতভাবে, আমি stage manager নই, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করবেন। কথাগুলো অরণ্যের সত্তাকে একদিক দিয়ে বোঝালে, ছবির ভাষা অন্যদিক দিয়ে তাকে বোঝাবে এই জানি, illustration চান্, না ছবি চান্ সেটা জান্‌লে এই পরীক্ষায় অগ্রসর হব ইতি—

পুঃ—ঋষিরা এক জায়গায় বলেছেন ‘অন্যের রচনার সাহায্যে তোমরা স্তুতি করিও না,’ সুতরাং আমার নিজের মনোমতো রচনা দিয়ে আমি ঘরে গিয়ে অরণ্যের স্তুতি ছবি দিয়ে লিখে পাঠাবো মনে করেছি; বিদায়—।

যে ছেলেটা সব চেয়ে জ্যেঠা, পরীক্ষক যদি পাকা হন তো জ্যেঠা হিসেবে তাকেই দেবেন ফুল মার্ক, আর কাঁচা যার পক্ষে ignorance bliss তাকে দেবেন পাস্ মার্ক, আর মাঝামাঝি ছেলেটিকে দেবেন শূন্য, এটা নিশ্চয়ই বলতে পারি। ছবি, কথা, ইঙ্গিত, সুর সার ইত্যাদি যদিও এরা ভাষা—কিন্তু ব্যক্ত করার উপায় ও ক্ষেত্র এদের সবারই একটু একটু বিভিন্ন, এরা মেলেও বটে, না মেলেও বটে, এরা একই ভাষা-পরিবারভুক্ত কিন্তু একই নয়—“Language is a system of signs, of Ideas and of relation between Ideas. These signs may be spoken sounds as in ordinary speech or purely visual

(নাট্যচিত্র) or as the Egyptian Hieroglyphs (অক্ষর মূর্তি বা নিরূপিত বাক্য) or as construction of movements as in the finger language used by deaf mutes (ইঙ্গিত)"—(F. Ryland)

মানুষের ভাষা সব প্রথম শব্দকে ধরে' আরম্ভ হল কি বিচিত্র রূপকে ধরে' তা বলা শক্ত, তবে স্বভাবের নিয়মে দেখি জন্মাবধি শিশু শব্দ শোনা, শব্দ করা, আলো ছায়া এবং নানা পদার্থের রূপ রং ইত্যাদি দুটোই এক সঙ্গে ধরে বুঝতে এবং বোঝাতে চলেছে! ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং যে চোখের তারা ফিরিয়েছে বা যে হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে, তারি থেকে কথিত চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিনে সৃষ্টি হয়েছে বল্লে ভুল হবে না।

পুরাকালেরও প্রাক্কালে মানুষ যে সব শব্দ করে' এ ওকে ডাক্‌তো, সে তাকে আদর করে' কিছু শোনাতো কি জানাতো, যে বাক্য তারা বল্‌তো তার সুর সার ইঙ্গিত আভাষ কোন্ কালের আকাশে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু সেই সব দিনের মানুষের চিত্রিত যে বাক্য-সকল তা এখনো যে গুহায় তারা থাক্‌তো তার দেওয়ালে বিচিত্র বর্ণ আর মূর্তি নিয়ে বর্তমান আছে; ইউরোপে এসিয়ার নানাস্থানে কত কি যে ছবি তার ঠিকানা নাই—গরু, মহিষ, শৃগাল, হস্তী, অশ্ব, মৃগ-যূথ, দলে দলে জলের মাছ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অস্ত্র-শস্ত্র, কত কি! চিত্রের ভাষা দিয়ে তারা কি বোঝাতে চেয়েছিল তা এখনো ধর্‌তে পাচ্ছি—দিনের খবর, রাতের খবর, জলের খবর, বনের পশুর খবর, এমন কি হরিণের চোখটা কেমন তার খবরটা পর্যন্ত! সেই সব ইতিহাসের বাইরে ও-যুগের মানুষ এবং সাধক পুরুষেরা নিজেদের তপস্যালব্ধ চিত্রভাষার সাহায্যে মনোভাবগুলো লিখে গেছে, সুতরাং ছবিকেও খুব আদিকালে ভাষা হিসেবেই মানুষ যে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। শব্দের দ্বারায় বাক্যের দ্বারায় যেমন, আঁকা ও উৎকীর্ণ রূপের দ্বারাও তেমনি, পরিচিত সব জিনিষকে চিহ্নিত নিরূপিত নির্বাচিত করে' চলেছে মানুষ—এই হ'ল গোড়ার কথা। যারা জীবন্ত কিম্বা যারা গতিশীল কেবল তাদেরই আদি যুগের মানুষেরা চিত্রের ভাষায় ধরতে চেয়েছে গাছ, পাথর, আকাশ যারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শব্দ করে না, চলে না, বলেও না, আলোতে অরণ্যানীর মতো হঠাৎ দেখা দেয় আবার অন্ধকারে হঠাৎ মিলিয়ে যায়, ছবির ভাষায় তাদের

ধরা তখন সম্ভব বোধ করেনি মানুষ, হয়তো বা কথিত ভাষাতেও এ সব বর্ণন করে নি তখনকার মানুষ, কেন যে তা এক প্রকাণ্ড রহস্য! ধরতে গেলে, বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়েছে যে হরিণ কি মাছ তাদের ছবিতে ধরার চেয়ে, পাথর গাছ কি ফুল যারা স্থির রয়েছে চিরকাল ধরে', আঁকা দিয়ে তাদেরই ধরা সহজ ছিল, কিন্তু তা হয়নি। গাছ, পালা, পাহাড়, পর্বত, এরা বাদ পড়ে গেল, আর যাদের শব্দ অঙ্গভঙ্গি এই সব আছে—এক কথায় যাদের ভাষা আছে—পুরাতন মানুষের ছবির ভাষা আগে গিয়ে মিল্লো তাদেরই সঙ্গে! এ যেন মানুষের সঙ্গে চারিদিকের যারা এসে কথা কইল তাদেরই পরিচয় আগে লিখ্‌তে বস্‌লো মানুষ; জলকে মানুষ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—জল, তুমি কেমন করে চল? জল স্রোতের রেখা ও গতি-ভঙ্গি দিয়ে এঁকে ইঙ্গিত করে' শব্দ করে' যেন জানিয়ে দিলে—এমনি করে ঢেউ খেলিয়ে এঁকে বেঁকে চলি। হরিণ, তুমি কেমন করে দৌড়ে যাও?—হরিণ সেটা স্পষ্ট দেখিয়ে গেল। কিন্তু গাছকে পাথরকে শুধিয়ে মানুষ পরিষ্কার সাড়া পেলে না। গাছ, তুমি নড় কেন? এর উত্তর গাছ মর্মর ধ্বনি করে' দিলে—এই এমনিই নড়ি থেকে থেকে, জানিনে কেন! গাছের কথাই বোঝা গেল না, ছবিতেও তার রূপ ধরলে না মানুষ। পাহাড়, দাঁড়িয়ে কেন? আকাশ দিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ফিরে এল, কেন! ছবির ভাষায় এদের কথা লেখা হলই না, শুধু এদের বোঝাতে মানুষ গাছ বল্‌তে গোটাকতক দাঁড়ি কসি, পাহাড় বল্‌তে একটা ত্রিকোণ-চিহ্ন দিয়ে গেল কখন কখন কতকটা চীনে অক্ষরের মতো,—রূপাভাষ, কিন্তু পুরো রূপচিত্র নয়। ব্রতধারী মানুষ কামনা ব্যক্ত করবার সময় পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে কথা, ছবি, সুর, নাট্য ইত্যাদি মিশ্রিত ভাষা প্রয়োগ করে চলেছে তার রীতি আমাদের এখনো ধরে থাক্‌তে হয়েছে,—শুধু এক কালের অস্‌ফুট শিশুভাষ স্‌ফুটতর হয়ে উঠেছে, পুরাকালের ব্রতধারীর ভাষার সঙ্গে এখনকার ভাষার।

যে মানুষ ছবি কথা কিম্বা কিছু দিয়েই এককালে জননী পৃথিবীকে ধারণার মধ্যে আনতে পারেনি, স্‌ফুট ভাষার সাহায্যে সেই মানুষ আস্তে আস্তে একদিন পৃথিবীকে নিরূপিত করলে—আলপনার পদ্মপত্রের উপরে একটি বুদ্‌বুদের আকারে; স্তোত্রের উদাত্ত অনুদাত্ত সুরে ধরা পড়লো বসুন্ধরা—'হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্র দ্বারায় তোমার

স্তব করেন।' জীবন্ত হরিণ যে দ্রুত চলেছে তাকে ব্যক্ত করতে হল যেমন গমনশীল রেখা, তেমনি গমনশীল বাক্য ও সুর বর্ণনা করে চল্লো আকাশে ভ্রাম্যমাণা পৃথিবীকে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ, অকার থেকে ক্ষ ইত্যাদি শব্দ এই মিলিয়ে হল কথিত ভাষা, আর আকার থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রাকার ও তার বিন্দুটি পর্যন্ত নানা রেখা বর্ণ ও চিহ্ন মিলিয়ে হল চিত্র বিচিত্র ছবির ভাষা, এবং হাতপায়ের নানা সংকেত ও ভঙ্গি নিয়ে হল অঙ্কের পর অঙ্ক ধরে' গতিশীল নাটকের চলতি ভাষা। এই হল ভাষার আদি ত্রিমূর্তি এর পার্শ্ব-দেবতা হল দুটি—'বাচন' ও 'বর্ণন', এই মূর্তি নিয়ে ভাষা এগোলেন মানুষের কাছে। ঋষি বলেছেন—"হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্বপ্রথম বস্তুর নামমাত্র বাচন করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান—নামরূপ হল গোড়ার পাঠ।" এর পরে এল বন্দনা থেকে আরম্ভ করে বর্ণনা পর্যন্ত, আবৃত্তি থেকে সুরু করে বিবৃতি পর্যন্ত—"বালকদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল তাহা বাগ্‌দেবীর করুণায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল।"—ভাষা, বোধোদয় বস্তুপরিচয় ইত্যাদি ছাড়িয়ে অনেকখানি এগোলো। তারপর এলো ভাষার মহিমা সৌন্দর্য ইত্যাদি—"যেমন চালনীর দ্বারায় শক্তুকে পরিষ্কার করা হয় সেইভাবে বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। (সেই ভাষাকে প্রাপ্ত হইলে পর) যাহাদিগের চক্ষু আছে কর্ণ আছে এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন......সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার লাভ করেন,...ঋষিদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী স্থাপিত আছেন...বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞ দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন...ঋষিদিগের অন্তঃকরণের মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন, সেই ভাষা আহরণপূর্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন, সপ্ত ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে...।" বিশ্বরাজ্যের প্রকট রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সমস্তই পাচ্ছিল মানুষ ভাষাকে পাবার আগে থেকে, কিন্তু মনের মধ্যে তবুও মানুষের একটা বেদনা জাগছিল—মনের কথাকে খুলে বলবার বেদনা, মানসকে সুন্দররূপে প্রকট করার বাসনা, সুপরিষ্কৃত ভাষাকে পাবার জন্যে বেদনা মনে জাগছিল। মানুষের সব চেয়ে যে প্রাচীন ভাষা তাই দিয়ে রচা বেদ এই বেদনের সুরে ছত্রে ছত্রে পদে পদে ভরা দেখি; "আমার কর্ণ, আমার হৃদয় আমার চক্ষুর্নিহিত জ্যোতি সমস্তই তোমাকে

নিরূপণ করিতে অবগত হইতে ধাবিত হইতেছে...দূরস্থবিষয়ক চিন্তাব্যাপৃত আমার হৃদয় ধাবিত হইতেছে...আমি এই বৈশ্বানর স্বরূপকে কিরূপে বর্ণন করি কিরূপই বা হৃদয়ে ধারণ করি!" কিম্বা যেমন—"কিরূপ সুন্দর স্তুতি ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিবে।" হৃদয়ের বেদনার অন্ত নেই, দেখতে চেয়ে শুন্‌তে চেয়ে প্রাণ ব্যথিত হচ্ছে, ধাবিত হচ্ছে। অতি মহৎ জিজ্ঞাসার উত্তর পাচ্ছে মানুষ অতি বৃহৎ পরম সুন্দর, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরের মতো মহাসুন্দর ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না!—"যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন, সেই বিশ্বদেবতাসকলের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তমরূপে রচনা করি!" মনের নিবেদন সুন্দর করে উত্তম করে জানাবার জন্য বেদনা আর প্রার্থনা। কোন রকমে খবরটা বাৎলে দিয়ে খুসি হচ্ছে না মানুষের মন, সুন্দর উপায় সকল উত্তম উত্তম সুর সার কথা গাথা ইঙ্গিতাদি খুঁজছে মানুষ এবং তারি জন্যে সাধ্য সাধনা চলেছে—"হে বৃহস্পতি! আমাদিগের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতাদোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফূরিত হয়।" ছবি দিয়ে যে কিছু রচনা করতে চায় সেও এই প্রার্থনাই করে—রং রেখা ভাব লাবণ্য অভিপ্রায় সমস্তই যেন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হয়ে ফোটে। ধরিত্রীকে বর্ণন করতে ঋষি গতিশীল স্তোত্র আর ভাষা চাইলেন। ভাষার পথে গতি পৌঁছয় কোথা থেকে? মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাষাও বদলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি—বাঙ্গলার পক্ষে সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা হল অচল ভাষা, কেননা সে শব্দকোষ ব্যাকরণ ইত্যাদির মধ্যে একেবারে বাঁধা, মনের চেয়ে পুঁথির সঙ্গে তার যোগ বেশি! বাঙ্গালীর মন বাঙ্গলায় জুড়ে আছে, সুতরাং চলতি বাঙ্গলা চলেছে ও চলবে চিরকাল বাঙ্গালীর মনের গতির সঙ্গে নানা দিক থেকে নানা জিনিষে যুক্ত হতে হতে, ঠিক জলের ধারা যেমন চলে দেশ বিদেশের মধ্যে দিয়ে। ছবির দিক দিয়েও এই বাঙ্গলার একটা চলতি ভাষা সৃষ্ট হয়ে ওঠা চাই, না হলে কোন্ কালের অজন্তার ছবির ভাষায় কি মোগলের ভাষায় অথবা খালি বিদেশের ভাষায় আটকে থাকা চলবে না। ঋষিরা ভাষাকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন—"হে ইন্দ্র, হে অগ্নি! মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইল।" বৃষ্টির জল ঝরণা দিয়ে নদী হয়ে বহমান হল, তবেই সে কাজের হল, আর জল আঁট হয়ে হিমালয়ের চূড়োয় বসে রইলো—গল্লোও না চল্লোও না, গলালেও না

চালালেও না, জলের থাকা না থাকা সমান হল। বাঁধা বস্তুর বা styleএর মধ্যে এক এক সময়ে একটা একটা ভাষা ধরা পড়ে যায়। কথিত ভাষা চিত্রিত বা ইঙ্গিত করার ভাষা সবারি এই গতিক! যেমনি style বেঁধে গেলো অমনি সেটা জনে জনে কালে কালে একই ভাবে বর্তমান রয়ে গেল—নদী যেন বাঁধা পড়লো নিজের টেনে আনা বালির বাঁধে! নতুন কবি নতুন আর্টিষ্ট এঁরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন style উল্টে পাল্টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে। এ যদি না হতো তবে বেদের ভাষাই এখনো বলতেম, অজন্তার বা মোগলের ছবি এখনো লিখতেম এবং যাত্রা করেই বসে থাকতেম সবাই! ভাষা সকল গোলক ধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতো অথচ দেখে মনে হতো ভাষা যেন কতই চলেছে!

শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড

মানব-শিল্পের শৈশবটা কাটলো মানুষের ঘরের এবং বাইরের খুব দরকারী কায করতে। পাথর ঘসে’ তীরের ফলা তৈরি করা, হাঁড়িকুঁড়ি গড়া, কাপড় বোনা, হাড়ের মালা গাঁথা, লোহার বালা গড়া, শীতের কম্বল বসবার আসন—এমনি নানা জিনিষের উপরে শিল্পের ছাপ পড়লো। নানা জিনিষ প্রস্তুতের নানা প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে দখল হয় মানুষের। মানুষ সভ্যতার দিকে যখন এগোলো তখন কতক শিল্পকলা রইলো ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে, কতক রইলো রাজসভার সঙ্গে জড়িয়ে। প্রধানতঃ এই দুই রাস্তা ধরে শিল্পের ক্রিয়াকাণ্ড চল্লো সব দেশেই। পূজোর জন্য যে সব মন্দির প্রতিমা ইত্যাদি তাদের প্রস্তুত করার নানা প্রকরণ এবং প্রাসাদ নির্মাণ, হাট বসানো, কূয়ো খোঁড়া ইত্যাদির নানা কথা সংগ্রহ হয়ে পণ্ডিতদের দ্বারা শিল্পশাস্ত্রে ধরা হ’ল, নানা শিল্প বিষয়ে নানা কথা নানা অধ্যায়ে বিভক্ত হয়ে শাস্ত্রের মধ্যগত রইলো—এই হ’ল শিল্পশাস্ত্রের গঠনের মোটামুটি হিসেব। তারপর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চার শাস্ত্রের মধ্যে মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে নানা শিল্পকলার কথাও বলা হ’ল এবং আংশিকভাবে নানা পুরাণেও প্রসঙ্গক্রমে শিল্পের এবং নানা কলাবিদ্যার কথা লেখা রইলো।

শিল্পশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ সব যা ছিল বলেই শুনি, সেই সব প্রাচীন শাস্ত্রের সারসংগ্রহ বলে’ যে সব পুঁথি নানা কালে এ-দেবতা ও-ঋষি বা অমুক

তমুকের কথিত বলে’ লেখা হ’ল—রাজরাজড়ার পুস্তকাগারে ধরার জন্য সেইগুলোই কতক কতক এখন পাওয়া যাচ্ছে। তা থেকে দেখা যায় যে, ধর্মের সেবায় শিল্পের যে সব দিক জড়িয়ে ছিল তারি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হ’ল কিন্তু অন্যান্য কলা যা সৌখিন রাজরাজড়ার সেবায় লাগতো তাদের বিস্তারিত বিবরণ লেখাই গেল না। পূজার প্রতিমা কেমন করে’ করতে হবে তার ঠিকঠাক নিয়ম লক্ষণ সমস্তই পাই, কিন্তু কাপড়-চোপড় নানা গন্ধতৈল নানা মূল্যবান তৈজসপত্র এদের প্রস্তুতের প্রকরণ শিল্পশাস্ত্রে দেখি ক্বচিৎ ধরা হ’ল। এ ধরণের সামগ্রীর মধ্যে এক বজ্রপ্রলেপের কথা লেখা আছে দেখি সব শিল্পশাস্ত্রে, কিন্তু বজ্রমণির বেলায় তার ধারণের কি গুণাগুণ তার বর্ণ ও মূল্যাদির হিসেব হ’ল ধরা কিন্তু বজ্রমণিটা বিদ্ধ করা যায় কি প্রক্রিয়ায় এবং কত রকম গহনা হয়, কত নাম তাদের,— এ সব কিছু নেই শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে। প্রতিমা-লক্ষণ, প্রাসাদ-নির্মাণ, কূপ-খনন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা শিল্পশাস্ত্রে যেমন নানা অধ্যায়ে ভাগ করে লেখা রইলো, তেমন করে ভূষণ-শিল্প যেটা একটা খুব বড় art প্রাচ্য জগতের— তার হিসেব ধরা দরকারী বোধ হল না।

এই যে সমস্ত সৌখিন শিল্প, তার উদ্ভাবনা ও গঠনের প্রক্রিয়া সমস্ত শিল্পীদের ঘরে অলিখিত অবস্থায় পিতা থেকে পুত্রে অর্সাতে চল্লো। এই সব বিচিত্র শিল্পের নানা আদর্শ বর্তমান রইলো কিন্তু তাদের প্রস্তুত করণের প্রক্রিয়া সমস্ত কত যে লোপ পেয়ে গেল তার ঠিক নেই। এই কারণে বলতেই হয় আমাদের শিল্পশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র বলতে যা বোঝায় তা নয়, তাতে অঙ্গবিদ্যা হিসেবে আংশিকভাবে প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন কলাবিদ্যার কথা বলা হয়েছে, ভারতশিল্পের প্রায় সাড়ে পনেরো আনা অংশের কথাই পাড়া হয়নি তাতে। এখন ধর্মের সঙ্গে শিল্পের আগেকার যোগ বিচ্ছিন্ন হতেই চল্লো, শিল্পের যে অনাদৃত দিক বিচিত্র দিক যা নিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা সুন্দর হয়ে উঠলো মধুময় হয়ে উঠলো সেই দিকে মানুষের নজর পড়লো; ঘরের শিল্প আবার ঘরেই ফিরেছে পরের কাজ চুকিয়ে।

শিল্পকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে না দেখে’ শিল্পের দিক দিয়ে দেখা খুব অল্প দিন হ’ল ইউরোপে চলিত হয়েছে। প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে এই ভাবে শিল্পরসের দিক দিয়ে কলা সমস্তকে দেখা আলিঙ্কারিকগণ প্রচলিত করে

গেছেন। শুধু কাব্যকলার সঙ্গে জড়িয়ে রাখলে অলঙ্কারশাস্ত্র রস-শাস্ত্র ইত্যাদি খুব কাজে আসবে না, অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচারপ্রণালী ধরে শিল্পবিদ্যা বুঝতে চল্লে ঢের বেশী ফল পাব আমরা। শিল্পের পুরাতত্ত্ব হিসেবে শিল্পশাস্ত্র কাযে লাগবে, প্রাচীনের সঙ্গে শিল্পশাস্ত্রের দিক দিয়ে এখনকার শিল্পীদের আংশিকভাবে যোগ ছাড়া বেশী কিছু হবে না; আমরা হাজার বছর আগে কত বড় শিল্পী ছিলেম এই ভাবের একটা ভূয়ো গর্বও লাভ হ'তে পারে—কিন্তু সে শুধু পড়ে যাওয়া বিদ্যা হবে শিল্পবোধ তাতে হবে না। রসের ও ভাবের প্রক্রিয়া ধরে' কবিতা ছবি মূর্তি এমন কি খেলনাটারও পরিচয় হ'ল ঠিক পরিচয়। বিদেশীয় রসিকেরা এই পথে কায করে চলেছেন অনেকেই। শিল্পী ও শিল্পরসিক কেমন করে' হয় তা ঠিক করে বলা কঠিন। হঠাৎ দেখি কেউ রস পেয়ে গেলো কেউ বা সারা বছর অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়ে' পড়ে চোখই ক্ষরিয়ে ফেল্লে। কবি কেমন করে' হয় কাব্য-প্রকাশে লেখা আছে দু'চরণ শ্লোকে। কলাশাস্ত্রের গোড়ায় ঠিক এই কথা লেখা হ'লে মানায়—প'ড়ে পাই বিদ্যা, না পড়ে' পাই কলা-বিদ্যা। কিন্তু না পড়ে' পেলেও কলাবিদ্যাকে পড়ে পাওয়া শক্ত। হাতে কলমে কাজ করা হ'ল শিল্পের নানা প্রকরণ, সহজে দখল করার সহজ উপায়। রং রেখা এদের টেনে দেখলে এদের রহস্য সহজ হয়ে আসে।

পড়ার দ্বারা নয় ক্রিয়ার দ্বারা শিল্পকর্মে দক্ষতা হয় যদি এই কথাই হ'ল তবে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা পড়াশুনো করছে না অথচ artistও হয়ে উঠছে না। তারা কেউ চাষা হচ্ছে কেউ দোকানি-পসারি মুটে-মজুর হচ্ছে। অবশ্য এদের অনেকের কাজই শিল্পশাস্ত্রের চৌষট্টি কলার কোনটা না কোনটার মধ্যে পড়ে' যায়, কিন্তু হ'লে কি হয়! আমরা নিজেদের সব দিক দিয়ে যতই cultured বোধ করি না কেন চাষাকে artist ভাবা মজুরকে artist বলা শক্ত হয়েছে; যারা গাধাবোট টেনেই চলেছে তাদের কেউ এখন artist বলে না কিন্তু যে ছেলেরা বাচ খেলায় মজবুত হল তাদের বলি artist!

অাজকে আমাদের পক্ষে "philosopher জ্ঞানী লোক, cultivator চাষা", এবং artist তারাই যারা নিত্য জীবনযাত্রার থেকে স্বতন্ত্র অতিরিক্ত কিছু নিয়ে রয়েছে। আগে কিন্তু এ ভাবটা ছিল না, তখন সহরের লোক দেখি চোরের সিঁদ কাটার নানা কায়দা দেখে পুলিশ ডাকার কথা ভুলে ফুটো দেওয়ালের

সামনে দাঁড়িয়ে কেমন সিঁদটা কাটা হয়েছে এই নিয়ে art lecture আরম্ভ করে' দিয়েছে। হয়তে বা চোর সে নিজের কাটা সিঁদের বাহার দেখে' খুসিতে রয়েছে এমন সময় পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করলে artistকে। বর্ষাকালে দেখি ক্ষেতের দিকে চেয়ে চাষার গান চল্লো–

"গগন ঘটা ঘহরাণী সধো
গগন ঘটা ঘহরাণী
পূরব দিস্‌সে উঠিহৈ বদরিয়া
রিম ঝিম বরষত পানী।

আপন আপন মেড়ঁ সম্‌হারো
বহ্যো জাত য়হ পানী
সুরত নিরত কা বেল নহায়ন
করৈ খেত নির্ব্বাণী।"
—কবীর

ঘনঘটা ঘনিয়ে এল পূবে বাদল উঠলো রিমঝিম বরিষ নামলো, সামাল ভাই ক্ষেতের আল, ঐ যে জল বয়ে চল্লো। দুটি লতা—অনুরাগের বিরাগের—তাদের আজ এই রসের বৃষ্টিধারায় ভিজিয়ে নাও, এমন ক্ষেত লাগাও যেখানে অবাধ মুক্তির ফসল ফলে, ক্ষেতের ফসল কেটে ঘরে তুলতে পারে, তাকেই তো বলি কুশল কিষাণ।

সেকালে তাঁরা art কিসে নেই বা কিসে আছে এটা সুনিশ্চিত করে দিতে অথবা নানা রকম কলাবিদ্যার সংখ্যা নির্ধারণ করে' চৌষট্টির মধ্যেই artকে ধরে রাখতে চান নি; এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হ'ল:

"বিদ্যা হ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে।
বিদ্যা মুখ্যাশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিঃ কলাঃ স্মৃতাঃ॥" (শুক্রনীতিসার)

এইভাবে বিদ্যা এবং কলা দুয়ের প্রভেদটা মাত্র মোটামুটি রকমে শাস্ত্রে ধরা হ'ল:

"যদ্‌যত্ স্যাদ্ বাচিকং সম্যক্ কর্ম্মবিদ্যাভিসংজ্ঞকম্।
শক্তো মূকোপি যৎ কর্ত্তুং কলাসংজ্ঞন্তু তৎস্মৃতম্॥" (শুক্রনীতিসার)

আমরা এখন artকে fine, industrial—নানাভাগে ভাগ করে' নিয়েছি। আগেও এই রকম ভাগ ছিল শিল্পে—কর্মাশ্রয়া দ্যুতাশ্রয়া উপচারিকা ইত্যাদি হিসেব। সেকালের চৌষট্টি কলার ফর্দটার মধ্যে যাকে বলি fine art, যাকে বলি industrial art এবং যাকে বলি science, সবই এক কোঠায় রাখা গেছে। সেকালের হিসেবে ধরলে আজকালের Football, Billiards ইত্যাদি খেলা artএর মধ্যে এসে পড়ে; সন্তান-পালন একটা artএর মধ্যে ছিল আগে, এখন ওটা আমরা Medical scienceএর মধ্যে ফেলে দিয়েছি। এমন কি ছেলেদের খেলার পুতুল গড়া ও কেষ্টনগরের পুতুল গড়া এবং গড়ের মাঠের ধাতুমূর্তি গড়া—তিনটেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের শিল্প বলে ধরে নিয়েছি। মানুষের উন্নত ও সুন্দর এবং সুকুমার বৃত্তিসমূহ যে শিল্পকাযের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয় তাকে বলি fine art, মানুষের প্রতিদিনের জীবনের নানা সাজ সরঞ্জাম যাতে করে' শুধু কাযের নয় সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন হয়ে ওঠে তাকে বলি industrial art; এমনি artএর মোটমাট জাতিবিভাগ সৃষ্টি হয়ে গেছে মানুষের নিজের মধ্যে সমাজ-বন্ধনের সময়ে নানা বর্ণ-বিভাগের প্রথায়; artistদের কাছে কিন্তু এ রকম একটা বিভাগ নিয়ে artএর উপভোগের তারতম্য ধরা একেবারেই নেই, সেখানে art এক কোঠায় না art অন্য কোঠায়, ইতর বিশেষ, মাঝামাঝি, চলনসই—এ সব কথা নেই, art কি art নয় এই বিচার।

শিল্পশাস্ত্র আমাদের যা রয়েছে তাতে ভাস্কর্যের একটা দিক, স্থাপত্যের খানিকটা—যেটা পূজন ও যজন-যাজনের সঙ্গে জোড়া, তারি উপরে বিশেষভাবে মতামতের জোর দেওয়া হয়েছে দেখা যায়। তা ছাড়া এটাও দেখি যে শিল্পশাস্ত্রের সংগ্রহকার্যে ভারি একটা ত্বরা রয়েছে— কোন রকমে একটা প্রাচীনত্বের ছাপ মেরে জিনিষটাকে সাধারণে প্রচার করার ত্বরা–একটা ধর্মবিপ্লবে এবং সেই সময়ের ত্বরা—শিল্পকে নিয়ে টানাটানি এ সবই লক্ষ্য করি শিল্পশাস্ত্রের সংগ্রহের ধরণ থেকে।

Artএর মধ্যে একটা অনির্বচনীয়তা আছে যেটা artistএর অনুভূতির বিষয় এবং অসাধারণ বলেই artএর অনির্বচনীয় রস যে কি ব্যাপার তা সবাইকে বুঝিয়ে ওঠা কঠিন। রস পেলে তো পেলে, না পেলে তো পেলে না, এসব কথা শিল্পশাস্ত্রকার বিচার করবার সময় পাননি, এসব চিন্ত আলঙ্কারিকদের, রসের দিক দিয়ে তার বিচার করে দেখেন যে সেদিক দিয়ে এতটুকু বা এত বড় নেই সরস বা নীরস নিয়ে কথা। মাটির খেলনা সরস হ'ল তো মগধের নাড়ুর চেয়ে বড় জিনিষ হ'ল এবং মগধ উড়িষ্যা সব শিল্পের বড় বড় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ ও গণেশের সমতুল্য হয়ে উঠলো একটি সুন্দর আরতিপ্রদীপ। আর্টের জগৎ শিল্প কি শিল্প নয় এই নিয়ে,- উচ্চনীচ ভালমন্দ ভেদাভেদ, দেবতা কি মানুষ কি বানর এ নিয়ে দেখা নয়,—art কি art নয় এই নিয়ে সব জিনিষকে পরীক্ষা করা হ'ল অকাট্য নিয়ম। Art for art এই কথাই হ'ল artistএর, art ধর্মের জন্য কি জাতীয় গৌরবের ধ্বজা সাজাবার জন্য কি natureএর সম্মুখে mirror ধরার জন্য অথবা বিপশ্চিতাম মতম্‌-কে বলবৎ রাখার জন্য, এ তর্ক আর্টের জগতে উঠতেই পারে না।

Artist যে উদ্দেশ্যেই কায করুক artএর দিকে চেয়ে করাই হ'ল তার প্রধান কায। ময়ূর নিজের আনন্দে তার চিত্র-বিচিত্র কলাপ বিস্তার করে, বাগানের শোভা কি বনের শোভা কি খাঁচার শোভা তাতে হ'ল কি না হ'ল ময়ূরের মনে একথা উদয়ও হ'ল না; এতটা স্বাধীনতা মানুষ শিল্পে চায় কিন্তু পেলে কই?—ধর্ম বল্লে তুমি আমার কাজে লাগো, দেশ বল্লে আমার, এমনি নানাদিক দিয়ে শিকল পড়ে গেল শিল্পের হাতে পায়ে, তারপর একদিন চিরকালের ছাড়া পাখী তার মনিবের পোষ মানলে, ইসারাতে পুচ্ছ ওঠালে নামালে যে শুধু তাই নয়, জলযন্ত্র ঘোরালে ঘটিযন্ত্র চালালে কামান দাগলে নিয়ম মতো!

"অপি শ্রেয়স্করং নৃণাম্‌ দেববিম্বমলক্ষণম্‌।
সলক্ষণং মর্ত্ত্যবিম্বম্‌ নহি শ্রেয়স্করং সদা।।"

এই হুকুমে এককালে আমাদের শিল্পীরা বাঁধা পড়ে' ছিল। পুঁথিকার দেবতা সমস্তের ধ্যান দিলে শিল্পে, সেই ধ্যান মতো গড়ে চল্লো— এই ঘটনাই যদি পুরোপুরি ঘটতো তবে আমাদের art কেবলমাত্র ধ্যানমালার illustration

হয়ে যেতো কিন্তু এর চেয়ে যে বড় জিনিষ হয়ে উঠলো বুদ্ধ নটরাজ প্রভৃতি নানা দেবমূর্তি সেটা ধ্যানমালার লিখিত ধ্যানের অতিরিক্ত এবং শিল্পশাস্ত্রের মান-পরিমাণ লক্ষণাদির বাঁধা নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র আর কিছু নিয়ে। প্রাচীন দেবমূর্তিগুলি আমাদের বাঙলার কার্তিকের মতো সম্পূর্ণ কাপ্তেনবাবু বা কলে কাটাছাঁটা মরা জিনিষ হয়ে পড়েনি শুধু শিল্পের শিল্প-ক্রিয়া তাদের অমরত্ব দিলে বলে' এবং শুধু সেইটুকুর জন্য artএর জগতে এইসব দেবতার স্থান হ'ল।

শাস্ত্র বল্লে শিল্পকে ঘাড়ে ধরে', দেবলোকটাই অাছে তোমার কাছে, মর্ত্যলোক নেই, যদি বা থাকে তো সেদিকে দৃক্‌পাত করবে না— তা হ'লে অন্ধ হবে । কিন্তু artist এর পথ স্বতন্ত্র কেননা art সে অনন্যপরতন্ত্রা, শিল্পীর কাছে দেবলোকের স্বপ্ন সেও যেমন প্রত্যক্ষ ও সুন্দর, মর্ত্যলোকের ছবি সেও তেমনি অভাবনীয় সুন্দর ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার, দুটোই তুল্য-মূল্য, যদি art হ'ল এবং রসের স্বাদ দিলে। শাস্ত্রী চাইলেন মর্ত্যকে ছেড়ে শাস্ত্রীয় স্বর্গ, ইহলোককে মুছে দিয়ে পুঁথির পরলোক। কিন্তু শিল্পীর শিল্পবৃত্তি তাকে অন্য পথ দেখালে; মর্ত্যলোকের মাটির দেহে সবখানি সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে উঠল, শাস্ত্র যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড চেয়েছিল তা হতেই পারলে না, অনেকখানি সৃষ্টিরহস্য শিল্পীর মনে ক্রিয়া করে' পাগলামির অনাসৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে দিলে এ দেশের প্রতিমা-শিল্পকে। শিল্পশাস্ত্রের দেবলোক ও তার অধিবাসী তাঁরা একেবারেই তেত্রিশ কোটি গণ্ডীর মধ্যে ঘেরা, নিখুত মান-পরিমাণ লক্ষণ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বাঁধা শাস্ত্রীয় দেবলোক ও দেবতা হওয়া ছাড়া সেখানে উপায় নেই, শিল্পীর মনের দেবতা এবং শাস্ত্রের দেবলোকের সঙ্গে শিল্পীর শিল্পলোকের কল্পনায় তফাৎ থাকতে পারে এই ভয় করেই শাস্ত্রকার কসে' বেঁধেছেন আপনার নিয়ম জায়গায় জায়গায়—নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু; পূজার জন্য যে প্রতিমা তা শাস্ত্রমতো না গড়লে তো চলে না সুতরাং শিল্পীর ওপরে কড়া হুকুম জারি করতেই হল নানা ভয় দিয়ে—"হীনাঙ্গী স্বামিনং হন্তি হ্যধিকাঙ্গীচ শিল্পিনম্।" এক চুল এদিক ওদিক হ'লে একেবারে মৃত্যুদণ্ড; বেতের ভয় নয়—"কৃশা দুভিক্ষদা নিত্যং স্থূলা রোগপ্রদা সদা", অন্ধতা বংশলোপ ইত্যাদি নানা ভয় দিয়ে শিল্পীকে ও শাস্ত্রীয় মূর্তিকে কঠিন নিয়মে বাঁধার চেষ্টা হ'ল, কিন্তু এতে যে কাজ ঠিক

চল্লো তা নয়, এদিক ওদিক হতেই থাকলো মাপজোখ ইত্যাদিতে, শিল্পী মানুষ তো কল নয়, সে ক্রিয়াশীল ক্রীড়াশীল দুইই, সুতরাং একটু ঢিলে দিতে হল নিয়মের কসনে।

"লেখ্যা লেপ্যা সৈকতী চ মৃণ্ময়ী পৈষ্টিকী তথা।
এতাসাং লক্ষণাভাবে ন কশ্চিৎ দোষ ঈরিতঃ॥
বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভূতে চন্দ্রকান্তসমুদ্ভবে।
রত্নজে গণ্ডকোদ্‌ভূতে মানদোষো ন সর্ব্বথা॥"

ছবি modelling, plaster cast এমনি অনেক জিনিষ এবং স্ফটিক ও নানা রত্নভূষা এবং ছোটখাটো শিল্পদ্রব্য সমস্তই বাঁধনের বাইরে পড়লে, কেবল পাষাণ ও ধাতুজ পূজার জন্য যে মূর্তি তাই রইলো শাস্ত্রের মধ্যে বাঁধা কিন্তু এখানেও গোল বাধলো ঠিক ঠিক শাস্ত্রমতো গড়ন কে জানে কেন শিল্পীর হাতে এল না, এদিক ওদিক হতেই থাকলো কিছু কিছু—দেশভেদে কালভেদে শিল্পীর কল্পনাভেদে পূজকের অন্তর্দৃষ্টিভেদে, তখন সম্পূর্ণ ছাড়পত্র দেওয়া হ'ল—

"প্রতিমায়াশ্চ যে দোষা হ্যর্চকস্য তপোবলাৎ।
সর্ব্বত্রেশ্বরচিত্তস্য নাশং যান্তি ক্ষণাৎ কিল॥"

এই ফাঁক পেয়ে দেশের শিল্প হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, বিচিত্র হয়ে উঠলো মন্দিরে মঠে।

সেকালে শাস্ত্রের নিয়মমতো গড়ার যে সব ব্যাঘাত পরে পরে এসেছিল, একালেও যদি শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসনে আমরা শিল্পীদের বাঁধতে চলি তবে ঠিক সেকালের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবেই হবে। অনেকে বলেন ইতিহাসের না হয় পুনরাবৃত্তি হ'লই, তাতে করে যদি তখনকার art ফিরে পাই তো মন্দ কি! এ হবার জো নেই, যা গেছে তা আর ফেরে না; তার নকল হ'তে পারে, ছোট ছেলে ঠাকুরদাদার হুবহু নকল দেখিয়ে চল্লে যেমন হাস্যকর অশোভন ব্যাপার হয় তাই হবে, গোলদীঘির অজন্তা বিহার হবে, গড়ের মাঠের খেলনা তাজমহল হবে। কুঁড়ে ঘর আর বদলালো না কেননা সে এমন সুন্দর করে সৃষ্টি করা যে তখনো যেমন এখনো তেমনি তাতে

www.bengaliebook.com

স্বচ্ছন্দে বাস চল্লো। কিন্তু সেকালের প্রাসাদে একালে আমাদের বাস অসম্ভব, আলো বাতাস বিনা হাঁপিয়ে মারা যাবো পাথর চাপা পড়ে'। পুরাকালে আমাদের যাঁরা শিল্প ও শিল্পরসিক ছিলেন তাঁরা ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না। তাঁরা নিয়ম করতেন নিয়ম ভাঙ্তেন তাঁদের মধ্যে শিল্পী ও শিল্প দুই ছিল, কাযেই তাঁদের ভয় ছিল না। এখন আমাদের সেই সেকালের কোন কিছুতে একটু আধটুও অদল বদল করতে ভয় হয় কেননা নিজের বলে আমাদের কিছুই নেই, সেকালের উপরে আগাছার মতে আমরা ঝুলছি মাত্র, সেকালই আমাদের সর্বস্ব! কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এক আফ্রিকার মূর্তিশিল্প যেমন ছিল তেমনি নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই আছে, সেকালকে সে ছাড়াতে একেবারেই পারেনি।

সেকাল ছেড়ে কোন শিল্প নেই এটা ঠিক, কিন্তু একাল ছেড়েও কোন শিল্প থাকতে পারে না বেঁচে এটা একেবারেই ঠিক। গাছের আগায় নতুন মুকুল গাছের গোড়ায় অতীতের অন্ধকারে তার প্রথম বীজটর সঙ্গে যে ভাবে যুক্ত রয়েছে সেভাবে থাকাই হ'ল ঠিক ভাবে থাকা; আমের নতুন মঞ্জরীর সঙ্গে পুরাতন বীজটার চেহারার সাদৃশ্য মোটেই নেই কিন্তু মঞ্জরীর গর্ভে লুকানো রয়েছে সেই পুরাতন বীজ যার মধ্যে সেই একই ক্রিয়া একই শক্তি ধরা রয়েছে নতুন আবহাওয়াতেও যেটা ঠিকঠাক আম গাছই প্রসব করবে বর্ত্তমানকালে; এই স্বাভাবিক গতি ধরে' চলেছে শিল্প, এর উল্টো পাল্টা হবার জো নেই।

আমাদের দেশের শিল্পমূর্তিকে যে কারণেই হোক এই স্বাভাবিক গতি থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হ'ল এক সময়ে, দেবমূর্তির বাহুল্যের চাপন পেয়ে কিছুদিন গাছ আমাদের মনোমত পথ ধরে' প্রায় কল্পতরু হবার জোগাড় করলে কিন্তু কালের নিয়মে হঠাৎ পশ্চিমের হাওয়া বইলো চাপন পাথর একটুখানি নড়ে' গেল, অমনি গাছ আবার স্বাভাবিক রাস্তা ধরে' মন্দিরের ছাদ তুলসীমঞ্চের গাঁথনি ফাটিয়ে নানাদিকে আলো বাতাস চেয়ে গতিবিধি সুরু করলে, পশ্চিমে ঝুঁকলো কতক ডাল, পূবে বাড়লো কতক ডাল, এইভাবে আলো বাতাসের গতি ধরে' বেড়ে চল্লো গাছ। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সব দেশ এই ভাবে শিল্পের দিকে বেড়ে চলেছে। মঞ্চে বাঁধা গাছ দেখতে মন্দ নয় কিন্তু দিকে বিদিকে নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে' আছে যে

www.bengaliebook.com

বনস্পতি তার মতো সে শক্তিমানও নয় ছায়াশীলও নয় সুন্দরও নয়। আমাদের প্রাচীন শিল্প ও শাস্ত্র সমস্তই বোধিবৃক্ষের কলমের চারার সঙ্গে সোনার গামলায় নীত হয়েছিল দেশ থেকে বিদেশে, কিন্তু সেই সব যবন-দেশের হাওয়া আলো নিয়ে তাদের বেড়ে উঠতে অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, ভিক্ষু শিল্পীদের দ্বারা তাদের সহজগতি ব্যাহত হয়নি; তবেই তো এককালের ভারতীয় উপনিবেশের অভারতীয় অন্তরের মধ্যে চলে গিয়েছিল ভারতীয় ভাব ও রস। ভারত শিল্প যদি কেবলি টবের গাছ হ'ত তো কোন কালে সেটা মরে যেত ঠিক নেই, খালি টব থাকতো আর তাতে সিঁদূর দিয়ে পুজো লাগাতো দেখতেম আজও পুত্র-কামনায় নিষ্ক্রিয়দেশের শিল্পহীন অপুত্রক হতভাগারা।

সেকালের শাস্ত্রমতে ক্রিয়া করে' চল্লে এখনো আমরা সেকালের মতোই সবদিকে বিস্তার লাভ করতে পারি, কিন্তু একালকে বাদ দিয়ে ক্রিয়া করা চলবে না কেননা বর্তমানকাল এবং বর্তমানের উপযোগী অনুপযোগী ক্রিয়া বলে' কতকগুলো পদার্থ রয়েছে যে গুলোকে মেনে চলতেই হবে আমাদের, না হ'লে সেকালটা ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই দেবে না আমাদের এবং তাবৎ শিল্পজগতের অধিবাসীকে। দাশরথি রায়ের পাঁচালী আমরা অনেকেই পড়ি কতক কতক ভালও লাগে কিন্তু পাঁচালীর ছাঁদে যদি কবিতা ঢালাই করার কড়া আইন করে' দেওয়া যায় হঠাৎ তবে বর্তমানের কোন কবি তাতে ঘাড় পাতবে না, কিম্বা আমি যদি আজ বলি আমার ছাঁদেই বাংলার চিত্রকর যারা এসেছে ও আসছে তাদের ছবি লিখতে হবে এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এটা হঠাৎ একটা আইনে পরিণত করে নিই তবে কেউ সেটা মানবে না, উল্টে বরং শিল্পীর স্বাধীনতায় বিষম ব্যাঘাত দেওয়া হ'ল বলে' আমাকে শুদ্ধ তোপে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। আমাদের শিল্পশাস্ত্রকারদের কড়া মাষ্টার এবং পাহারাওলা হিসেবে দেখলে সত্যই আমাদের সেকালের প্রতি অবিচার করা হবে। পূর্বেকার তাঁরা তখনকার কালের যা উপযোগী বা নিয়ম তারই কথা ভেবে গেছেন, একালে আমাদের কি করা না করা, শাস্ত্রের কোন্ আইন মানা না মানা সমস্তই একালের উপরে ছেড়ে দিয়ে গেছেন তাঁরা, শাস্ত্রকে অস্ত্রের মতো এ কালের উপরে নিক্ষেপ করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত করে যান নি!

তখনকার তাঁরা নানা শিল্পের রীতিনীতি ক্রিয়াকলাপ সংগ্রহ করে' গেছেন নানা শাস্ত্রের আকারে—

"স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ লোকহিতার্থ সংগ্রহেণ বৈ,
তৎসারন্তু বশিষ্টাদৈরস্মাভিবৃদ্ধিহেতবে॥"
(শুক্রনীতিসার)।

শুক্রাচার্য্য কেন যে নানা শিল্প নানা সামাজিক রীতিনীতি সংগ্রহ করে' শুক্রনীতিসার বলে' পুঁথিখানা লিখলেন তা নিজেই বলে গেলেন—

"অল্পায়ুর্ভূভৃদাদর্থং সঙ্ক্ষিপ্তং তর্কবিস্তৃতম্
ক্রিয়ৈকদেশবোধিনি শাস্ত্রাণ্যন্যানি সন্তি হি।
সৰ্ব্বোপজীবকম্ লোকস্থিতিকৃন্নীতিশাস্ত্রকম্
ধৰ্ম্মার্থকামমূলং হি স্মৃতং মোক্ষপ্রদং যতঃ॥"

মুক্তি দেবার জন্য শাস্ত্র, অল্পের মধ্যে অল্পায়ুধকে অনেকখানি বোঝাবার জন্য শাস্ত্র, রক্ষার জন্য শাস্ত্র,—হননের জন্য নয়!

পৃথিবীর সেকালের ভিত্তির উপরে একালের প্রতিষ্ঠা হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা, সেকাল একালের ঘাড় চেপে পড়লো—বাড়ীর ভিত উঠে এল ছাতের উপরে, এ বড় বিষম প্রতিষ্ঠা! সেকালের বস্তুশিল্প হিসেবেও এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যা তার মাল মসলার জন্য সম্পূর্ণভাবে সেকালের উপর নির্ভর করে' চলতে বাধ্য,— নতুন প্রথায় কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব চর্চা চল্লো। শিল্পও তেমনি সেকাল, একাল ও ভবিষ্যকালের যোগাযোগে বর্ধিত হয়ে চল্লো, কোনো এককালের ক্রিয়া কলাপের মধ্যে তাকে ধরে' রাখবার উপায় রইলো না। প্রাচীন ভারতের শিল্প শুধু নয়—তখনকার আচার ব্যবহার সমুদয় কি ছিল কেমন ছিল তা প্রাচীন পুঁথির মধ্যে ধরা রইলো বলেই শাস্ত্র পুরাণ ইত্যাদি পড়া। কিন্তু পড়ে' জানা হ'ল একরকম শিল্পকে না জানাই। অজন্তা চিত্র কেমন এবং তার বর্ণ দেবার, লাইন টানার মাপজোখের হিসেবের ফর্দ পড়ে' গেলে ছবিটা দেখার কাজ হয় না। প্রাচীন ভারতের শিল্পের যে দিকটা প্রত্যক্ষ হচ্ছে বর্তমানে—মন্দির মঠ মূর্তি ছবি কাপড়-চোপড় তৈজসপত্র ইত্যাদিতে তা থেকেই বেশী শিক্ষা পায় শিল্পী। এ

www.bengaliebook.com

হিসেবে একটা প্রাচীন মূর্তির ফটোগ্রাফও বেশী কাযের হ'ল শিল্পকে বোঝাতে, আসল মূর্তিটা চোখে দেখলে তো কথাই নেই। ব্রজমণ্ডলে কি কি আছে ও ছিল, সেটা ব্রজপরিক্রমা পড়ে' গেলেও ব্রজমণ্ডল দেখা হ'ল না, জানা হ'ল না—যতক্ষণ না তার ফটো দেখছি বা সেখানে তীর্থ দর্শনে যাচ্ছি। না দেখা ব্রজভূমি যেটা সম্পূর্ণ কল্পনার জিনিস তার মূল্য বড় কম নয় art এর দিক দিয়ে। কিন্তু শাস্ত্রমতো ব্রজভূমির একটা বর্ণনা বা symbol দু'খানা হরিচরণ যদি হয়, তবে সেটা দেখে কি বুঝবো ব্রজের শোভা? নিছক প্রতীক নিয়ে তন্ত্রসাধন চলে,—শিল্প সাধনা তার চেয়ে বেশী কিছু চায়। সাধকের হিতার্থে শাস্ত্রমতো রূপ কল্পনা হ'ল অরূপের, যখন তখন একখণ্ড শিলা একটা যন্ত্র হ'লেই কায চলে গেল। কিন্তু শিল্প এমন নিছক প্রতীকমাত্র হয়ে বসে থাকতে পারে না। অনেকখানি চোখের দেখার মধ্যে না ধরলে দেবতাকে দেখানই সম্ভব হয় না। অথচ দেবতাকে মনুষ্যত্বের কিছু বাহুল্য না দিলেও চলে না। এই কারণে নানা মূর্তির নানা মুদ্রা হাত মাথা ইত্যাদির প্রাচুর্য দরকার হ'য়ে পড়লো। শিল্পশাস্ত্র নিখুঁত করে' তার হিসেব দিলেন। কিন্তু এতেও পাথর দেবতা হয়ে না উঠে মনুষ্যেতর কিছু হবার ভয় গেল না,——তখন শিল্পীর শিল্পজ্ঞান যেটা তার নিজস্ব, তার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় রইলো না।

এই যে শিল্পজ্ঞান, এ কোথা থেকে আসে শিল্পীর মধ্যে তা কে জানে? তবে শুধু শাস্ত্রকে মেনে চলে' কিম্বা শাস্ত্র পড়ে' সেটা আসে না এটা ঠিক। এইখানে শিল্পীর প্রতিভাকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় রইলো না—কেননা দেখা গেল শাস্ত্রমতো মান পরিমাণ নিখুঁত করেও—"সর্ব্বাঙ্গৈঃ সর্ব্বরম্যোহি কশ্চিলক্ষে প্রজায়তে"–লাখে একটা মেলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। অতএব ধরে' নেওয়া গেল "শাস্ত্রমানেন যো রম্যঃ স রম্যো নান্য এব হি"। এতে করে' শাস্ত্রের মান বাড়লো বটে, কিন্তু শিল্পক্রিয়া খর্ব হ'ল। তাই এক সময়ে একদল বল্লে—"ত রম্যং লগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ।" অমনি শাস্ত্রের দিক দিয়ে এর উত্তর এল—"শাস্ত্রমানবিহীনং যৎ সরম্যং তৎ বিপশ্চিতাম্।।" পণ্ডিতের মান বজায় করে শাস্ত্রকার ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু এতে করে' আমাদের দেশের শিল্পীরা শিল্পক্রিয়াতে প্রায় বারো আনা যে অপণ্ডিত থেকে যাবে, সেকথা শাস্ত্রকার না ভাবলেও তখনকার শিল্পীরা যে ভাবেনি তা

নয়। প্রতিমা-শিল্প সেই এক ছাঁচ ধরে' চল্লো। কিন্তু অন্যান্য শিল্প সমস্ত নতুন নতুন উদ্ভাবনার পথ ধরে' নানা কালের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্য ধরে' অফুরন্ত সৌন্দর্য-ধারা বইয়ে চল্লো দেশে।

চিত্রকলার ইতিহাস এদেশে যেমন বিচিত্র তেমন মূর্তি গড়ার ইতিহাস নয়। বাস্তুবিদ্যা তাও নানা নতুন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলে' অব্যাহত ধারায় বইলো নতুন থেকে নতুনতর সমস্তকে ধরে'। কিন্তু ঠাকুরঘরের মধ্যে সেই পুরোনো দেবতা বারবার পুনরাবৃত্ত হ'তে হ'তে দেবতার একটা মুখোসমাত্রে পর্যবসিত হ'তে চল্লো। শাস্ত্রমতো ক্রিয়া করে' দেবমূর্তি গড়া প্রায় উঠেই গেছে এখন। ধ্যানগুলো বাহনগুলো কার কি এই নিয়েই কায চলেছে ভাস্করপাড়ায় কতদিন থেকে যে তার ঠিকানা নেই। দেবশিল্প বলে' যদি কোন সামগ্রী হয়ে থাকে এককালে দেশে তো সে বহুযুগ আগে। তারপর থেকে সে শিল্পের অধঃপতনই হয়েছে বেশী বাঁধাবাঁধির ফলে। ঘরে যে শিল্প এই বাঁধনে পড়ে' মরতে বসলো, বাইরে গিয়ে সেই শিল্প বাঁধন শিথিল পেয়ে দিব্বি বেঁচে গেল দেখতে পাই। নতুন নতুন প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষার স্বাধীনতা শিল্পীর থাকলো তবেই শিল্পক্রিয়া চল্লো, না হ'লে শিল্পের দুর্দশার সূত্রপাত হ'ল—শাস্ত্রের দ্বারায় সে বিপদ ঠেকানো গেল না।

শিল্পশাস্ত্রে আমাদের দেশে এখানে ওখানে যা ছড়ানো রয়েছে তা থেকে সব শিল্পের তালিকা এবং বাস্তু মন্দির মঠ নির্মাণ, নগর-স্থাপন, বিচার-পদ্ধতি, নাগরিকের চাল-চোলের সম্বন্ধে নানা কথা এবং এই রকম নানা ব্যাপারের মধ্যে পূজার অঙ্গ হিসেবে প্রতিমা-নির্মাণ, তার বাহন ব্যবস্থা ইত্যাদিরই খুঁটিনাটি মাপজোখের কথা পাই। চিত্র বিষয়ে দু'একখানা পুঁথিও পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব পুঁথিতে কোন কোন শিল্পকে অঙ্গবিদ্যা হিসেবে দেখে আংশিকভাবে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। Artএর পাঠ্য পুস্তক হিসেবে এগুলো বেশী কাজের হবে না, এই আমার বিশ্বাস। চিত্র যদি শিখতে চাই তবে চিত্রশালাতে যেতেই হবে আমাদের। প্রাচীন চিত্রে কেমন করে' রেখাপাত, কেমন করে' বর্ণপ্রলেপ, কেমন করে' নানা অলঙ্কার বর্ধনা ইত্যাদি দেওয়া হ'ত—তার প্রক্রিয়া ছবি দেখেই আমাদের শিখে নিতে হবে। কোনো শিল্পশাস্ত্রে এ সমস্ত প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে ধরা নেই। কেমন কাগজে ছবি খেলা হ'ত, কি কি বর্ণ সংযোগ হ'ত, কোথায় কোথায় কেমন

ধারা পালিস দেওয়া হ'ত ছবিতে, কত রকম তুলির টান, কত রকম রংএর খেলা, কত বিচিত্র ভাবভঙ্গি রেখার ও লেখার—এ সমস্ত এক একখানি ছবি দেখে' শেখা ছাড়া উপায় নেই। শাস্ত্রে কুলোয় না এত বিচিত্র প্রক্রিয়ার রহস্য সমস্ত হয়েছে ছবির মধ্যে ধরা মোগল বাদসাদের আমল পর্যন্ত, তারপর এসেছে ইয়োরোপ জাপান চীন থেকে নতুন নতুন প্রক্রিয়ায় রচনা করা ছবি। এর চেয়ে প্রকাণ্ড পরিষ্কার সুন্দর শিল্প ব্যাখ্যানের পুঁথি যার পাতায় পাতায় ছবি পাতায় পাতায় উপদেশ এমন আর কি হতে পারে! এই পুথির একখানি পাতা সংগ্রহ করে' নিয়ে চলেছে বিদেশের তারা কত অর্থব্যয়ে নিজেদের শিল্পজ্ঞান জাগিয়ে তুলতে। আর আমরা টাকার অভাবে একটা ছোটখাটো চিত্রশালাও রাখতে পারছিনে দেশে। পাথরগুলো মন্দিরগুলো ভেঙে নেবার উপায় নেই— না হ'লে ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন দেখে আর আমাদের কিছু শেখার উপায় বিদেশীরা রাখতো না।

ভাবতে পারো original ছবির মূর্তি নাই হ'ল, reproduction দেখেই আমরা শিল্প কাযে পাকা হ'য়ে উঠবো, পুঁথি পড়ে' পাকা হয়ে যাবো,—এ মতের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার নেই। কেননা আফ্রিকার অধিবাসী যারা, কোথায় তাদের art gallery কোথায় বা তাদের শিল্পশাস্ত্র। ছবির দিক দিয়ে মূর্তির দিক দিয়ে দেশটা উজাড় হ'লে ক্ষতি এমন কিছু নয়। শুধু মরুভূমিকে চষে আমাদেরই আবার সবুজ করে' তুলতে হবে, পূর্বপুরুষদের সঞ্চয় ও ঐশ্বর্য অন্যে ভোগ করে' বড় হ'তে থাকবে? দেশের স্থাপত্য রক্ষার আইন তাড়াতাড়ি না হ'লেও ও-জিনিষ সহজে দেশ থেকে নড়তো না, সময় লাগতো। কিন্তু এই সব ছোটখাটো শিল্প সামগ্রী,—চমৎকার কাঁথা, চমৎকার সাড়ী, মন-ভোলানো খেলনা, চোখ-ঠিকরানো গহনাগাটি ঘটিবাটি অস্ত্রশস্ত্র এবং রামধনুকের প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রশালা উড়ে' চলেছে বিদেশে। যদি এখন থেকে দেশে এদের রাখার চেষ্টা আইনের দ্বারা হ'ক পয়সার দ্বারা হ'ক না করা হয় তবে শীঘ্রই শিল্পক্রিয়া আমাদের মধ্যে বন্ধ হ'য়ে যাবে। থাকবে শুধু বিদেশ যেটুকু ভিক্ষা দেবে,—বিনা রোজগারে বিনা খাটুনির পাওনাটা।

শিল্পী হ'ল ক্রিয়াশীল, শিল্প চাইতো ক্রিয়া করা চাই। তার প্রথম ক্রিয়া দেশেরটাকে দেশে ধরে' রাখা, দ্বিতীয় ক্রিয়া বিদেশেরটাকে নিজের করে'

www.bengaliebook.com

নেওয়া, তৃতীয় ক্রিয়া শিল্প সম্বন্ধে বক্‌তৃতা নয়,—করে' চলা ছবি মূর্তি নাচ গান অভিনয় এমনি নানা ক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা একেবারেই করা নয় সেইটেই আগে সুরু করতে হ'ল—বক্‌তৃতা দিতে হ'ল। যেগুলো দরকারী প্রথম শিক্ষার পক্ষে—ছবির মূর্তির একটা যথাসম্ভব সংগ্রহ, তা হ'ল না এ পর্যন্‌ত। ছবি সম্বন্ধে বই যা শেখাবে, বক্‌তৃতা যা বোঝাবে, তার চেয়ে ঢের পরিষ্কার ঢের সহজ করে' বোঝাবে সত্যিকার ছবি—এটা কবে বোঝাতে পারবো লোককে তা জানিনে।

আমাদের ছবি মূর্তি ইত্যাদির একটা মস্ত সংগ্রহ চৌরঙ্গীতে রয়েছে। কিন্তু সেটার নাম আমরা দিয়েছি যাদুঘর। কোন্ দিন সেটা ফুঁয়ে উড়ে যাবে পূব থেকে পশ্চিমে তার ঠিক নেই। তখন আমাদের ঘর শূন্য। এই ভেবেই ছবি মূর্তি সাধ্যাতীত ব্যয় করেও ধরে রাখলেম, দুচার জন শিল্পী তা দেখে শিখলে, কাযে এল দুচার দিন, তারপর এল দুঃসময়, চল্লো সব উড়ে বিদেশে—রূপো সোনার কাঠির স্পর্শে। এ আমি দেখতে পাচ্ছি—রইলো না, দেশের শিল্প দেশে রইলো না। বিদেশী এলো, চোখে ধূলো দিয়ে নিয়ে গেল রাতারাতি ভাণ্ডার লুঠ করে'। সকালে দেখি আমাদের ঘর শূন্য ভাণ্ডার খালি শুধু শিল্পী বসে' একটা ভূয়ো কৌলীন্য মর্যাদা নিয়ে অথর্ব। আমরা বসে' রয়েছি বাইরের দিকে চেয়ে! বাইরেটাও যে কত সুন্দর তার নীল আকাশ সবুজ বন আলো-আঁধার পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ ফুল-ফল নিয়ে, তাও বুঝতে পারছিনে। মন ভাবছে না, হাত পা চলছে না, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় হাত পেতেই বসে আছি। হঠাৎ কোন একটা সুযোগ যদি এসে পড়ে এই আশায়। এই হ'ল জাতীয় জীবনের সব দিক দিয়ে আতি ভয়ঙ্কর পক্ষাঘাতের প্রথম লক্ষণ—বাইরেটা রইলো ঠিক কিন্তু ভিতরটা নিঃসার শিল্পের দিক দিয়ে। এই মানসিক এবং বাইরেও হাত পায়ের পক্ষাঘাত নিবারণ কেবল শিল্পক্রিয়ার দ্বারা হ'তে পারে, বহুকাল ধরে' হ'য়েও এসেছে। রাজ্য গেল রাজা গেল এমন কি ধর্মও অনেকখানি গেল যখন, তখন বাঁচবার রাস্তা হ'ল মানুষের পক্ষে শিল্প। 'আপৎকালে শিল্পের উপর নির্ভর এটা শাস্ত্রের কথা। কেননা শাস্ত্রকাররা জানতেন ক্রিয়াশীলতা এবং ক্রীড়াশীলতা দুটোই শিল্পের এবং জীবনেরও লক্ষণ তাই ক্রিয়া-ভেদে তাঁরা কলা-ভেদ নির্ণয় করে গেলেন। "পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াভিহি কলাভেদস্তু জায়তে"।– (শুক্রনীতিসার)

www.bengaliebook.com

শিল্পে অধিকার

শিল্প লাভের পক্ষে আয়োজন কতটা দরকার, কেমন আয়োজনই বা দরকার, তার একটা আন্দাজ করে দেখা যাক্। রোমের তুলনায় গ্রীস এতটুকু; শিল্পের দিক দিয়েও গ্রীস রোমের চেয়ে খুব যে বড় করে আয়োজন করেছিল তাও নয়; শুধু গ্রীসের যতটুকু আয়োজন, সবটাই প্রায় শিল্পলাভের অনুকূল, আর রোমক শিল্পের জন্য যে প্রকাণ্ড আয়োজনটা করা হয়েছিল তা অনেকটা আজকালের আমাদের আয়োজনের মতো—বিরাটভাবে শিল্পলাভের প্রতিকূল। গ্রীস রোমের কথা ছেড়েই দিই, আজকালের ইউরোপও কি আয়োজন করে বসেছে তাও দেখার দরকার নেই, আমাদের দেশেই যে এতবড় শিল্প এককালে ছিল, এখনও তার কিছু কিছু চর্চা অবশিষ্ট আছে, সেখানে কি আয়োজন নিয়ে কাজ চলেছে দেখবো। এ দেশে প্রায় সব তীর্থস্থানগুলোর লাগাও রকম রকম কারিগরের এক-একটা পাড়া আছে। এই সহরের মধ্যেই এখনো তেমন সব পাড়া খুঁজলে পাওয়া যায়—কাঁসারিপাড়া, পোটোতলা, কুমরটুলি, বাক্সপটি ইত্যাদি। এই সব জায়গায় শিল্পী, কারিগর দুরকমেরই লোক আছে, যারা ওস্তাদ এক-এক বিষয়ে। ওস্তাদরা ঘরে বসে কাজ করছে, চেলারা যাচ্ছে সেখানে কাজ শিখতে—ঐ সব পাড়ার ছোট বড় নানা ছেলে! সেখানে ক্লাসরুম, টেবেল, চেয়ার, লাইব্রেরি, লেকচার হল কিছুই নেই, অথচ দেখা যায় সেখান থেকে পাকা-পাকা কারিগর বেরিয়ে আসছে—পুরুষানুক্রমে আজ পর্যন্ত! ছোটবেলা থেকে ছেলেগুলো সেখানে দেখেছি কেউ পাথর, কেউ রংতুলি, কেউ বাটালি, কেউ হাতুড়ি এমনি সব জিনিষ নিয়ে কেমন নিজেদের অজ্ঞাতসারে খেলতে খেলতে artist, artisan কারিগর শিল্পী হয়ে উঠেছে যেন মন্ত্রবলে। খেলতে খেলতে শিল্পের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে তার সঙ্গে পরিণয়—এই তো ঠিক্! পড়তে-পড়তে খাটতে-খাটতে ভাবতে-ভাবতে যেটা হয় সেটা নীরস জ্ঞান,—শুধু শিল্পের ইতিহাস, তত্ত্ব, প্রবন্ধ কিম্বা পোষ্টার ও পোষ্টেজ দেবার কাজে আসে। এই যে এক ভাবের শিল্পজ্ঞান একে লাভ করতে হলে নিশ্চয়ই তোড়জোড় ঢের দরকার। লেকচার হল থেকে লেকচারের ম্যাজিক লণ্ঠনটা পর্যন্ত না হলে চলবে না সেখানে। কিন্তু শিল্পজ্ঞান তো শুধু এই বহিরঙ্গীন চর্চা ও প্রয়োগ বিদ্যার দখল নয়; রস,

রসের স্ফূর্তি—এসবের আয়োজন যে স্বতন্ত্র। 'অনন্যপরতন্ত্রা' শিল্প পাখীপড়ানর খাঁচা, কসরতের আখড়ার দিকেও তো সে এগোয় না, রসপরতন্ত্রতাই হলো তাকে আকর্ষণের প্রধান আয়োজন আর একমাত্র আয়োজন। শুধু এই নয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানুষ, মনও তাদের রকম-রকম। রসও বিচিত্র ধরণের। আয়োজনও হলো প্রত্যেকের জন্যে স্বতন্ত্র প্রকারের। একজনের individuality, personality যে আয়োজন করলে, আর একজন সেই আয়োজনের অনুকরণে চল্লেই যে অন্যপরতন্ত্রা এসে তাকে ধরা দেবেন, তা নয়; তাঁর নিজের জন্যে তাঁকে স্বতন্ত্র প্রকারের আয়োজন করতে হবে। জাপানের শিল্প আয়োজন, আমাদের শিল্প আয়োজন, ইউরোপের শিল্প আয়োজন সবগুলো দিয়ে খিঁচুড়ি রাঁধলে এ রকম রস সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু সেটাতে শিল্পরসের আশা করাই ভুল। প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মনের পাত্রে শিল্পরসকে ধরবার যে আয়োজন করে নিলে সেইটেই হল ঠিক আয়োজন, তাতেই ঠিক জিনিষটি পাওয়া যায়; এ ছাড়া অনেকের জন্য একই প্রকারের বিরাট আয়োজন করে পাওয়া যায় সুকৌশলে প্রস্তুত করা সামগ্রী বা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালাই-করা কোনো একটা আসল জিনিষের নকল মাত্র। Artistএর অন্তর্নিহিত অপরিমিতি (বা infinity) Artist এর স্বতন্ত্রতা (individuality)—এই সমস্তর নির্মিতি নিয়ে যেটি এলো সেইটেই Art, অন্যের নির্মিতির ছাপ, এমন কি বিধাতারও নির্মিতির ছাঁচে ঢালাই হয়ে যা বার হলো তা আসলের নকল বই আর তো কিছুই হলো না। ভাল, মন্দ, অদ্ভুত বা অত্যাশ্চর্য এক রসের সৃষ্টি তো সেটি হলো না। এইটুকুই যথার্থ পার্থক্য Artএ ও না-Artএ। কিন্তু এ যে ভয়ানক পার্থক্য—স্বর্গের সঙ্গে রসাতলের, আলোর সঙ্গে না-আলোর চেয়ে বেশি পার্থক্য। স্বর্গের ঐশ্বর্য আছে, রসাতলের গাম্ভীর্য আছে, রহস্য আছে, আলোর তেজ, অন্ধকারের স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু Artএ ও না-Artএ তফাৎ হচ্ছে—একটায় সব রস সব প্রাণ রয়েছে, আর একটায় কিছুই নেই!

Art এর একটা লক্ষণ আড়ম্বরশূন্যতা—Simplicity। অনাবশ্যক রং-তুলি, কলকারখানা, দোয়াত-কলম, বাজনা-বাদ্যি সে মোটেই সয় না। এক তুলি, এক কাগজ, একটু জল, একটি কাজললতা—এই আয়োজন করেই পূবের বড় বড় চিত্রকর অমর হয়ে গেলেন। কবীর এর চেয়ে কমে চলে গেলেন।

কাগজ আর কলম, কিম্বা তাও নয়—একতারা কি বাঁশী, অথবা তাও যাক্— শুধু গলার সুর। সহজকে ধরার সহজ ফাঁদ, এই ফাঁদ নিয়েই সবাই তাঁরা চল্লেন—কেউ সোণার মৃগ, কেউ সোণার পদ্মের সন্ধানে। এ যেন রূপকথার রাজপুত্রের যাত্রা—স্বপ্নপুরীর রাজকুমারীর দিকে; সাজ নেই, সরঞ্জাম নেই, সাথী সহচর কেউ নেই। একা গিয়ে দাঁড়ালেম অপরিমিত রস-সাগরের ধারে, মনের পাল সুবাতাসে ভরে উঠলো তো ঠিকানা পেয়ে গেলেম! রূপকথার সব রাজপুত্রের ইতিহাস চর্চা কর তো দেখবে—কেউ তাজি ঘোড়ায় চড়ে সন্ধানে বার হয়নি, এই যেমন-তেমন একটা ঘোড়া হলেই তারা খুসি। এও তো এক আশ্চর্য ব্যাপার শিল্পের—এই যেমন-তেমনের উপরে সওয়ার হয়ে যেমনটি জগতে নেই, তাই গিয়ে আবিষ্কার করা! মাটির ঢেলা, পাথরের টুকরো, সিঁদূর, কাজল—এরাই হয়ে উঠ্‌লো অসীম রস আর রহস্যের আধার!

রসের তৃষ্ণা শিল্পের ইচ্ছা যার জাগবে, সে তো কোনো আয়োজনের অপেক্ষা করবে না;—যেমন করে হোক সে নিজের উপায় নিজে করে নেবে; এ ছাড়া অন্য কথা নেই। একদিন কবীর দেখলেন একটা লোক কেবলই নদী থেকে জল আমদানি করছে সহরের মধ্যে চামড়ার থলি ভরে-ভরে। সে লোকটার ভয় হয়েছে নদী কোন দিক্ দিয়ে শুকিয়ে যাবে! মস্ত বড় এই পৃথিবী নীরস হয়ে উঠেছে, তাই সে রস বেলাবার মতলব করছে। কবীর লোকটাকে কাছে ডেকে উপদেশ দিলেন—

"পানি পিয়াওত ক্যা ফিরো
ঘর ঘর সায়র বারি।
তৃষ্ণাবংত যো হোয়গা
পীবৈগা ঝকমারি।"

এ আয়োজন কেন, ঘরে ঘরে যখন রসের সাগর রয়েছে? তেষ্টা জাগুক, ওর আপনিই সেটা মেটাবার উপায় করে নেবে দায়ে ঠেকে।

মূলকথা হচ্ছে রসের তৃষ্ণা; শিল্পের ইচ্ছা হলো কি না, উপযুক্ত আয়োজন হলো কিনা—শিল্পের জন্যে বা রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে—এটা

একেবারেই ভাববার বিষয় নয়। বিশ্ব জুড়ে তৃষ্ণা মেটাবার শিল্পকার্য, তার প্রয়োগবিদ্যা, তার খুঁটিনাটি উপদেশ আইন-কানুন সমস্তই এমন অপর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে যে কোন মানুষের সাধ্য নেই তেমন আয়োজন করে তোলে। শিল্পকে, রসকে পাওয়ার জন্যে আয়োজনের এতটুকু অভাব যে আছে তা খুব একেবারে আদিম অবস্থাতে—আর সব দিক দিয়ে অসহায় অবস্থাতেও—মানুষ বলেনি; উল্টে বরং প্রয়োজন হলে আয়োজনের অভাব ঘটে না কোনদিন—এইটেই তারা, হরিণের শিং, মাছের কাঁটার বাটালি, একটুখানি পাথরের ছুরি, এক টুকরো গেরি মাটি, এই সব দিয়ে নানা কারুকার্য নানা শিল্প রচনা করে দিয়ে সপ্রমাণ করে গেছে। এ না হলে হবে না, ও না হলে চলে না—শিল্পের দিক দিয়ে এ কথা বলে শুধু সে, যার শিল্প না হলেও জীবনটা চলছে কোন রকমে। আদিম শিল্পীর সামনে শুধু তো বিশ্বজোড়া এই রস-ভাণ্ডার খোলা ছিল, চেয়ারও ছিল না, টেবিলও ছিল না, ডিগ্রীও নয়, ডিপ্লোমাও নয়, এমন কি তার জাতীয় শিল্পের গ্যালারী পর্যন্ত নয়—কি উপায়ে তবে সে শিল্পকে অধিকার করলে? আমি অঙ্কন করছি, আমার নাতিটি পাশের ঘরে বসে অঙ্ক কসছে—এইভাবে চলছে, হঠাৎ একদিন নাতি এসে বল্লেন—দাদামশায়, বেরাল না থাকলে তোমার মুস্কিল হতো, বেরালের রোঁয়ার তুলি হতো না তোমার ছবিও হতো না। তর্ক সুরু হলো। ঘোড়ার লেজ কেটে তুলি হতো। ঘোড়া যদি না থাকতো? পাখীর পালক ছিঁড়ে নিতেম। পাখী না পেলে? নিজের মাথার চুল ছিঁড়তেম। টাক পড়ে গেছে? নাতির গালে আঙ্গুলের ডগার খোঁচা দিয়ে বল্লেম—দশটা আঙ্গুলের এই একটা নিয়ে। নাতি রাবণ বধের উপক্রম করেন দেখে বল্লেম—তা হয় না, দেখছো এই ভোঁতা তুলি! বলে আমিও ঘুঁসি ওঠালেম। দাদামশায়ের আয়োজন দেখে নাতি হার মেনে সরে পড়লেন।

কাজের ঘানিতে জোতা রয়েছি, ঘানি পিষছি, কিন্তু স্নেহরস যা বার করছি, এক ফোঁটাও তো আমার কাছে আসছে না। রসালাপের অবসরটুকু নেই, রসের তৃষ্ণা মেটানো, শিল্পলাভ—এ সব তো পরের কথা।

কাজের জগতের মোটা-মোটা লোহার শিক দেওয়া ভয়ঙ্কর অথচ সত্যিকার এই বেড়াজাল শুধু আমাদের ধরে চাপন দিচ্ছে না, সব মানুষই এতে বাঁধা। আখের ছড় বলে এর শিকগুলোতে ভুল করে দাঁত বসানো তো

চলে না। কাজের মধ্যে যদি ধরা না দিই তো সংসার চলে না, আবার কাজেই গা ঢেলে দি তো রস পাওয়া থাকে দূরে। এর উপায় কিছু আছে?

রস পেতে চাই,—তবে কি রসের মধ্যে নিজেকে, নিজের সঙ্গে কাজকর্ম সংসারটা ভাসিয়ে দেবো? ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা মন, তবে কি ফুলের বাগিচায় গিয়ে বাস করবো?—ধানের ক্ষেত, ধনের চিন্তা সব ছেড়ে? কবীর বল্লেন, পাগল নাকি!

"বাগো না জায়ে নাজা,
তেরে কায়া মে গুলজার॥"

'ও বাগে যেওনা বন্ধু, পুষ্পবন তোমার অন্তরেই বিদ্যমান!' কায়ার মধ্যে প্রাণ যে ধরা রয়েছে, বাইরে থাক্ না কাজের জঞ্জাল। খাঁচার মধ্যে থেকেই পাখী কি গান গায় না? তাকে কি ফুলের বনে যেতে হয় গান গাইতে? যে ওস্তাদ সে ঘানি চলার তালে তালেই গায়, নাই হলো আর কোনো সংগত-সুযোগ।

"মৃগা পাশ কস্তুরী বাস
আপন খোজৈ খোজৈ ঘাস।"

কিন্তু কস্তুরীর ব্যবসা করতে গিয়ে দানা পানির উপায় ছাড়লে জীবনটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন কি করা যাবে? কোথায় থাকবে তখন রস, কোথায় থাকবে তখন শিল্প? রস না থাক, জীবনটা তো রয়েছে অনেকখানি। আগে জীবন—সব রসের মূল যেটা, সেটা তো রক্ষা করা চাই। এর উপর আর কথা চলে না। কিন্তু এই কালে সহরের বুকে দাঁড়িয়ে ঐ ফুটপাতের পাথরের চাপনে বাঁধা পড়ে শিরীষ গাছ, সেও যদি ফুল ফোটাতে পারে, তো মানুষ পারবে না তেমন করে ফুটতে—এও কি কখনো সম্ভব? চেরি ফুল যখন ফোটে তখন সারা জাপানের লোকের মন—সেও ফুটে উঠে, ছুটি নিয়ে ছুট্ দেয় সেদিকে সব কাজ ফেলে। কই তাতে তো কেউ তাদের অকেজো বলতে সাহস করছে না? পেটও তো তাদের যথেষ্ট ভরছে। আমাদেরও তো আগে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, সে জন্যে সেকালে কাজেরও কামাই হয়নি, জীবনেরও কমতি ছিল না,—শিল্পেরও নয়, শিল্পীরও নয়, রসেরও

নয়, রসিকেরও নয়। “অলসস্য কুতো শিল্পং?” নিশ্চয় আমাদের এখনকার জীবন যাত্রায় কোথাও একটা কল বিগড়েছে যাতে করে জীবনটা বিশ্রী রকম খুঁড়িয়ে চলছে, শরীর খেটে মরছে কিন্তু মনটা পড়ে আছে অবশ, অলস! ম্যালেরিয়ার মশার সঙ্গে লক্ষ্মী পেঁচার ঝাঁক এসে যদি আমাদের ঘরে বাসা বাঁধতো, তবে শিল্পী হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হতো কি না এ প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমার শোভা পায় না—পেঁচার পালকের গদীর উপর বসে। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য তো মানতে হয়। শিল্পী ‘যা ছুঁয়ে দেয় তাই সোণা হয়ে যায়’ অথচ সোণা দিয়ে বেচারা ছেলে মেয়ের গা কোনদিন ভরে দিতে পারলে না! তাজের পাথর যারা পালিস করলে—আয়নার মতো ঝকঝকে, দুধের মতো সাদা করে, মুক্তোর চেয়েও লাবণ্য দিয়ে তার গম্বুজটা গড়ে গেল যারা, দেওয়ালের গায়ে অমর দেশের পারিজাত লতা চড়িয়ে দিয়ে গেল যে নিপুণ সব মালি, তারা রোজ-মজুরী কত পেয়েছিল? তা ছাড়া পুরো খেতে পায়নি বলে তাদের শিল্প কোথায় ম্লান হয়েছিল বল্‌তে পারো? দশ-এগার বছর লেগেছিলো তাজটা শেষ করতে; সবচেয়ে বেশী মাইনা যা দেওয়া হয়েছিল ওস্তাদদের, তা মাসে হাজার টাকার বেশী নয়; এই থেকে বাদসাহি আমলের উপরওয়ালাদের পেট ভরিয়ে কারিগরেরা রোজ পেয়েছিল কত, কষে দেখলেই ধরা পড়বে শিল্পীর সঙ্গে ও শিল্পের সঙ্গে সম্পদের যোগাযোগটা। শিল্পী হওয়া না হওয়ার সঙ্গে ম্যালেরিয়া হওয়ার বেশী যোগ, চাকরী হওয়া না হওয়ার চেয়ে—আমি এইটেই দেখতে পাচ্ছি। জীবন রক্ষা করতে যেটা দরকার, জীবন সেটা ঘাড় ধরে আমাদের করিয়ে নেবেই, ছাড়বে না,—নিদারুণ তার পেষণ-পীড়ন। অতএব আফিস আদালত ছেড়ে সকলে রূপ ও রসের রাজত্বের দিকে সন্ন্যাস নিয়ে চট্‌পট্‌ বেরিয়ে পড়ার কুপরামর্শ তো কাউকে দেওয়া চলে না; অথচ দেখি এই কলে-পড়া জীবন যাত্রার মধ্যে একটুখানি রস একটু শিল্প সৌন্দর্য না ঢোকাতে পারলেও তো বাঁচিনে। শুধু যে প্রাণ যায় তা নয়, শিল্পী বলে ভারতবাসীর যে মান ছিল তাও যায়। শিল্পী নীচ জাত হলেও সে শিল্পের পাণিগ্রহণ করেছে, সেই কারণে সকল সময়ে শিল্পী বিশুদ্ধ এই কথা ভারতবর্ষের ঋষিরা বলে গেছেন; কিন্তু যেখানে এই শিল্পী আজকালের কলের মানুষ আমাদের পরশ পাচ্ছে সেইখানেই সে মলিন হচ্ছে—ফুল যেমন চটকে যায় বেরসিকের হাতে পড়ে। এর উপায় কি?

www.bengaliebook.com

রসের সঙ্গে কাজের বন্দীর পরিচয় পরিণয় ঘটাবার কি আশা নেই? কেন থাকবে না? কাজকর্ম আমাদেরই বেঁধে পীড়া দিচ্ছে এবং কবি, শিল্পী, রসিক—এঁরা সব এই কাজের জগতের বাইরে একটা কোন নতুন জগতে এসে বিচরণ করছেন তা তো নয়? কিম্বা জীবন যাত্রার আখ্‌মাড়া কলটার কাছ্ থেকে চট্‌পট্ পালাবার উৎসাহ তো কবি শিল্পী এঁদের কারু বড় একটা দেখা যাচ্ছে না! তাঁরা তবে কি করে বেঁচে রয়েছেন? কবীরের কাজ ছিল সারাদিন তাঁত-বোনা, আফিসে বসে কলম পেশার কিম্বা পাঠশালে বসে পড়া মুখস্তর সঙ্গে তার কমই তফাৎ। তাঁত-বোনা মাকু-ঠেলার কাজ ছাড়লে কবীরের পেট চলা দায় হতো। আমাদের সংসার চালাতে হচ্ছে কলম ঠেলে। রসের সম্পর্ক মাকু-ঠেলার সঙ্গে যত, কলম-ঠেলার সঙ্গেও তত, শুধু কবীর স্বাধীন জীবিকার দ্বারা অর্জন করতেন টাকা, ইচ্ছাসুখে ঠেলতেন মাকু, আনন্দের সঙ্গে কাজ বাজিয়ে চলতেন, আর এখনকার আমরা কাজ বাজিয়ে বাজিয়ে কুঁজো হয়ে পড়লেম তবু কাজি বলছে ঘাড়ে ধরে বাজা, বাজা, আরো কাজ বাজা, না হলে বরখাস্ত। কবীরের তাঁত কবীরকে ‘বরখাস্ত’ এ কথা বলতে পারেনি। ঐ যে কবীরের ইচ্ছাসুখে তাঁত-বোনার রাস্তা তারি ধারে তাঁর কল্পবৃক্ষ ফুল ফুটিয়েছিল। এই ইচ্ছাসুখটুকুর মুক্তি কবি, শিল্পী, গাইয়ে, গুণী সবাইকে বাঁচিয়ে রাখে—পয়সার সুখ নয়, কিম্বা কাজ ছেড়ে ভরপুর আরামও নয়।

কাজের-কলের বন্দী আমাদের সব দিক দিয়ে এই ইচ্ছাসুখের পথে যেখানে বাধা সেখানে নরক যন্ত্রণা ভোগ করি, উপায় কি? কিন্তু মন—সে তো এ বাধা মানবার পাত্রই নয়। জেলখানার দরজা মন্ত্র-বলে খুলে সে তো বেরিয়ে যেতে পারে একেবারে নীল আকাশের ওপারে! সে তো মৃত্যুর কবলে পড়েও রচনা করতে পারে অমৃতলোক! তবে কোথায় নিরাশা, কোথায় বাধা? বিক্রমাদিত্যের দরবারে কবি কালিদাসকেও নিয়মিত হাজ্‌রে লেখাতে হতো, কিন্তু এতে করে মেঘরাজ্যের তপোবনে তাঁর বিচরণের কোন বাধাই তো হয় নি! কবি, শিল্পী কেউ কাজের জগৎ ছেড়ে রসকলির তিলক টেনে অথবা জটাজুটে ছাই-ভস্মে একেবারে রসগঙ্গাধর সেজে কেবলি বৃন্দাবন আর গঙ্গাসাগরের দিকে পালিয়ে চলেছেন, তা তো কোনো ইতিহাস বলে না। মৃত্যু দিয়ে গড়া এই আমি-রসের পেয়ালা, শুকনো

চামড়ার কার্বা, যার মধ্যে ধরা হয়েছে গোলাপজল, কাজের সূতোয় গাঁথা পারিজাত ফুল—এইগুলোকে তাঁরা জীবনে অস্বীকার করে চলতে চেষ্টা করেন নি, উল্টে বরং যারা কাজে নারাজ হয়ে একেবারেই বয়ে যাবার জন্য বেশী আগ্রহ দেখিয়েছে তাদের ধমক দিয়ে বলেছেন, ‘জ্যোঁ কা ত্যোঁ ঠহরো’—আরে অবুঝ, ঠিক্ যেমন আছ তেমনি স্থির থাক। কথাই রয়েছে—কারুকার্য। কাজের জটিলতার শ্রম, শ্রান্তি সমস্তই মেনে নিলে তবে তো সে শিল্পী। এই সহরের মধ্যে দাঁড়িয়েই কি আমরা বলতে পারি, রস কোথায়—তাকে খুঁজে পাচ্ছিনে, শিল্প কোথায়—তাকে দেখতে পাচ্ছিনে? ইন্দ্রনীল মণির ঢাকনা দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড রসের পেয়ালা, কালো-সাদা, বাঁকা-সোজা, রং-বেরং কারুকার্য দিয়ে নিবিড় করে সাজানো, এটি ধরা রয়েছে—তোমারো সামনে, তারও সামনে, অামারো সামনে, ওরও সামনে—বিশেষ ক’রে কারু জন্যে তো এটা নয়—জায়গা বুঝেও তো এটা রাখা হয়নি—তবে দুঃখ কোনখানে? ঢাকা খোলার বাধা কি? কত শক্ত শক্ত কাজে আমরা এগিয়ে যাই, এই কাজটাই কি খুব কঠিন আর দুঃসাধ্য হলো? ঢাকা খোলার অবসর পেলাম না, এইটেই হলো কি আসল কথা? ধর, অবসর পেলেম—পূর্বপুরুষ খেটে খুটে টাকা জমিয়ে গেল, পেটের ভাবনাও ভাবতে হলো ন,—মেয়ের বিয়েও নয়, চাকরিও নয়, কিম্বা আফিস আদালত ইস্কুলগুলোর সঙ্গে একদম আড়ি ঘোষণা করে লম্বা ছুটি পাওয়া গেল—রসের পেয়ালাটার তলানি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার। কিন্তু এতে করে হলো কি? লাড্‌ডুর খদ্দের এত বেড়ে চল্লো যে দিল্লীর বাদশার মেঠাইওয়ালাও ফতুর হবার জোগাড় হলো। অতএব বলতেই হয়, অবসর ও অর্থের মাত্রার তারতম্যে রস পাওয়া-না-পাওয়ার কম-বেশ ঘটছে না, অামার ইচ্ছে না-ইচ্ছে, কি ইচ্ছে, কেমন ইচ্ছে—এরই উপরে সব নির্ভর করছে, এই ইচ্ছেটাই যা পেতে চাই তাই পাওয়ায়, পথ দেখায় এই ইচ্ছে। নজর বিগড়ে গেছে আমাদের, না হলে শিল্পের আগাগোড়া—তার পাবার শুলুক-সন্ধান সমস্তই চোখে পড়তো আমাদের। কি চোখে চাইলেম, কিসের পানে চাইলেম, চোখ কি দেখ্‌লে এবং মন কি চাইলে, চোখ কেমন করে দেখ্‌লে, মন কেমন ভাবে চাইলে, চোখ দেখলেই কি না, মন চাইলেই কি না—এরি উপরে পাওয়া-না-পাওয়া, কি পাওয়া, কেমন পাওয়া, সবই নির্ভর করছে।

কাজের উপরে জাতক্রোধ রক্তচক্ষু নিয়ে নয়, সহজ চোখ, সহজ দৃষ্টি—এবং সেটি নিজের,—সহজ ইচ্ছা এবং আন্তরিক ইচ্ছা—এই নিয়ে 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিতা', হ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা, নবরসরুচিরা যিনি, তাঁর সঙ্গে শুভ দৃষ্টি করতে হয় সহজে। রসের পেয়ালার যদি নাগাল পাওয়া গেল তখন আর কিসের অপেক্ষা? যতটুকু অবসর হোক না কেন তাই ভরিয়ে নিলেম রসে, যেমনি কাজ হোক না কেন তাই করে গেলেম—সুন্দর করে' আনন্দের সঙ্গে; যা বল্লেম, কইলেম, লিখলেম, পড়লেম, শুনলেম, শোনালেম—সবার মধ্যে রস এলো, সৌরভ এলো, সুষমা দেখা দিলে;—শিল্প ও রস শুকশারীর মতো বক্ষ-পিঞ্জরে চিরকালের মতো এসে বাসা বাঁধলো। কি কবি, কি শিল্পী, কিবা তুমি, কিবা আমি এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে যেদিন অতিথি হলেম, রসের পূর্ণপাত্র তো কারু সঙ্গে ছিল না; একেবারে খালি পাত্রই নিয়ে এলেম, এলো কেবল সঙ্গের সাথী হয়ে একটুখানি পিপাসা। আমরা না জানতে মাতৃস্নেহে ভরে গেল আসবাব পত্র—সেই এতটুকু পেয়ালা আমাদের, তারপর থেকে সেই আমাদের ছোট পেয়ালা—তাকে ভরে দিতে কালে-কালে, পলে-পলে দিনে-রাতে, এক ঋতু থেকে আর এক ঋতু রসের ধারা ঝরেই চল্লো, তার তো বিরাম দেখা গেল না;—শুধু কেউ ভরিয়ে নিয়ে বসে রইলেম নিজের পেয়ালা বেশ কাজের সামগ্রী দিয়ে নিরেট করে, কেউ বা ভরলেম পরে সেটা নব-নব রসে প্রত্যেক বারেই পেয়ালাটাকে খালি করে-করে। এই কারণে আমরা মনে করি সৃষ্টিকর্তা কোন মানুষকে করে পাঠালেন রসের সম্পূর্ণ অধিকারী, কাউকে পাঠালেন একেবারে নিঃস্ব করে। একি কখন হতে পারে? "রসো বৈ সঃ" বলে যাঁকে ঋষিরা ডাকলেন, তিনি কি বঞ্চক? রাজার মতো কাউকে দিলেন ক্ষমতা, কাউকে রাখলেন অক্ষম করে, শিল্পীর সেরা যিনি তাঁর কি এমন অনাসৃষ্টি কারখানা হবে? কেউ পাবে সৃষ্টির রস, সৃষ্টির শিল্পের অধিকার, আর একজন কিছুই পাবে না? এত বড় ভুল কেবল সেই মানুষই করে যে নিজের দোবে নিজে বঞ্চিত হয়ে বিধাতাকে দেয় গঞ্জনা। সেইজন্য কবীরের কাছে যখন একজন গিয়ে বল্লে—প্রাণ গেল রস পাচ্ছিনে, কোথা যাই? কি করি? কোন্ দিকের আকাশে সূর্য আলো দেয় সব চেয়ে বেশি, কোন্ সাগরের জল সব চেয়ে নীল পরিষ্কার অনিন্দ্যসুন্দর—সে কোন্ বনে বাসা বেঁধেছে, রস

কোন্ পাতালে লুকিয়ে আছে, বলে দিন—কি উপায় করি? কবীর অবাক্ হয়ে বল্লেন—

“পানী বিচ মীন পিয়াসী
মোহিঁ সুন সুন আওত হাঁসি।”

এক একবার ঘরের মধ্যে থেকেও হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মনে হয় দরজাটা কোথায় হারিয়ে গেছে—উত্তরে কি দক্ষিণে কোথাও ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না। রসের মধ্যে ডুবে থাকে আমাদের রসের সন্ধান, আর শিল্পের হাটে ব’সে শিল্পলাভের উপায় নির্ধারণ, এও কতকটা ঐরূপ।

পাথরের রেখায় বাঁধা রূপ, ছবির রঙে বাঁধা রেখা, ছন্দে বাঁধা বাণী, সুরে বাঁধা কথা, শিল্পের এ সবই তো যে রস ঝরছে দিনরাত তারি নির্মিতি ধরে প্রকাশ পাচ্ছে; অখণ্ড রসের খণ্ড খণ্ড টুকরো তো এরা—একটি আলো থেকে জ্বালানো হাজার প্রদীপ, এক শিল্পের বিচিত্র প্রকাশ! এর অধিকার পাওয়ার জন্য কোন আয়োজন, কোন শাস্ত্রচর্চাই দরকার করে না। কাজের জগতের মাঝেই রস ঝর্‌ছে—আনন্দের ঝরণা, আলোর ঝোরা; তার গতি ছন্দ সুর রূপ রং ভাব অনন্ত; আর কোথায় যাবো—শিল্প শিখতে শিল্পকে জানতে? নীল আর সবুজ এমনি সাত রঙের সাতখানি পাতা তারি মধ্যে ধরা রয়েছে রসশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সঙ্গীত, কবিতা—সমস্তেরই মূলসূত্র ব্যাখ্যা সমস্তই! এমন চিত্রশালা যার ছবির শেষ নেই, এমন বাণী মন্দির যেখানে কবিতার অবিশ্রান্ত পাগলাঝোরা ঝরছেই, এমন সঙ্গীতশালা যেখানে সুরের নদী সমুদ্র বয়ে চলেছে অবিরাম, এর উপরে রসকে পাবার, শিল্পকে লাভ করবার, আর কি আয়োজন মাটির দেওয়ালের ঘরে করতে পারি? এর উপরে কিবা অভাব আমাদের জানাতে পারি? Artistএর সেরা, সেরা কারিগরের সেরা—বিশ্বকর্মার এই অযাচিত দান, এই নিয়েই তো বসে থাকা চলে,—দেখ আর লেখ, শোন আর বসে থাক।

আর তো কিছুর জন্যে চেষ্টা হয় না, ইচ্ছেও হয় না। এই অপ্রার্থিত অপর্যাপ্ত সৃষ্টি আর রস—একেই বুক পেতে নিয়ে সৃষ্টির যা কিছু—মানুষ থেকে সবাই—চুপচাপ বসে রইলো ঘাড় হেঁট করে রসের মধ্যে ডুবে, সেরা শিল্পীর

www.bengaliebook.com

এই কি হলো রচনার পরিপূর্ণতা—মুখবন্ধেই হলো রচনার শেষ? শিল্পীর রাজা যিনি শুধু একটা জগৎ-জোড়া চলায়মান বায়স্কোপের রচনা করেই খুসি হলেন, জীবজগৎটাকে সোনালী রূপালী মাছের মতো একটা আশ্চর্য গোলকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়াতেই তাঁর শিল্প ইচ্ছার শেষ হয়ে গেল? চিত্রকর মানুষ তার টানা রূপগুলির টানে টানে যেমন চিত্রকরের ঋণ স্বীকার করে চলার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রকরকেই আনন্দ দিতে দিতে আপনাদের সমস্ত ঋণ শোধ করে চলে, তেমনি ভাবেই তো এই বিরাট শিল্পরচনার সৃষ্টি হলো, তাইতো এর নাম হল অনাসৃষ্টি নয়,—সৃষ্টি। সৃষ্ট যা, সৃষ্টিকর্তার কাছে ঋণী হয়ে বসে রইলো না, এইখানেই সেরা শিল্পীর গুণপনা—মহাশিল্পের মহিমা—প্রকাশ পেলে। শিল্পী দিলেন সৃষ্টিকে রূপ; সৃষ্টি দিয়ে চল্লো এদিকের সুর ওদিকে, অপূর্ব এক ছন্দ উঠ্‌লো জগৎ জুড়ে! আমাদের এই শুকনো পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম বর্ষার প্লাবন বুক পেতে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বল্লে—রসিক, সবই তোমার কাছ থেকে আসবে, আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না? সবুজ শোভার ঢেউ একেবারে আকাশের বুকে গিয়ে ঠেকলো; ফুলের পরিমল, ভিজে মাটির সৌরভ বাতাসকে মাতাল করে ছেড়ে দিলে; পাতার ঘরের এতটুকু পাখী, সকাল-সন্ধ্যা আলোর দিকে চেয়ে সেও বল্লে—আলো পেলেম তোমার, সুর নাও আমার—নতুন নতুন আলোর ফুল্‌কি দিকে-দিকে সকলে যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কথা বলে চল্লো,—তারপর একদিন মানুষ এলো; সে বল্লে—কেবলই নেবো, কিছু দেবো না? দেবো এমন জিনিষ যা নিয়তির নিয়মেরও বাইরের সামগ্রী; তোমার রস আমার শিল্প এই দুই ফুলে গাঁথা নবরসের নির্মিত নির্মাল্য ধর, এই বলে' মানুষ নিয়মের বাইরে যে, তার পাশে দাঁড়িয়ে শিল্পের জয়ঘোষণা করলে,—

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধাতি ভারতীকবের্জয়তি॥"

নিয়মের মধ্যে ধরা মানুষের চেষ্টা, নতুন বর্ণে, নতুন নতুন ছন্দে বয়ে চল্লো নিয়মের সীমা ছাড়িয়ে ঠিক-ঠিকানার বাইরে। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু দিতে পেরেছে সে তার এই নির্মিতি—যেটা পরিমিতির মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিতি দিয়ে ছেড়ে দিলে অপরিমিত রসের তরঙ্গে।

www.bengaliebook.com

শিল্পে অনধিকার

ভূমিকা

পূজ্যপাদ স্যর আশুতোষের প্রযত্নে ও খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের বদান্যতায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পাঁচটি নূতন অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হয়, ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপনা-সম্পর্কে ‘রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপক’-পদ তন্মধ্যে একটি।

মনে পড়িতেছে, ইহার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘রসের কথা’ নামে এক প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছিলেন, “এ দেশের অলঙ্কারের সূত্রগুলো যে ছত্রে-ছত্রে Art-এর ব্যাখ্যা ক’রে চলেছে, সেটা কোন পণ্ডিতকে তো এ পর্য্যন্ত বলতে শুন্‌লেম না।” কিন্তু দরদীর মন লইয়া এ কথা বলিবার—Art-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা করিবার—অবনীন্দ্রনাথই যে যোগ্যতম পণ্ডিত, ইহা স্যর আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন। ইহা বুঝিয়াই সেই সময়ে তিনি অবনীন্দ্রনাথকেই ‘রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপকের’ পদে বরণ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি প্রায় ত্রিশটি বক্‌তৃতা দিয়াছিলেন। সেই সকল বক্‌তৃতা তখনকার দিনে ‘বঙ্গবাণী’ ও ‘প্রবাসী’ পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার পর প্রায় এক যুগ অতীত হইয়াছে। শিল্প-চর্চ্চার আদর দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়-তালিকায় ‘শিল্পরসবোধ’ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এ সময়ে অবনীন্দ্রনাথের উক্ত বক্‌তৃতাসমূহ পুনঃ-প্রচারিত হইলে অনেকের উপকার হইবে বিবেচনায় সেগুলি ‘বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

---

০১. শিল্পে অনধিকার

www.bengaliebook.com

আজ থেকে প্রায় ১৫ বৎসর আগে আমার গুরু আর আমি দুজনে মিলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে শিল্পের একটা খেলাঘর কল্পনা করেছিলেম। আজ এইখানে যাঁরা আমার গুরুজন ও নমস্য এবং যাঁরা আমার সুহৃদ্ এবং আদরণীয়, তাঁরা মিলে আমার কল্পনার জিনিষকে রূপ দিয়ে যথার্থই অামায় চিরদিনের মতো কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছেন। আমার কতকালের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে—আজ সন্ধ্যায়।

কেবল সেদিনের কল্পনার সঙ্গে আজকের সত্যিকার জিনিষটার মধ্যে একটি বিষয়ে অমিল দেখ্ছি—সেটা এই সভায় আমার স্থান নিয়ে। সেদিন ছিলেম আমি দর্শকের মধ্যে,—প্রদর্শক কিম্বা বক্তার আসনে নয়। তাই এক-একবার মনে হচ্ছে আজকেরটাই বুঝি দরিদ্রের স্বপ্নের মতো একটা ঘটনা—হঠাৎ মিলিয়ে যেতেও পারে।

কিন্তু স্বপ্নই হোক্ আর সত্যই হোক্, এরি আনন্দ আমাকে নূতন উৎসাহে দিনের পর দিন কাজ করতে চালিয়ে নেবে—যতক্ষণ আমার কাজ করার এবং বক্তৃতা দেবার শক্তি থাকবে।

যোগ সাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুজে, শ্বাসপ্রশ্বাস দমন করে; কিন্তু শিল্প-সাধনার প্রকার অন্য প্রকার—চোখ খুলেই রাখতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখীর মতো মুক্তি দিতে হয়—কল্পনা-লোকে ও বাস্তব-জগতে সুখে বিচরণ কর্তে। প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন-ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তারপর বসে থাকা—বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে, চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে। এই সজাগ সাধনার গোড়ায় শ্রান্তিকে বরণ করতে হয়—Art is not a pleasure trip, it is a battle, a mill that grinds. (Millet).

Art has been pursuing the chimera attempting to reconcile two opposites, the most slavish fidelity to nature and the most absolute independence, so absolute that the work of art may claim to be a creation. (Bracquemont). আমাদেরও পণ্ডিতেরা artকে 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা' বলেছেন; সুতরাং এই artকে পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে যে ধরে দিয়ে যাব, এমন আশা আমি করিনে এবং আমাকে যিনি এখানে

ডেকেছেন, তিনিও করেন না। আমি ক-বছর নির্ব্বিবাদে art-সম্বন্ধে যা খুসি, যখন খুসি, যেমন করে খুসি, যা-তা—অবিশ্যি যা জানি তা—বকে যেতে পারবো এই ভরসা পেয়েছি। আমার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আমার যথেষ্ট হলেই তো হল না, আরো পাঁচজন রয়েছেন—দেশের ও দশের কি হল? এ প্রশ্ন তো উঠবে একদিন, তাই আমি এই কাজের দিকে দু পা এগোই, দশ পা পিছোই, আর ভাবি এই যে এতকাল ধরে নানা ছবি আঁকলেম, ছবি আঁকতে শিখিয়ে চল্লেম, স্কুল বসালেম এবং বারো-তেরো বছর ধরে কত Exhibitionই দেখালেম লোকসমাজে, এই যে নবচিত্রকলাপদ্ধতি বলে একটা অদ্‌ভুত জিনিষ, এই যে প্রাচীন ভারতচিত্র বলে একটা গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া গেল, আর আগেকার সাদা মাসিকপত্রগুলোকে সচিত্র করে, ছেলেদের বইগুলোকে রঙিন ছবিতে ভরিয়ে সমালোচকদের হাতে "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" সমালোচনা গড়বার মহাস্ত্র আরও একটা বাড়িয়ে তোলা হল—এগুলো বিনা পারিশ্রমিকে দেওয়া বলেই কি যথেষ্ট হল না? বিনামূল্যে, আনন্দে একটু দেওয়া, সেই তো ভাল দেওয়া। মূল্য নিয়ে ওজন করে যা দেওয়া, সেটা দোকানদারের ফাঁকি দিয়ে ভরা হলেই যে যথেষ্ট ভাল হয় তাতো নয়! তাই বলি—আমি বলে যাব, তোমরা শুনে যাবে; আমি ছবি লিখে যাব, তোমরা দেখে আনন্দ করবে অথবা সমালোচনা করবে; কিম্বা তোমরা লিখবে বলবে, আমি দেখব শুনব আনন্দ করবো—আর যদি সমালোচনা করি তো মনে-মনে; এর চেয়ে বেশী আপাতত নাই হলো।

শিল্পের একটা মূলমন্ত্রই হচ্চে 'নালমতিবিস্তরেণ'। অতি-বিস্তরে যে অপর্য্যাপ্ত রস থাকে, তা নয়। অমৃত হয় একটি ফোঁটা, তৃপ্তি দেয় অফুরন্ত! আর ঐ অমৃতি জিলাবির বিস্তার মস্ত, কিন্তু খেলে পেটটা মস্ত হয়ে ওঠে আর বুক চেপে ধরে বিষম রকম। শিল্পরসের উপর অধিকারের দাবি আমার যে কত অল্প, তা আমি যেমন জানি, এমন তো কেউ নয়। কারণ অমৃত-বণ্টনের ভার নিতে আমি একেবারেই নারাজ। আমার সাধ্য যা, তাই দেবার হুকুম পেয়েছি। দিতে হবে যা আছে আমার সংগ্রহ করা,—শিল্পের ভাবনা-চিন্তা কাজ-কর্ম্ম সমস্তই—যা আমার মনোমত ও মনোগত। কারো মনোমত করে গড়া নয়, নিজের অভিমত জিনিষ গড়তেই আমি শিখেছি,—আর শিখেছি সেটাকে জোর করে কারু ঘাড়ে চাপাবার না চেষ্টা

করতে। 'আদানে ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিদানে চিরায়ুতা'—শিল্পীর উপরে শাস্ত্রকারের এই হুকুমটার একটা মানে হচ্ছে সব জিনিষের কৌশল আর রস চট্‌পট্‌ আদায় করতে হবে; কিন্তু সেটা পরিবেষণ করবার বেলায় ভেবে-চিন্তে চল্‌বে। কেউ কেউ ভয় করছেন, সুযোগ পেয়ে এইবার আমি নিজের এবং নিজের দলের শিল্পের একচোট বিজ্ঞাপন বিলি করে নেব। সেটা আমি বলছি মিথ্যে ভয়। শিল্পলোকে যাত্রীদের জন্য একটা গাইড্‌বুক পর্য্যন্ত রচনা করার অভিসন্ধি আমার নেই, কেন না আমিও একজন যাত্রী—যে চলেছে আপনার পথ আপনি খুঁজতে খুঁজতে। এই খোঁজাতেই শিল্পীর মজা। এই মজা থেকে কাউকে বঞ্চিত করার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। শুধু যাঁরা এই শিল্পের পথে আমার অগ্রগামী, তাঁদেরই উপদেশ আমি সবাইকে স্মরণে রেখে চল্‌তে বলি—"ধীরে ধীরে পথ ধরো মুসাফির, সীড়ী হৈ অধবনী!"—দুর্গম সোপান, হে যাত্রী, ধীরে পা রাখ। এ ছাড়া বিজ্ঞাপনের কথা যা শুনছি, তার উত্তরে আমি বলি—ফুল যেমন তার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে নানা বর্ণে সাজিয়ে, বসন্তঋতু লট্‌কে দিচ্ছে তার বিজ্ঞাপন আকাশ বাতাস পৃথিবী ছেয়ে, তেমনি করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন সব কবি, শিল্পীই; আর তাই দেখে ও শুনে কেউ করছে উহু, কেউ উঁহু, কেউ আহা, কেউ বাহা! এটা তো প্রতি পলেই দেখছি, সুতরাং শিল্পের বিজ্ঞাপন দেব আমি আজকালের নূতন প্রথায় কেন? মনের ফুল বনের ফুলের সাথী হয়ে ফুটলো,—এর বেশিও তো শিল্পীর দিক থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই; তবে কেন অধম শিল্পী হলেও আমি ছুটে মরবো যথা-তথা হ্যাণ্ডবিল বিলিয়ে? এ আশঙ্কার কারণ তো আমি বুঝিনে। মধুকর মধু নিয়ে তৃপ্ত হন; এতে ফুলের যতটুকু আনন্দ, তার চেয়ে শিল্পীর সজীব আত্মা সমজদার পেলে আর একটুখানি আনন্দ বেশি পায় সত্য, কিন্তু সেটা তার উপরি-পাওনা— হলেও হয়, না হলেও চলে। শিল্পীর যথার্থ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরবে। গোলাপ সৌরভ ছড়িয়ে রাঙা হয়ে ফুটলো, শিমুলও ফুটলো রাঙা হয়ে—খালি তুলোর বীজ ছড়াতে, কিন্তু রসিক যে, সে তো সেই দুই ফুলেরই ফোটার গৌরব দেখে খুসি হয়। এই ফোটার গৌরব দিয়ে ওস্তাদ যাঁরা, তাঁরা শিল্পীর কাজের তুলনা করে থাকেন—"দিবস চারকে সুরংগ ফুল, ওহি লখ মনমে লাগল্‌ শূল!"—দু দণ্ডের জীবন ফুটলো, রসিকের এই দেখেই মন বলে—মরি মরি! এইখানেই শিল্পীতে আর কারিগরে তফাৎ; শিল্পের মধ্যে শিল্পীর

মন ফুটন্ত হয়ে দেখা দিলে, আর কারিগরের গড়া অতি আশ্চর্য্য কাগজের ফুল ফুটন্ত ফুলকেও হার মানালে, কিন্তু মনের রস সেটাকে সজীব করে দিলে না। জগতে কারিগরেরই বাহবা বেশি শিল্পীর চেয়ে, কেন না কারিগর বাহবা পেতেই গড়ে, শিল্পী গড়ে চলে নিজের কাজের সঙ্গে নিজকে ফুটতে বোধ করতে-করতে। এই কারণেই শিল্পচর্চ্চার গোড়ার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ, যেমন শিশুশিক্ষার গোড়াতে হচ্ছে শিশুবোধ।

রসবোধই নেই রস-শাস্ত্র পড়তে চলায় যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্পচর্চ্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়। এর উল্টোটা যদি হতো, তবে সব কটা অলঙ্কার-শাস্ত্রের পায়েস প্রস্তুত করে পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত। মৌচাকের গোপনতার মধ্যে কি উপায়ে ফুলের পরিমল গিয়ে পৌঁছচ্ছে তা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু মধুর সৃষ্টি হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড রহস্যের আড়ালে। তেমনি মানুষের রসবোধ কি উপায়ে হয়, কেমন করে, অলঙ্কার-শাস্ত্রে রস-শাস্ত্রে তারি জল্পনা যেমন দেখি, তেমনি এও তো দেখি যে রস-শাস্ত্র নিংড়ে পান করেও কমই রসিক দেখা দিচ্ছে। এই যে আলো-মাখা রামধনুকের রঙে বিচিত্র বিশ্বচরাচরের অফুরন্ত রস, এ তো মাটি থেকে প্রস্তুত রঙের বাক্সয় ধরা পড়ে না, কালীর দোয়াতেও নয়, বীণার খোলটার মধ্যেও নয়। এ বাঁধা পড়ে মনে; এই হলো সমস্ত রস-শাস্ত্রের প্রথম ও শেষ পাঠ। মৌচাক আর বোলতার চাক—সমান কৌশলে আশ্চর্যভাবে দুটোই গড়া। গড়নের জন্যে বোলতায় আর মৌমাছিতে পার্থক্য করা হয় না; কিম্বা মৌমাছিকে মধুকরও নাম দেওয়া হয় না—অতি চমৎকার তার চাকটার জন্যে। মৌচাকের আদর, তাতে মধু ধরা থাকে বলেই তো! তেমনি শিল্পী আর কারিগর দুয়েরই গড়া সামগ্রী, নিপুণতার হিসেবে কারিগরেরটা হয়ত বা বেশি চমৎকার হলো কিন্তু রসিক দেখেন শুধু তো গড়নটা নয়, গড়নের মধ্যে রস ধরা পড়লো কি না। এই বিচারেই তাঁরা জয়মাল্য দেন শিল্পীকে, বাহবা দেন কারিগরকে। শিল্পীর কাজকে এইজন্যে বলা হয় নির্মিতি অর্থাৎ রসের দিক দিয়ে যেটি মিত হলেও অপরিমিত। আর কারিগরের কাজকে বলা হয় নির্মাণ অর্থাৎ নিঃশেষভাবে পরিমাণের মধ্যে সেটি ধরা। একটা নির্মাণের মতো ঠিক, আর একটি নির্মাণ-সম্ভব কিন্তু শিল্পীর নির্মিতিকে কৌশলের কলে ফেলে বাইরের ধাঁচাটা নকল করে নিলেও ভিতরের রসের

অভাব কিম্বা তারের বৈষম্য থাকবেই। এইজন্যেই শিল্পীর শিল্পকে বলা হয়েছে "অনন্যপরতন্ত্রা"। আমার শিল্প এক, আর তোমার শিল্প আর-এক, আমার দেশের শিল্প এক, তোমার দেশের অন্য,—এ না হলে মানুষের শিল্পে বিচিত্রতা থাকতো না; জগতে এক শিল্পী একটা-কিছু গড়তো, একটা-কিছু বলত বা গাইত আর সবাই তার নকলই নিয়ে চলত। রোমক শিল্প নকল নিয়েই চলেছিল—গ্রীকদেবতার মূর্ত্তিগুলির কারিগরিটার। রোম ভেবেছিল গ্রীক শিল্পের সঙ্গে সমান হয়ে উঠবে এই সোজা রাস্তা ধরে, কিন্তু যেদিন একটি গ্রীক শিল্পীর নির্মিতি মানুষের চোখে পড়লো, সেই দিনই ধরা পড়ে গেল অত বড় রোমক শিল্পের ভিতরকার সমস্ত শুষ্কতা ও অসারতা। সপ্তম সর্গ, অষ্টম সর্গ, সাত কাণ্ড, অষ্টাদশ পর্বগুলোর ছাঁচের মধ্যে নিজের লেখাকে ঢেলে ফেলতে পারলেই কিম্বা নিজের কারিগরি কি কারদানিটাকে হিন্দু বা মোগল অথবা ইউরোপীয় এমনি কোনো একটা যুগের ও জাতির ছাঁচের মধ্যে ধরে ফেলতে পারলেই আমাদের ঘরে শিল্প পুনর্জীবন লাভ করে কলাবৌটি সেজে ঘুর্‌ঘুর্ করে ঘুরে বেড়াবে এই যে ধারণা এইটেই হচ্ছে সব শিল্পীর যাত্রাপথের আরম্ভে একটুখানি অথচ অতি ভয়ানক, অতি পুরাতন চোরাবালি। এর মধ্যে একটা চমৎকার, চক্‌চকে সাধুভাষায় যাকে বলে, লোষ্ট্র পড়ে আছে, যার নাম Tradition বা প্রথা। অনন্তকালের সঞ্চিত ধনের মতো এর মোহ; একে অতিক্রম করে যাবার কৌশল জানা হলে তবে শিল্পলোকের হাওয়া এসে মনের পাল ভরে তোলে, ডোববার আর ভয় থাকে না। শিল্পলোকের যাত্রাপথে এই যে একটা মোহপাশ রয়েছে—চিরাগত প্রথার অনুসরণপ্রিয়তা, সেটাকে কাটিয়ে যাবার শিল্প-শাস্ত্র বৈদিক ঋষিরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন—'মানুষের নির্মিত এই সমস্ত খেলানার সামগ্রী, এই হস্তী, কাংস, বস্ত্র, হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প সমস্তই দেবশিল্পের অনুকরণমাত্র—একে শিল্প বলা চলে না, এ তো দেব-শিল্পীর দ্বারায় করা হয়ে গেছে, মানুষের কৃতিত্ব এর মধ্যে কোথায়? এ তো শুধু প্রতিকৃতি (নকল) করা হলো মাত্র! হে যজমান শিল্পী, দেব-শিল্পীর পরে এলেম আমরা, সুতরাং আমাদের করাটা নামে মাত্র অনুকৃতি বলে ধরা যায়, কিন্তু আমাদের কাজে সৃষ্টির কৃতিত্ব যেখানে, সেখানে মানুষের শিল্পের সঙ্গে দেবশিল্পের রচনার উপায়ের মধ্যে পার্থক্য কোথাও নেই; শুধু সেটি পরে করা হয়েছে—অনুকৃত হয়েছে মাত্র—এই রহস্য জানো! এ যে জানে

সকল শিল্পই তার অধিকারে আসে, শিল্প তার আত্মার সংস্কার সাধন করে, এই যে শিল্প এমন যে শিল্প-শাস্ত্র, কেবল তারি দ্বারায় যজমান নিজের আত্মাকে ছন্দোময় করে যথার্থ যে সংস্কৃতি তাই লাভ করে এবং প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সহিত মনকে, শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে মিলিত করে।'

যতদিন মানুষ জানেনি তার নিজের মধ্যে কি চমৎকারিণী শক্তি রয়েছে সৃষ্টি করবার, ততদিন সে তার চারিদিকের অরণ্যানীকে ভয় করে চলছিল, পর্ব্বতশিখরকে ভাবছিলো দুরারোহ, ভীষণ; বিশ্বরাজ্যের উপরে কোনো প্রভুত্বই সে আশা করতে পারছিল না; তার কাছে সমস্তই বিরাট রহস্যের মত ঠেকছিল; সে চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু যেদিন শিল্পকে সে জানলে, সেই মুহূর্ত্তেই তার মন ছন্দোময় বেদময় হয়ে উঠলো, রহস্যের দ্বারে গিয়ে সে ধাক্কা দিলে—সবলে। শুধু এই নয়, ভয় দূরে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ তার এই দুদিনের খেলাঘরে অতি আশ্চর্য্য খেলা—কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করে দিলে। আগুনকে সে বরণ করে নিয়ে এলো নিজের ঘরে ঘুমন্ত দেশের রাজ-কন্যার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুলে! অমনি সঙ্গে-সঙ্গে তার ঘরে বেজে উঠ্‌লো লোহার তার আশ্চর্য্য সুরে, মাটির প্রদীপ জ্বেলে দিলে নূতনতর তারার মালা; মানুষ সমস্ত জড়তার মধ্যে ডানা দিয়ে ছেড়ে দিলে;—আকাশ দিয়ে বাতাস কেটে উড়ে চল্লো, সমুদ্রের পরপারে পাড়ি দিয়ে চল্লো—মানুষের মনোরথ, মনতরী—তার স্বপ্ন তার সৃষ্টির পসরা বয়ে। এই শিল্পকে জানা, মানুষের সব-চেয়ে যে বড় শক্তি—সৃষ্টি-করার কৃতিত্ব, তাকেই জানা। এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে এতটুকু মানুষ কেমন করে বেঁচে থাকতো যদি এই শিল্পকে সে লাভ না করত! শিল্পই তো তার অভেদ্য বর্ম, এই তো তার সমস্ত নগ্নতার উপরে অপূর্ব রাজবেশ! আত্মার গৌরবে আপনি সেজে নিজের প্রস্তুত-করা পথে সে চল্লো—স্বরচিত রচনার অর্ঘ্য বয়ে—মানুষ নিজেই যাঁর রচনা তাঁর দিকে! মানুষের গড়া আনন্দ সব তো এতেই শেষ! সে জানাতে পারলে আমি তোমার কৃতী সন্তান! শিল্পের সাধনা মানুষ করেই চল্লো পৃথিবীতে এসে অবধি, তবেই তো সে নানা কৌশলে নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলে; সাত-সমুদ্র তের-নদী, এমন কি চন্দ্রলোক সূর্যলোকের ঊর্ধ্বেও তার শরীর ও মনের গতি, চলার সব বাধাকে অতিক্রম

করে, কতক সমাধা হলো, কতক বা সমাধা হবার মতো হলো। সূর্যের মধ্যে ঝড় বইল, মানুষের গড়া যন্ত্রে তার খবর সঙ্গে-সঙ্গে এসে পৌঁছুলো, নীহারিকার কোলে একটি নতুন তারা জন্ম নিলে ঘরে বসে মানুষ সেটা চোখে দেখলে! এর চেয়ে অদ্‌ভুত সৃষ্টি হলো—মানুষ তার আত্মাকে রূপ, রঙ, ছন্দ, সুর, গতি, মুক্তি সব দিয়ে ছড়িয়ে দিলে বিশ্বরাজ্যে। এমন যে শিল্প, এত বড় যে শিল্প, তারই অধিকার ঋষিরা বলেছেন নাও; আর আমরা বলছি না, না, ও পাগলামি-খেয়াল থাক, চাকরীর চেষ্টা করা যাক্। ওইটুকু হলেই আমরা খুসী। ঋষির বল্লেন—একি, একি তুচ্ছ চাওয়া? —নাল্পে সুখমস্তি! আমরা বল্লুম—অল্পেই আমি খুসি। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বতন যাঁরা, তাঁদের চাওয়া তো আমাদের মতো যা-তা যেমন-তেমন নয়। শিল্পলক্ষ্মীর কাছে তাঁদের চাওয়া বাদসার মতো চাওয়া—একেবারে ঢাকাই মস্‌লিন, তাজমহলের ফরমাস; জগতের মধ্যে দুর্লভ যা, তারই আবদার! বৌদ্ধ-ভিক্ষু, তাঁরা থাকবেন; শুধু পাহাড়ের গুহা মনঃপূত হলো না, তাদের জন্য রচনা হয়ে গেল অজন্তাবিহার—শিল্পের এক অদ্‌ভুত সৃষ্টি—ভিক্ষুরা যেখানে জন্তুর মতো গুহাবাস করবেন না, নরদেবের মতো বিহার করবেন!

রমণীর শিরোমণি তাজ, দুনিয়ার মালিক সাহাজাহান তার স্বামী, সোহাগ-সম্পদ সে কি না পেয়েছিল, কিন্তু তাতেও তো সে তৃপ্ত হলো না, সাহাজাহানের অন্তরে ছিল যে শিল্প, তারই শেষ-দান সে চেয়ে নিলে—দুজনের জন্যে একটি মাত্র কবর, যার মধ্যে দুজনে বেঁচে থাকবে, এমন কবর যার জোড়া ত্রিভুবনে নেই। একেই বলে চাওয়ার মতো চাওয়া, দেওয়ার মতো দেওয়া। কোনো শিল্প নেই, কোনো রস নেই—এটা সেকালের লোক কল্পনা করতে পারেনি, তাদের শিল্পসামগ্রীগুলোই তার প্রমাণ। কিন্তু আজকালের-আমরা কি পেরেছি, এখনও পারছি, আমাদের ঘর-বার চারিদিক তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শিল্পে অধিকার আমরা কি মুখের বক্‌তৃতায় পাব? মনের মধ্যে যে রয়েছে আমাদের—যেন-তেন-প্রকারেণ পয়সা, কোনো-রকমে যা-তা করে লীলা সাঙ্গ করা! এ ভাবে চল্লে হাতের মুঠোয় কেউ শিল্পকে ধরে দিলেও তো আমরা সেটা পাব না। খোঁজই নেই শিল্পের জন্যে, কোথা থেকে পাব সেটা!

কি দিয়ে ঘর সাজালেম, কি ভাবেই বা নিজে সাজলেম, আমোদই বা হলো কেমন, পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বছরের জীবনটা কাটলই বা কেমন করে—এ খোঁজের তো প্রয়োজনই আছে বলে মনে করি না; মনের মধ্যে যে লুকিয়ে রয়েছে যেমন-তেমন ভাব,—অল্পেই মন ভরে গেল যেমন-তেমনে! শুধু অল্প হলে তো কথা ছিল না; সেটা বিশ্রী হবে কেন? মাসে বার-পঁচিশ বায়স্কোপ-রঙ্গমঞ্চের রঙ্গ এবং ফুটবলের ভিড়, ঘোড়দৌড়ের জুয়ো এবং দু'চারটে স্মৃতি-সভার বার্ষিক অধিবেশন ও যতটা পারা যায় বক্তৃতা—এই হলেই কি চুকে গেল সব ক্ষুধা, সব তৃষ্ণা? ধর ক্ষুধা মেটানো গেল—সোনালী গিল্টি-করা মার্ব্বেল-মোড়া বৈদ্যুতিক আলোতে ঝক্‌মক্ হোটেলের খানা-কামরায়, এবং তৃষ্ণাও মেটালেম মদের বোতলে; কিন্তু তারপর কি? মনের খোরাক যে মধু, মনকে তা দেওয়া হল না—পেয়ালা ভরে। মন রইলো উপবাসে। দিনে-দিনে মন হতবল, হতশ্রী হলো, স্ফূর্তি হারালে। তারপর একদিন দেখলেম, আনন্দময়ের দান আনন্দ দেবার ক্ষমতা, আনন্দ পাবার ইচ্ছা—সবই হারিয়েছি; সৌন্দর্যবোধ, আনন্দবোধ—সবই আমাদের চলে গেছে। বাতাস যে কি বলছে তা বুঝতে পারছি নে, ফুলন্ত পৃথিবী কি সাজে যে সেজে দাঁড়াচ্ছে ঘরের সামনে তাও দেখতে পাচ্ছিনে। আকাশে আলো নেই, অন্তরে তেজ নেই, আশা নেই, আনন্দ নেই, শুকনো জীবন ঝুঁকে রয়েছে রসাতলের দিকে! এটা যে আমি কেবল অযথা বাক্‌জাল বিস্তার করে ভয় দেখাচ্ছি তা নয়; এই ভয় সত্যিই আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় করতেই হবে,—শিল্পীর অধিকার আমাদের পেতেই হবে, না হলে কিছুই পাব না আমরা। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার, শিল্পভাণ্ডার অতুল ঐশ্বর্যে কালে-কালে ভর্তি হলো সত্যি, কিন্তু আজকের আমাদের হাল-চাল দেখে কেউ কি বলবে আমরাই সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের যথার্থ উত্তরাধিকারী? এই হতশ্রী, নিরানন্দ, অত্যন্ত অশোভন ভাবে নিঃস্ব, কেবলি হাত-পাতা আর হাত-জোড় ছাড়া হাতের সমস্ত কাজ যারা ভুলে বসেছি, সূর্যের কণা দিয়ে গড়া কোণার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে ধরা তাজ—এগুলো কি আমাদেরই? ভারতবাসী বলেই কি এগুলো আমাদের হলো? তাতো হতে পারে না। এই সব শিল্পের নির্মিতি, এদের নিজের বলবার অধিকার অর্জন করবো শুধু সেই দিন, যেদিন শিল্পকে আমরা লাভ করবো, তার পূর্বে তো নয়। শিল্প যেদিন আমাদের

হবে, সেদিন জগৎ বলবে এ সবই তো তোমাদের!—আমাদের শিল্পও তোমাদের। আমাদের দেশের রসিকরা বলেছেন শিল্পকে 'অনন্যপরতন্ত্রা'। শিল্পের সাধনা যে করে, কি দেশের কি বিদেশের প্রাচীন নতুন সব শিল্পের ভোগ তারই কপালে ঘটে। আমার দেশ বলে ডাক দিলে দেশটা হয়তো বা আমার হতেও পারে কিন্তু দেশের শিল্পের উপরে আমার দাবি যে গ্রাহ্য হবে না, সেটা ঠিক। তা যদি হতো তবে কালাপাহাড় থাক্‌লে, সেও আজ আমাদের সঙ্গে ভারতশিল্পের চূড়া থেকে প্রত্যেক পাথরটির উপরে সমান দাবি দিতে পারতো; কেন না কালাপাহাড় ছিল ভারতবাসী এবং আমাদেরই মত ভাঙ্‌তে পটু, গড়তে একেবারেই অক্ষম; শুধু কালাপাহাড় ভেঙ্গে গেছে রাগে আর আমরা ভাঙছি বিরাগে—এই মাত্র তফাৎ। কাব্যকলা, শিল্পকলা, গীতকলা,—এ সবাইকে 'রস-রুচিরা' বলে কবিরা বর্ণন করেছেন এবং তিনি হ্লাদৈকময়ী—আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন; আর তিনি অনন্যপরতন্ত্রা—যেমন-তেমন যার-তার কাছে ত তিনি বাঁধা পড়েন না; রসিক, কবি—এদেরই তিনি বরণ করেন এবং এদেরই তিনি সহচরী সঙ্গিনী সবই। আমরা যারা এক আফিসের কাজ এবং সেয়ারের কাজ ও তথাকথিত দেশের কাজ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পাইনে, রস পাইনে, পাবার চেষ্টাও করিনে, তাদের কাছ থেকে শিল্প দূরে থাকবেন, এতে আশ্চর্য কি? "অলসস্‌স কুতো শিল্পং অসিপ্পস্‌স কুতোধনং!"

নিজের শিল্প থেকে ভারতবাসী হলেও আমরা কতখানি দূরে সরে পড়েছি এবং বিদেশী হলেও তারা এই ভারতশিল্পের রত্নবেদীর কতখানি নিকটে পৌঁছে গেছে তার দুটো-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। জাপানের শ্রীমৎ ওকাকুরা শেষ বার এদেশে এলেন, শঙ্কট রোগে শরীর ভগ্ন কিন্তু শিল্পচর্চা, রসালাপের তাঁর বিরাম নেই। সেই বিদেশী ভারতবর্ষের একটি তীর্থ দেখতে এসেছেন—দূর প্রবাস থেকে নিজের ঘরের মৃত্যুশয্যায় আশ্রয় নেবার পূর্বে একবার জগন্নাথের মন্দিরের ভিতরটা কেমন শিল্পকার্য দিয়ে সাজানো দেখে যাবেন এই তাঁর ইচ্ছা, আর সেই কোণার্ক মন্দির যার প্রত্যেক পাথর শিল্পীর মনের আনন্দ আর আলো পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেটাও ঐ সঙ্গে দেখে নেবার তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ দেখলেম। জগন্নাথের ডাক পড়েছে আমার বিদেশী শিল্পীভাইকে; কিন্তু জগন্নাথ ডাকেন তো ছড়িবরদার ছাড়ে না,

ভারতের বড়লাটকে পর্যন্ত বাধা দেয় এত বড় ক্ষমতা সে ধরে! তাকে কি ভাবে এড়ানো যায়? শিল্পীতে-শিল্পীতে মন্ত্রণা বসে গেল। চুপি চুপি পরামর্শটা হলো বটে কিন্তু বন্ধু গেলেন জগবন্ধু দর্শন করতে দিনের আলোতে রাজার মতো। এইটেই ছিল বিশ্বশিল্পীর মনোগত;—শিল্পী বিদেশী হলেও তার যেন গতিরোধ না হয় দর্শনের দিনে। দ্বার খুলে গেল, প্রহরী সসম্মানে একপাশ হলো, জাপানের শিল্পী দেখে এলেন ভারতের শিল্পীর হাতে-গড়া দেবমন্দির, বৈকুণ্ঠ, আনন্দবাজার, মায় দেবতাকে পর্যন্ত। এই পরমানন্দের প্রসাদ পেয়ে বন্ধু দেশে চল্লেন অক্ষত শরীরে। তাঁর বিদায়ের দিনের শেষ-কথা আমার এখনও মনে আছে—ধন্য হলেম, আনন্দের অবধি পেলেম, এইবার পরপারে সুখে যাত্রা করি। এইতো গেল শিল্পের যথার্থ অনুরাগী অথচ বিদেশীর ইতিহাস। এইবার স্বদেশী অথচ বিরাগীর কথাটা বলি। ঐ জগন্নাথের মাসির বাড়ীর জীর্ণ সংস্কার করতে হবে। একটা কমিটি করে খানিকটা টাকা তোলা হয়েছে; এস্‌টিমেট্‌ বক্‌তৃতা ইত্যাদি হয়ে ঠিক হয়েছে—অনেক কালের পুরোনো বনগাঁবাসী মাসির ঘরের বেশ কারুকার্য-করা পাথরের বড় বারাণ্ডা, কাল যেটাতে বেশ একটুখানি চমৎকার গাঢ় বর্ণের প্রলেপ দিয়েছে, আর যার নানা ফাটলের শূন্যতাগুলো মনোরম হয়ে উঠেছে বনলতার সবুজে আর সোনায়, সেই পুরোনোটাকে আরো পুরোনো—আরো মনোরম হতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি সেটার এবং সেই সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার কতকালের লেখা শঙ্খলতার পাড়, হংসমিথুনের ছবি ইত্যাদি নানা আল্‌পনা নক্সাখোদকারী কারিগরি দেওয়াল হতে কড়ি বরগার যত দাগা ও আঁটা ছিল সবগুলোর একসঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করা। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেম মন্দির সংস্কার হচ্ছে, মাসির বাড়ীতে প্রাচীন মূর্তির শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে, হরির লুটের বাতাসার মতো যত পার কুড়িয়ে নিলেই হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি সেখানে গিয়ে দেখি একটা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে, চূড়োর সিংহি উল্টে পড়েছে ভূঁয়ে, পাতালের মধ্যে যে ভিৎ শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়েছিল এতকাল, সে শুয়ে পড়েছে মাটির উপরে; সব ওলট-পালট, তছনছ! কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হলো। চরকে শুধালেম—এই সব পাথরের কাজ ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে যেমন ছিল তেমনি করে তুলে দেওয়া হবে তো সংস্কারের সময়? চরের কথার ভাবে বুঝলেম এই সব জগদ্দল পাথর ওঠায় যেখানকার সেখানে—এমন লোক

নেই। বুঝলেম এ সংস্কার নয়, সৎকার। ভাঙ্গা মন্দিরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে একজোড়া প্রকাণ্ড নীল হরিণ চার চোখে প্রকাণ্ড একটা বিস্ময় নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। কতকালের পোষা হরিণ, এই মন্দিরের বাগানে জন্ম নিয়ে এতটুকু থেকে এত বড়টি হয়েছে,—এদের কি হবে? শুধিয়ে জানলেম এদের বিক্রী করা হবে, আর এদের সঙ্গে-সঙ্গে যে বাগিচা বড় হতে-হতে প্রায় বন হয়ে উঠেছে—বনস্পতি যেখানে গভীর ছায়া দিচ্ছে, পাখী যেখানে গাইছে, হরিণ যেখানে খেলছে, সেই বনফুলের পরিমলে ভরা পুরোনো বাগিচাটী চষে ফেলে যাত্রীদের জন্য রন্ধনশালা বসানো হবে। আমার যন্ত্রণা-ভোগের তখনও শেষ হয়নি—তাই ডবল তালা-দেওয়া ঘর দেখিয়ে বল্লেম—এটাতে কি? পাণ্ডা আস্তে আস্তে ঘরটা খুল্লে, দেখলেম মিণ্টন আর বরণ কোম্পানির টালি দিয়ে অত বড় ঘরখানা বোঝাই করা। ভাঙার মধ্যে—ধ্বংসের স্তূপে, রস আর রহস্য, নীল দুটি হরিণের মতো বাসা বেঁধে ছিল,—সেই যে শোভা, সেই শান্তি মনে ধরল না আমাদের। ভাল ঠেকল দু'খানা চকচকে রাঙা মাটির টালি।

শিল্পে অধিকার জন্মালো না, চুপ করে বসে থাকা গেল—ঘেঁটে ঘুঁটে যা পেলাম তাই নিয়ে, সে ভাল। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো শিল্প-সংস্কার করতে হবে, কিম্বা দ্বিতীয় একটা অজন্তা-বিহার কিম্বা তাজমহলেরই একটা inspiration-এর চোটে অম্বলশূলের বেদনার মতো বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠ্‌লো, অমনি লাটিমের মতো ঘুরতে লেগে গেলাম বোঁ-বোঁ-শব্দে—শিল্প-সংস্কার, শিল্পের foundation stone স্থাপনের কাজে—এ হলেই মুস্কিল! যে ঘোরে তার ততটা নয়, কিন্তু শিল্প যেটা অনাদরে পড়ে রয়েছে এবং মানুষ যারা চুপচাপ রয়েছে নিজের ঘরে, তাদেরই ভয় আর মুস্কিল তখন! Inspiration অমন হঠাৎ আসে না! মনাগুনের জ্বালায়, অম্বলশূলের জ্বালায় ভেদ আছে। শিল্প-জ্ঞানের প্রদীপ হঠাৎ inspiration পেয়ে অমন রোগের জ্বালার মতো জ্বলে না, কাউকে জ্বালায়ও না, আগুন ধরিয়ে দিতে হয় সাবধানে—স্নেহভরা প্রদীপে, তবেই আলো হয় দপ্ করে। একেই বলে inspiration.

Inspiration কি অমনি আসে? অর্জন করলেম না, শিল্প-inspiration আপনি এলো ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্নের মতো, এ হবার যো নেই। আমাকে

প্রত্যয় না হয় তো এখনকার ইউরোপের মহাশিল্পী রোঁদাঁ কি বলেছেন দেখ—

"Inscription! ah! that is a romantic old idea void of all sense. Inspiration will, it is supposed, enable a boy of twenty to carve a statue straight out of the marble block in the delirium of his imagination; it will drive him one night to make a masterpiece straight off because it is generally at night that these things occur. I do not know why....Craftsmanship is everything; craftsmanship shows thoughtful work; all that does not sound as well as inspiration, it is less effective, it is nevertheless the whole basis of art!"

কিন্তু অর্জন নেই, inspiration এলো—গড়তে গেলেম তাজ, হয়ে উঠ্‌লো গম্বুজ; গড়তে গেলেম মন্দির, হয়ে পড়ল ইষ্টিসান বা সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া বেখাপ্পা কিছু! Inspiration এর খেয়াল ছোট বয়সে শোভা পায় আর শোভা পায় পাগলে।

শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্‌জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয় তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেননা শিল্প হলো 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা'; বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।

চুলোয় যাক্‌গে inspiration! সাধনা, অর্জনা ওসবে কি দরকার? টাকা ঢাললে বাঘের দুধও মেলে, শিল্প মিলবে না? কেনো ছবি, মূর্তি, বসাও মিউজিয়াম; খুলে দাও জাতীয় শিল্পের চেয়ার; সেখান থেকে তাপমান-যন্ত্রে প্রত্যেকের রসের উত্তাপের ডিগ্রি মেপে দেওয়া হোক্ ডিপ্লোমা; Library হোক রসশাস্ত্রের; স্কুল হোক্—সেখানে বসুক ছেলেরা চিত্রকারি, খোদকারি, নানা কারিগরি শিখতে; লিখতে লেগে যাক্ বড় বড় 'থিসিস' শিল্পের উপরে; ছাপা হয়ে চলে যাক্ সেগুলো ইংরাজীতে বিদেশে। আকাশের চাঁদকে পর্যন্ত ধরা যায় এমন বিরাট আয়োজন করে বসা যাক্, শিল্প সুড়্ সুড়্ করে আপনি আসবে। হায়, যে শিল্প বাতাসের ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁদকে সত্যিই ধরে এনে খেলতে দিচ্ছে মানুষকে, তাকে তলব দেবো এমনি করে? হুজুরের

www.bengaliebook.com

তলব মজুরের উপরে? আর সে এসে হাজির হবে দুয়োরের বাহিরে জুতো রেখে দুহাতে সেলাম ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে?

আমেরিকা তার কুবের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পৃথিবীর শিল্প সামগ্রী নূতন পুরাতন সমস্তই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেলো নিজের বাসায়। সেখানে সংগ্রহের বিরাট আয়োজন, চর্চারও বিরাট বিরাট বন্দোবস্ত, হাঁকডাকও বিরাট; কিন্তু সেখানে কল হলো, কারখানা হলো, আকাশ-প্রমাণ সব বাড়ী, যোজন-প্রমাণ সব সেতু আর বাঁধ উঠে বেঁধে ফেল্লে নায়াগ্রা নির্ঝর; কিন্তু সেই আয়োজনের পাহাড় এত উঁচু যে তার ওপারে কোথাও যে শিল্পীর আনন্দের নির্ঝর ঝরছে তা জানাই মুস্কিল হয়েছে তাদের—যারা আয়োজন করলে এত করে শিল্পকে জানতে! একথা আমার এক আমেরিকান বন্ধু জানিয়ে গেছেন—আমি বলছিনে।

আমি যখন আমার মনকে শুধোই—এই এত আয়োজন, এই ছবি, মূর্তির সংগ্রহ, এই লেক্‌চার হল, শেখবার studio, পড়বার লাইব্রেরি, এর প্রয়োজন কোন্ খানটায়? কেনই বা এসব? মন আমার এক উত্তরই দেয়—হয়তো কোথাও একটি আর্টিষ্ট পরমানন্দের একটি কণা নিয়ে আমাদের মধ্যে বসে আছে, অথবা আসছে, কি আসবে কোনদিন—সুন্দর যে ভাবে এসে অতিথি হয় বিচিত্র রস, বিচিত্র রূপ আর গান নিয়ে, ষড়্ ঋতুর মধ্য দিয়ে—তারি জন্যে এই আয়োজন, এত চেষ্টা।

যুগের পর যুগ ধরে আকাশ ঘনঘটার আয়োজন করেই চল্লো— কবে মেঘের কবি আসবেন তারই অ াশায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লণ্ডন সহরের উপরে কুহেলিকার মায়াজাল জমা হতেই রইলো—কবে এক হুইস্‌লার এসে তার মধ্য থেকে আনন্দ পাবেন বলে। পাথর জমা হয়ে রইলো পাহাড়ে পাহাড়ে—এক ফিডিয়াস্, এক মাইলোস্, এক রোঁদাঁ, এক মেণ্‌ট্রোভিফ ব্রেজেস্কা এমনি জানা এবং দেশের বিদেশের অজানা artistদের জন্য। মোগলবাদশার রত্ন ভাণ্ডারে তিন পুরুষ ধরে জমা হতে লাগলো মণিমাণিক্য সোনারূপা—এক রাজশিল্পীর ময়ূর-সিংহাসন আর তাজের স্বপ্নকে নির্মিতি দেবে বলে। তেমনি যে আমরাও আয়োজন করছি, চেষ্টা করছি, শিল্পের পাঠশালা, শিল্পের হাট, কারুছত্র, কলাভবন—এটা-ওটা

বসাচ্ছি সব সেই একটি আর্টিষ্টের একটি রসিকের জন্য—সে হয় তো এসেছে কিম্বা হয়তো আসবে।

শিল্পের সচলতা ও অচলতা

ছবি কবিতা অভিনয় যাই বল সেটা চল্লো কি না এই নিয়ে কথা। যে বীজের মধ্যে মাটি ঠেলে ওঠবার শক্তি না পৌঁছল সে বীজ ফল থেকে বেড়ে চলতে চলতে গাছ হতে চল্লো না, কবির ভাষা, ছবির ভাষা, গায়ক নর্তক অভিনেতা এদের ভাষার পক্ষেও ঐ কথা। যে ভাষা প্রয়োগ করছে সেই দেখছে মন দিয়ে লেখা তীরের মত সোজাসুজি চলে, কিন্তু অভিধান ইত্যাদি দিয়ে লেখা যতই ভারি করা যায়, শক্ত করা যায় ততই সে কচ্ছপের মতো আস্তে আস্তে চলে। অন্তরের শক্তি বীজকে ঠেলে নিয়ে চলে আলোর অভিমুখে রসাতল ভেদ করে', ভাষাকেও গতি দেয় পরিপুষ্টতার দিকে মানুষের অন্তর বা মনের গুণ। দু'একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি, মনের গুণ ভাষাতে গিয়ে পৌঁছয় এবং কাযও করে কতকটা—মনে যেখানে ছবি কি ছাপ পরিষ্কার নেই সেখানে ছবির রেখাপাত বর্ণবিন্যাস সমস্তের মধ্যে একটা আবল্য আলস্য অস্‌ফুটতা আমরা দেখতে পাই, কবিতার বেলায়ও এটা দেখি কথার মধ্যে যেন ঝোঁক নেই ঝিমিয়ে আছে আবল তাবল বকে চলেছে ভাষা—প্রথম উদাহরণ—

"ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা।
ছল ছল চক্ষু ছাড়ি ফাটেগো বন্ধনে
ছট ফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে।"

ভাষায় ত্বরা নেই ঝিমিয়ে চলেছে কেননা কবির মন এখানে 'ছ' অক্ষরের ফাঁকিটা লিখতে ছ-প্রমুখ বাক্যগুলোকে পটের সেপাইয়ের মতো খালি প্রতি ছত্রের গোড়াতে স্থির ভাবে দাঁড়াতে হুকুম করলেন, কাযেই কথাগুলো নড়াচড়া কিছুই করলে না, কাঠের সেপাই কাঠ হয়ে ভাষার চলার পথ আগলে রইলো। খুব খানিক ঝোঁক দিয়ে এটা পড়ে যেতে চেষ্টা করলেই

বুঝবে কতটা অচল এটা। অত্যাশ্চর্য অদ্‌ভুত রসের দেবতা হলেন ব্রহ্মা, তাঁর পুরী বর্ণন হচ্ছে—

“কিবা মনোহর দেখিতে সুন্দর
শোভে ব্রহ্মপুর সবার উপর।

কনক রচিত মৃত্তিকা শোভিত
পীযূষ পূরিত স্থির সরোবর॥
কল্পতরু তায় কিবা শোভা পায়
ফল ধরে যায় ধর্ম মোক্ষ আদি।
পত্র পুষ্প তার ভক্তি তত্ত্ব সার
কেহ নাহি আর তাহাতে বিবাদি॥”

মনের সমস্ত স্পর্শ ও সুরের সঙ্গে বিবাদ করে যেখানে বিবাদ বিসম্বাদ নেই এমন ব্রহ্মলোক বর্ণন হল—যেন সাত পুকুরের বাগান বাড়ীর ফটো্গ্রাফ, তাও আবার অনেক খানি ঝাপ্‌সা, একটু অদ্‌ভুত রস পাওয়া যায় শুধু যেখানে কল্পবৃক্ষ গাছের ডালে ধর্ম মোক্ষ আর ভক্তিতত্ত্বের আম কাঁঠাল পেকে পেকে ঝুলছে! ভাষা চোস্ত হলে কি হয়, কথাগুলোকে তীরের মতে চালিয়ে দেবে যে গুণ তারি পরশ ঘটলো না মোটেই কবিতাটায়।

খালি চোস্ত ভাষার দু একটা রূপ বর্ণন শুনিয়ে দিই, দেখ দেখি মনে গিয়ে পৌঁছয় কিনা—

“ভবজ অনুজরথ, তা তলে বিনতা সুত
কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে
হরি হরি সন্নিধানে অলি রস পূরে বাণে
রমণী মুনির মন বান্ধে।
খগেন্দ্র নিকটে বসি রাজেন্দ্র বাজায় বাঁশি
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরছায়
কুন্তীর নন্দন মূলে কশ্যপ নন্দন দোলে
মনমথ মনমথ তায়—’

মনে গিয়ে বাজলো না? আচ্ছা দেখ দেখি একটু মন দিয়ে—

"কিশোর বয়স মণি কাঞ্চনে আভরণ
ভালে চূড়া চিকন বনান
হেরইতে রূপ, সায়রে মন ডুবল,
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ।"

মনে ধরেও ধরছে না? শব্দভেদী বাণে কিছু হল না, ব্রহ্মাস্ত্রেও নয়, আচ্ছা এইবার উপরো-উপরি গোটা তিনেক শক্তি-শেল ছাড়ি, দেখি মনে পৌঁছয় কি না?

"জিমুনা গো মুক্রি জিমুনা—"

মন যে হরিণের মতো এগিয়ে আসছে! তাহলে সুর সন্ধান করা যাক্ মন দিয়ে এইবারে—

"মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা
শুণ শুণ পরাণের সই।
স্বপনে দেখিকু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারু নই।"

এইবার মন কি বলছে শুনতে পাচ্ছ কি?

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে ঘন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।"

এইবার নিজের মনকে ফিরে ডাক, এই উত্তর পাও কি না বল—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যউবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ।"

মুখে বলে’ যাওয়া আর মনের সঙ্গে বলে যাওয়া কথায় লেখায় চলায় ফেরায় অনেকখানি ধরণ ধারণ সমস্ত দিক দিয়েই যে তফাৎ হয় তা কে না বলবে! মন যে রচনাকে ফাঁকি দিয়ে গেল, তাকে খুব সব জমকালো বাক্য মন্ত্র মধ্যম তার স্বর অথবা বং চং ঢং ঢাং শব্দকোষ অলঙ্কার ব্যাকরণ ইত্যাদির কৃত্রিম উপায়গুলো দিয়ে খানিক চালানো যেতে পারে না যে তা নয়, কিন্তু রঙীণ কাগজে প্রস্তুত খেলানা প্রজাপতির মত খানিক উড়েই ঝুপ করে পড়ে’ যায়। এই যে কবিতাটা হচ্ছে ‘করুণাময়ীর গালবাদ্য’, নাম শুনেই মনে হয় এতে অনেকখানি সুর তাল ইত্যাদি পাওয়া যাবে; কবিতাটা আরম্ভ হলো ঐ ভাবে—‘গালবাদ্য ঘন ঘন’ কিন্তু এইটুকু বলেই কবি আন্-মন হলেন, বাক্যশক্তি হারালেন, সুরের তার যেন পটাং করে ছিঁড়ে গেল, শোন,—“গালবাদ্য ঘন ঘন সজল-লোচন।” কোথায় বাদ্য কোথায় কান্না অকারণে! তারপর পতন ভূমিতে হঠাৎ—‘গালবাদ্য ঘন ঘন, সজল লোচন, প্রণাম যেমন বিধি’,—এমন গালবাদ্য কবিতা এইভাবে মনের সঙ্গে বিযুক্ত, শুধু কথার মারপেঁচ অভিধান অলঙ্কার নিয়ে কতটা কৃত্রিমভাবে গড়ে উঠলো দেখ—

“গালবাদ্য ঘন ঘন সজল লোচন
প্রণাম যেমন বিধি
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রসীদ শঙ্কর বেদবিদাম্বর
কৃপাময় গুণনিধি!”

এইবাব সব ছেড়ে মনকে দিলেন কবি খালি শব্দ দিয়ে কিছু রচনা করতে, চমৎকার শব্দ দিলে ভাষা—

“মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা
ছলচ্ছল টলট্টল কলকলতরঙ্গা।”

মনকে কবি চলতি ভাষার বাহনে চড়িয়ে ছেড়ে দিলেন, ভাষা ঝড় বইয়ে চল্লো এবারেও—

"দশদিক অন্ধকার করিল মেঘগণ
দুনো হয়ে বহে উনোপঞ্চাশ পবন।"

পঞ্চাশ এই শব্দটা বাতাস ধূলো কাঁকর আর বৃষ্টির একটা ঝাপটা দিয়ে গেল, উনো দুনো শব্দ দুটো থেকে থেকে বাতাসের সুর শুনিয়ে গেল, তারপরে একে একে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নাম্‌লো চেপে—

"ঝনঝনার ঝনঝনি বিদ্যুৎ চকমকি
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি
ঝড় ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি।"

যদি আর্টিষ্টের মনের হাতে পড়ে, চলতি ভাষাও সাধু ভাষার বিনা সাহায্যেই এমন সুন্দর ভাবে চলতে পারে, তবে কালীঘাটের পটের ভাষাকে চলতি বলে তুচ্ছ করা তো যায় না। আর্টিষ্টের হাতে এই পটের ভাষা যে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না, তা কেমন করে বলা যায়! জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রকর হকুসাই এই পটের ভাষাতে যে চমৎকার চিত্র সব লিখে গেছেন তা আজকের ইউরোপ দেখে অবাক্ হচ্ছে। তাই বলি যে ভাষাই ব্যবহার করি না কেন, মনের হাতে তার লাগাম না তুলে দিয়ে তাকে চালিয়ে যাওয়া শক্ত। শব্দ সুর ছন্দ বাক্য রূপ ইঙ্গিত-ভঙ্গি—এরা ভাষাকে চালাবার মনকে বেঁধবার মহাস্ত্র বটে কিন্তু মনের হাতে এগুলো তুলে দেওয়া তো চাই। ধর ক্ষুরধার ছেনি ও গুরুভার হাতুড়ি নিয়ে বসা গেল পাষাণের অক্ষরে লিখতে, কিন্তু তার পূর্বে মন এঁচে নেয়নি কিছুই—বাটালি তেজে চল্লো, হাতুড়ি মহাশব্দে দিলে আঘাত; ফল হল, একটু পরে পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো, নয় তো পাথর থেকে বেরিয়ে এল মনের অনির্দিষ্টতা ও শূন্যতা!

বায়ু, যাঁর রূপ একেবারেই নেই ধ্বনি আছে, পদ নেই কিন্তু পদক্ষেপের চিহ্ন যিনি রেখে যান, অঙ্গ যাঁর দেখি না কিন্তু স্পর্শ করেন যিনি শীতল বা উষ্ণ, এই বায়ুকে রূপ দিয়ে নিরূপিত করা অন্যমনস্ক ভাবে তো যায় না। খালি ক্রিয়াপদ দিয়ে কখন পদ্য লেখা যায় না। কিন্তু এই ক্রিয়াপদ ছবিতে মূর্তিতে অভিনয়ে ঢের বেশি কাজ করে, কিন্তু এর সদ্ব্যবহার খুব পাকা আর্টিষ্টের দ্বারাই সম্ভব। রাফেল-প্রমুখ পুরাণো ইতালীর আর্টিষ্টরা ছবিতে

www.bengaliebook.com

বায়ু বইছে দেখাতে হলে আগে আগে ছবির আকাশপটে গোটাকতক গালফুলো ছেলে ফুঁ দিয়ে ঝাঁটার মতো খানিক ঝড় কি দক্ষিণ হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে এইটে আঁকতো, কিন্তু বায়ুর যথার্থ রূপ এমন চালাকি দিয়ে ধরা না ধরা সমান, ওটা ছেলেমান্‌ষি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারত-শিল্পের বায়ু দেবতার মূর্তি—তাও আমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের মতোই ছেলেমান্‌ষি পুতুল মাত্র। একই মূর্তি, একই হাবভাব, ভাবনার তারতম্য নেই। দেবমূর্তিগুলো তেত্রিশ কোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গিতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মুদ্রা ইত্যাদির। একই বিষ্ণু যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য! একই দেবীমূর্তি, মকরে চড়া হলেই হলেন তিনি গঙ্গা, কচ্ছপে বসে’ হলেন যমুনা! বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের রূপকল্পনার মধ্যে যে রকম রকম ভাবনার ও মহিমার পার্থক্য, গ্রীকমূর্তি আপোলো, ভিনাস, জুপিটার, জুনো ইত্যাদির মূর্তির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য তা ভারতের লক্ষণাক্রান্ত মূর্তিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মূর্তিকে একটু আসবাব রং চং আসন বাহন বদলে’ রকম রকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ু আর বরুণ, জল আর বাতাস দুটো এক নয়, দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে না। এ পর্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আর কেউ বায়ুকে সুন্দর করে, পাথরের রেখায় ধরেছে বলে আমার জানা নেই। এ মূর্তির একটা ছাঁচ আচার্য জগদীশচন্দ্রের ওখানে দেখেছি—গ্রীকদেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ভূমধ্য সাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ করছে—ছবি দেখে বুঝবে না, মূর্তিটা স্বচক্ষে দেখে এসো। এই যাঁর রূপ নেই অথচ ক্রিয়া আছে কথার ভাষায় সেই বায়ুকে দেবতাকে ক্রিয়া দিয়ে রূপ দিতে চেয়ে ঋষির মন যেমনি উদ্যত হলো বুক ফুলিয়ে, বাতাসের দুর্দমনীয় গতি পৌঁছলো অমনি ভাষায়; সে কতখানি তা ঋষির ভাষার অত্যন্ত বিশ্রী তর্জমাতেও ধরা পড়ে—“রথের ন্যায় যে বায়ু বেগে ধাবিত হন তাঁহাকে আমি বর্ণন করি, বজ্রধ্বনির ন্যায় ইঁহার ধ্বনি আবার ইনি বৃক্ষসমূহ ভগ্ন করিতে আসেন, ইনি দিক্‌ বিদিক্‌ রক্তবর্ণ করিতে করিতে শূন্যপথে গমনাগমন করেন, ধরণীর ধূলি বিকীর্ণ করিতে করিতে চলিয়া যান, পর্বতাদি যে কিছু স্থির পদার্থ তাহারা বায়ুর গতিবশে কম্পমান হইতে থাকে এবং ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে

যায় তদ্রূপ এই বায়ুর প্রতি অভিগমন করে।” যুদ্ধের ঘোড়ার গতি নিয়ে কালিদাসেরও মনের ভাষা বার হয়েছিল বর্ষা-বর্ণনে—

“সসীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমদলঃ।”
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতি র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে॥

এই মনের উদ্দামগতি বাংলা ভাষাকেও তেজে চালিয়ে নিলে—

“ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে,
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা॥”

সারথির মানস রাশের মধ্য দিয়ে যেমন ঘোড়াতে গিয়ে পৌঁছয় তেমনি মনের ভাবনার সামান্য ইঙ্গিতও ভাষার মধ্যে দিয়ে চলাচল করে, তা সে ছবির ভাষা কবির ভাষা বা অভিনেতার কি গায়কের বা নর্তকের ভাষা, যে ভাষাই হোক। “The art of painting (নিরূপণ ও বর্ণনা-শিল্প সমস্তই) is perhaps the most indiscreet of all arts”—বাচন করা চলে ঢেকে ঢুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, কিন্তু বর্ণন করা চলে না সে ভাবে, যেমন, মেয়েটি কালো কিন্তু তার ঘটকালীটারও লোভ আছে বলে’ কন্যাকে ‘শ্যামাঙ্গী’ বলে’ বাচন করা গেল, কিন্তু তুলনায় বর্ণন করতে হলে মনের ভাব গোপন থাকা শক্ত, ধরা পড়ে যায় ঘটক। কথার যেটুকু বা বাচন করবার ফাঁক আছে ছবির তাও নেই; হুবহু বর্ণন, নয় মিথ্যা বর্ণন, দুই রাস্তা ছাড়া ছবির গতি নেই। ফটোগ্রাফ মেয়ের কালো রংটার বেলায় ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে, ছবি কিন্তু পারে না। সত্যি বলতেই হয় মনকে ছবিতে ধরবার বেলায়, এই জন্যই বলা হলো—“It is an unimpeachable witness to the moral state of the painter at the moment when he held the brush (শতং বদ মা লিখ) all the shades of his nature even to the lapses of his sensibility all this is told by the painter’s work as clearly as if he were telling it in our ears.”—Fromentin

হাওয়া যেখানে নেই সেখানে শব্দ হয় না, জ্বালালেও আগুন ধরে ন, আলো যেখানে নেই রূপ সেখানে থেকেও নেই, তেমনি মন যেখানে নেই কথা সেখানে থেকেও নেই, মনে বেদন এল, নিবেদন হ'ল তবে ছবিতে কবিতায় নাট্যে। মন কার নেই? কিন্তু মনের কথা গুছিয়ে বলার ক্ষমতা যার তার নেই এটা ঠিক। ছাত্র পরীক্ষার দিনে খুব মনের আবেগ ও মনঃসংযোগ দিয়ে লিখছে; সে মন এক, আর সেই ছাত্রই দেশে গিয়ে যাত্রা জুড়েছে, কি মাঠে বসে মন দিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে, সে মন অন্য প্রকার। তেমনই সাধারণ মন আর রসায়িত মন, কবির মন আর্টিষ্টের মন আর তাদের হুঁকোবরদারের মন ও মনের আবেগে তফাৎ আছে। খুব খানিক মনের আবেগ নিয়ে লিখে কিম্বা বলে কয়ে চল্লেই কবি চিত্রকর অভিনেতা হয় তা নয়। অভিনেতা যদি মনের আবেগে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো রুদ্রমূর্তিতে বেরিয়ে সত্যই দ্বিতীয় অভিনেত্রীর গলা কেটে বসে, তবে তাকে নট বলবে, না পাগল, মুর্খ এসব সম্বোধন করবে দর্শকরা! কিম্বা রঙ্গমঞ্চের নাচে দর্শকদের মধ্যে কেউ যদি মনের আবেগে মুগ্ধ হয়ে হঠাৎ কোমর বেঁধে নানা অঙ্গভঙ্গি সুরু করে দেয় তবে তাকে নটরাজ বলে' ডাকে কেউ! অভিনেত্রী বেশ তাল লয় সুর দিয়ে কেঁদে চলেছে, হঠাৎ উপরের বক্স থেকে আবেগভরে ছেলে-কাঁদা ও ঘুম-পাড়ানো সুরু হলো, তার বেলায় শ্রোতারা ধমকে ওঠে কেন ছেলেকে ও ছেলের মাকে? মনের আবেগ তো যথেষ্ট সেখানে ভাষায় প্রকাশ হচ্ছিল কিন্তু বলে তো চল্লো না সেটা! তবেই দেখ শিল্পের অনুকূল আর তার প্রতিকূল এই দুই রকম মনের পরশ রয়েছে। মালি যেমন বেছে বেছে ফুল নেয়, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুলের তোড়া ফুলের হার গাঁথে, শিল্পীর মনের পরশ ঠিক সেইভাবে কায করে যায় বাক্য রং রেখা ভঙ্গি ইত্যাদিকে ভাবের সূত্রে ধরে' ধরে'। নিছক আবেগের উচ্ছৃঙ্খলতা আছে, সংযম নির্বাচন এসব নেই। ছেলে কাঁদার ঠিক উল্টো যে পাকা নটীর কান্নার সুর কৃত্রিম সুরে হলেও সেটা মনোরম হয় শিল্পীর বর্ণন ভঙ্গি নির্বাচন ইত্যাদি নিয়ে। বাষ্পের মতো শুধু খানিক আবেগের সঞ্চয় নিয়ে ছবি বল আর লেখাই বল শিল্প বলে' যে চলে না তার নমুনা এই—

"কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে,
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে!

www.bengaliebook.com

শ্যাম কেশ পক্ক হবে,
ক্রমে সব দন্ত যাবে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছুদিনে;
লোল চর্ম্ম কদাকার
কফ কাশ দুর্নিবার,
হস্ত পদ শিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।”

এর জুড়ি মূর্তি কতকটা সেই গান্ধারের কঙ্কালসার বুদ্ধ। জীবনকে কুশ্রী আর দীনতা দিয়ে যে শিল্পী নয় কবিও নয় তার ভাবা বিকট রকমে বীভৎসরূপে দেখালো। যাকে বলে inartistic reality তাই, এইবার যিনি কবি তিনি কি সুন্দর করে বল্লেন ঐ কথাটাই দেখ, এও reality কিন্তু কুশ্রী নয়, artistic reality যাকে বলে তাই—

“মন তুমি কি রঙ্গে আছ, ভোলা মন, রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ,
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ঘোরা ফেরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ।

রং‌এর বেলা রং‌এর কড়ি, সোণার দরে তাও কিনেছ
দুখের বেলা রতন মাণিক মাটির দরে তাও বেচেছ।
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সে রূপে মন মজে অাছ
যখন সে রূপ হইবে বিরূপ, সে রূপের কি রূপ ভেবেছ!”

“…There is true and false realisation, there is a realisation which seeks to impress the vital essence of the subject and there is a realisation which bases its success upon its power to present a deceptive illusion.”—(R. G. Hatton)

কাঁচা অভিনেতা realismএর পথে গিয়ে নাটকের বিষয়টাকে তর্জন গর্জন করে’ যেন দর্শকের নাকের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চলে, আর পাকা অভিনেতা শিল্পীর সংযম নিয়ে সেই বিষয়টাই দিয়ে যায় অথচ ফল হয় তাতে বেশি দর্শকের উপরে। এইজন্যই ঋষিরা বলেছেন, বাক্যকে মনের সঙ্গে যুক্ত কর—‘কায়েন মনসা বাচা’ ছবি লেখ কথা বল অভিনয় কর, সাফল্যলাভ করতে বিলম্ব হবে না। কথা তো বলতে পারে সবাই, চলেও

সবাই রঙ্গে ভঙ্গে, ছবিও লেখে অনেকে, কিন্তু ভাষাকে পায় না সবাই— "যেমন প্রেম-পরিপূর্ণা সুন্দর-পরিচ্ছদধারিণী ভার্যা আপন স্বামীর নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন তদ্রূপ বাগ্‌দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েন।" বাগ্‌দেবীর দেহ মন অতি বিচিত্র ভাষা সমস্ত নিয়ে যার কাছে অপ্রকাশিত রইল হাজারখানা nude studyতে তার কি ফল হবে? লজ্জার আবরণ ছেড়ে দিয়ে আধুনিক nude ছবির যে ভাষা, আর পাথরের অন্তঃপুর ছেড়ে নিরাবরণ নিরাভরণ বেরিয়ে এসেছিল গ্রীক ও ভারত শিল্পীর যে দেবীর মতো অনবগুণ্ঠিতা সুন্দরী তার যে ভাষা, দুয়ের কতখানি তফাৎ রয়েছে reality আর ideality নিয়ে বুঝে দেখ। ছবিকে কেবলি দেখা ও ভোগ করার রাজত্ব থেকে কথা ও ভাষার কোঠায় টেনে আনার সম্বন্ধে সবার মত হবে না। তাঁরা বলেন—কথা বল কবিতা বল উপকথা বল তার তো স্বতন্ত্র রাস্তা; আর্ট বর্ণমালার পুস্তক, নীতিশাস্ত্র কিম্বা কথামালা হতে বাধ্য নয়, একে সৌন্দর্য ও তার অনুভূতির রাস্তাতে চালানই ঠিক! একথা মানতেম যদি রূপের জগতে এমন বিশেষ পদার্থ একটা থাকতো যে নির্বাক নিশ্চল। বিন্দু, সে বলে আমি চোখের জল, শিশির-ফোঁটা, কত কি! মৃত্যু, সেও বলে আমি চলেছি আর ফিরবো না, গভীর সান্ত্বনা আমি, নিদারুণ আমি, সকরুণ আমি। ফুলের সঙ্গে ফুলদানীটাও যদি কথা না কইতো তবে কি তারা মানুষের মনে ধরতো? নির্বাক যে সেও ইঙ্গিতে বলে—আমি বলতে পারছিনে মন কি করছে! অবোধ যারা তারাই কেবল বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক অদ্‌ভূত আর্টের কল্পনাজাল বুনে বুনে নিজেকে ও নিজের শিল্পকে গুটির মধ্যে গুটিপোকার মতো বদ্ধ করে রাখতে চায়। শিল্প যে আনন্দ দেয় সেই আনন্দই তার ভাষা—আনন্দ-কাকলী আনন্দের দোলা—

"কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ!
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ।"

মহাশূন্য, তার নিজের বাক্য দিয়ে সেও পরিপূর্ণ রয়েছে! বাক্যকে ছেড়ে চলতে পারে কি! বেদের বাগ্‌দেবীর উক্তি কি মহিমা নিয়ে অভ্রভেদী একটি মূর্তির মতো আপনাকে প্রকাশ করেছে দেখ—"আদিত্যগণ বিশ্বদেবতাগণ রুদ্রগণ এবং বসুগণের সহিত আমি বিচরণ করিতেছি। মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বীদ্বয়কে আমি ধারণ করি। প্রস্তরাঘাত হইতে উৎপন্ন যে

সোমরস তাহাকে তষ্টাকে পুষণকে ভাগকে আমি ধারণ করি……যজ্ঞোপযোগী উপকরণ-সমূহের মধ্যে প্রথমা আমি।…এতাদৃশা আমাকে দেবতারা নানাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, অপরিমেয় আমার আশ্রয়স্থানে তাবৎ প্রাণিগণের মধ্যে আমি আবিষ্ট আছি।……যিনি দর্শন করেন প্রাণ ধারণ করেন কথা শ্রবণ করেন তিনি আমারই সহায়তাতে সেই সকল কার্য করেন……আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি……আমি আকাশকে প্রসব করিয়াছি…সমুদ্রের জলের মধ্যে আমার স্থান, সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই; আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি। আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা বৃহৎ হইয়া দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে…॥"

বিরাট এই বিশ্বচরাচর, যার প্রাণী বিশাল, অতি বৃহৎ যার রূপ, তার এই মূর্তি! অতি পুরাতন ঈজিপ্টের ভাস্কর কঠিন প্রস্তরে যে বিরাটত্ব আর বিশালত্ব দিয়ে আপনার দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করেছে তারি তুল্য-মূল্য শিল্প এই স্তোত্র-রচনার ভাস্কর ভাষা দিয়ে ধরে রেখেছে। এর পাশে রঙীণ রাংতা জড়ানো পাকাটির বীণা হাতে আমাদের এখনকার খেলার সরস্বতীর মূর্তিটি ধরে দেখ কিম্বা একটা তুলসী-মঞ্চের উপরে সাজানো শ্বেত পাথরের এতটুকু ভিনাস মূর্তিকেও ধরে দেখ, মূর্তি-শিল্পের ভাষা হিমালয়ের ঊর্ধ্ব থেকে উইটিবিতে এসে পড়ে কি না! চটক এবং চাকচিক্যময় ক্ষণিক পদার্থটার উপভোগের অনিত্যতার উপরে, কিম্বা ক্ষণিক শ্রুতিসুখ দৃষ্টিসুখ ইত্যাদির উপরে শিল্পরচনার ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করলে বাণীকে নামিয়ে দেওয়া হয় আকাশ থেকে রসাতলে, যেমন—

"… রূপ নিরুপম সোহিনী
শারদ পার্ব্বণ—বিধুবরানন, পঙ্কজ কানন মোদিনী।
কুঞ্জর-গামিনী-কুঞ্জ-বিলাসিনী, লোচন খঞ্জন-গঞ্জিনী।
কোকিল নাদিনী, গীঃ পরিবাদিনী, হ্রীঃ পরিবাদ-বিধায়িনী।
ভারত-মানস মানস-সরস, বাস বিনোদ বিধায়িনী।"

এর থেকে আর একটুখানি নামলেই কেবল সুর সার বাক্য রেখা রং ইত্যাদি দিয়ে মনের চোখে কানে সুড়সুড়ি দেওয়া—

"নাহি তালবোধ ভাল, নিত্য ধ্বংস কারক।
চিত্ত মর্ম্ম, ধর্ম্মকর্ম্ম, মর্ম্ম বোধ জারক।"

চতুরশীতি লক্ষ জন্মের তপস্যালব্ধ জীবনটা নিয়েই মানুষ যখন ছিনিমিনি খেলে বেড়াচ্ছে, তখন যুগযুগান্তরের তপস্যা দিয়ে কত মহৎ জীবনের ব্যর্থতার দুঃখ থেকে সার্থকতার আনন্দ দিয়ে লাভ করা ভাষাসমূহকে নিয়ে মানুষ যে নয়-ছয় করে খেলা করবে তার বাধা কি? শিল্পরূপিণী সুন্দরী ভাষাকে পেতে তপস্যার দুঃখ আছে—"art interprets the mightier speech of nature. It is a poetical language for it is an utterance of the imaginated addressed to the imaginated and to rouse emotion"—(Gilbert)

অনাহতের ধ্বনি ব্যক্ত করে যে ভাষা, অরূপের ইঙ্গিত ও রূপ দর্শন করার যে ভাষা, নিশ্চল নির্বাক পাষাণকে চলায় বলায় যে ভাষা, তাকে বিনা সাধনায় মনে করলেই কি কেউ পেয়ে থাকে! ভাষা যখন তপোবনের ঋষিদের তপস্যার সামগ্রী, তখন তারা যে কোন দুর্ভেদ্যতার দুর্গ থেকে বাণীকে জয় করে' এনেছিলেন তা তাঁরা জানিয়ে গেছেন—"সোমরস নিপীড়ন করিতে করিতে এই প্রস্তর সকল কথা কহুক, আমরাও কথা কহি, ইহারা কথা বলিতেছে, ইহাদের কথায় কথা কও...ইহারা শব্দ করিতেছে......ইহাদের শব্দে পৃথিবী ধ্বনিত হইতেছে...ইহাদের শব্দ শুনিয়া জ্ঞান হয় যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করিতেছে......তৃণভূমিতে কৃষ্ণসার হরিণেরা যেন চলাচল করিয়া নৃত্য করিতেছে......সোমরস নিপীড়ন-কালে প্রস্তরেরা শব্দ করিতেছে, যেন ক্রীড়াভূমিতে ক্রীড়াসক্ত শিশুরা জননীকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া কোলাহল করিতেছে।" ভাষার তপস্যায় বলীয়ান্ মানুষ পাথরের কারাগার থেকে বার করে' নিয়ে এলো যে ভাষাকে, চিরসুধাময়ী রসের নির্ঝরিণী তারি চতুঃষষ্টি ধারা হ'ল—কথা, ছবি, মূর্তি, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি কলাবিদ্যা।

সন্ধ্যার উৎসব

"আশ্বিনে অম্বিকা পূজা বলি পড়ে পাঁঠা,
কার্ত্তিকে কালিকা পূজা ভাই-দ্বিতীয়ার ফোঁটা।
অঘ্রাণে নবান্ন দেয় নতুন ধান কেটে,
পৌষ মাসে বাউনী বাঁধে ঘরে ঘরে পিঠে।
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতে খড়ি,
ফাগুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।
চৈত্র মাসে চড়ক সন্ন্যাস গাজনে বাঁধে ভারা,
বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে দেয় বসুধারা।
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীবাটা জামাই আনতে দড়,
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা যাত্রী হয় জড়।
শ্রাবণ মাসে ঢেলা ফেলা ঘি আর মুড়ি,
ভাদ্র মাসে পচা পান্তা খায় মনসা বুড়ি।"

এই তো আছে বার মাসই। এর উপর ফাঁকে ফাঁকে আরো উৎসব এখন ঢুকেছে। যেমন শোক-সভার উৎসব, স্মৃতি-সভার উৎসব,—এ-যে সভার সাম্বৎসরিক উৎসব। এর উপরে জেলে যাবার উৎসব, হরতালের উৎসব তাও আছে ঘরে বাইরে। যে দেশে এত উৎসব সে দেশের ছেলেরা, বুড়োরা, যুবোরা—আনন্দ সাগরের কুলে গিয়ে ওঠার কথা তো তাদের এতদিন। কিন্তু আনন্দের বদরিকাশ্রম দূরের কথা—এই অফুরন্ত আনন্দের মাঝে একটু চড়া পড়ে গেছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। এ এক রকম আনন্দের ভাসান—ভাঙ্গা নৌকার কাঠ ঠিক এই ভাবে চলে স্রোতে গা ভাসিয়ে, কোথায় যায় সে তা নিজেই জানে না। একই তালে চলে সে দুলতে দুলতে, চলার তার বৈচিত্র্য নেই লক্ষ্য নেই কেবলি জোয়ারে খানিক এগিয়ে চলা ভাঁটায় আবার দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসা যেখানকার সেখানে। জীবন্ত জিনিষের উৎসব করে চলার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে। ঋতু-চলাচলের সঙ্গে কালের চলাচলের সঙ্গে গাছ পালারা তাল মিলিয়ে চলে। গাছের পাখী আকাশের মেঘ, সকাল-সন্ধ্যার গ্রহ-তারা তাল মিলিয়ে চলে। না হলে হয় বেতালা—বেতালে উৎসব মাটি হয়। কালভেদে দেশভেদে বিভিন্ন রকমে উৎসব করে' চলার রহস্যটি পেয়েছে মানুষ এই পৃথিবীতে এসে—গাছেদের কাছ থেকে আকাশের কাছ থেকে এবং যে মাটিতে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তার

কাছ থেকে। মাটির বুকের তালে তাল রেখে যে চলতে পারে না, সে খুঁড়িয়ে চলে কিম্বা পড়ে যায় ধুপ্ করে মাটিতে। বাতাসের তালে তাল দিয়ে চলতে যে পাখীর ডানা না চায় সে উঁচুতে উড়তে পারেই না। ডানা ঝট্‌পট্ করে' হয় মরে' যায়, নয় তো পাখী থাকে না, খাঁচায় বাঁধা পড়ে। খায় দায় আর বনের দিকে চায়—"খায় দায় পাখীটি বনের দিকে আঁখিটি"। এই ভাবে অবিচিত্র দিনের অনুৎসবের অনুৎসাহের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একদিন তার পক্ষিলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। জীয়ন্তে মরা থেকে মুক্তি পেয়ে সে শেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। খাঁচার পাখী পড়তে বল্লে পড়ে, শিষ দিলে গান গায়; কিন্তু তাতে বলতে পারিনে পাখী উৎসব করেছে। তেমনি হুকুম মতো হয় হস্‌টেল বল আর হস্‌টেলের বাইরেই বল আমাদের উৎসব—এইবার পড়, এইবার গাও, এইবার খাও, এইবার সভার রিপোর্ট দাও, এইবার শোক প্রকাশ কর, এইবার স্মৃতি রক্ষা কর— এইভাবে দেশযোড়া একটা খাঁচার মধ্যে আমাদের নিয়ে কে যে খেলাচ্ছে তা বুঝিনে। শুধু বুঝি সুর লাগছে না, তালে ঠিক পা পড়ছে না, কোন রকমে চলেছি—হুকুমে উঠে'-বসে' পড়ে'-শুনে' হেসে'-খেলে'। আমাদের ছেলে-বুড়োর শিক্ষা-দীক্ষা উন্নতি অবনতি নিয়ে কত বিষয়ে কতদিকে লোক কত মাথা ঘামাচ্ছে এবং তাতে তারা আনন্দও পাচ্ছে। পাখী পড়িয়ে আনন্দ, পাখীকে শিষ দিয়ে ডেকে গাইয়ে আনন্দ, খাইয়ে আনন্দ, শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আনন্দ, কিন্তু পাখীর কিসে আনন্দ তা তো দেখে না কেউ। দাঁড়ের পাখীর কোন আনন্দ নেই শিকল কাটার আনন্দটুকু ছাড়া, এটা তো কর্তারা বোঝে না—বড় বড় রিপোর্ট লিখে চলে খাঁচার পাখীর সু ও কু ব্যবহার সম্বন্ধে এবং তাতেই তারা আনন্দ পায়। বারোমাস বেঁধে মার দিয়ে পাঁজিপুঁথি দেখে ছুটি নেওয়া গেল উৎসব করতে। এ যে আজকের নিয়ম হয়েছে তা নয়; এ নিয়ম এ দেশে বরাবরই চলে আসছে। বসন্তের হাওয়া না লাগলেও বাসন্তী পূজো পাঁজির ঠিক দিন ক্ষণ দেখে আসছে দেশে বছরের পর বছর কত যুগ ধরে' তার ঠিক নেই। যদি বল বসন্তের ঋতু সেও তো ঠিক মাস ধরে' আসে। আসে বটে, কিন্তু পাঁজির গণনা কিম্বা ঘড়ির কাঁটা ধরে' আসে না। বরাবর দেখি গাছের পাতাগুলো হঠাৎ সবুজ হয়ে ওঠে, হঠাৎ কোকিল পাপিয়া দূরদেশ থেকে এসে গান ধরে। উত্তর থেকে বাতাস ফিরে যায় দক্ষিণে হঠাৎ, আবার চলেও যায় হঠাৎ, বসন্তকালের আসর ভেঙ্গে যায়, ফুলের ডালা নুয়ে পড়ে, রোদ

ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, নদী শুকিয়ে ওঠে, আকাশে আগুন লেগে যায় দেখতে দেখতে। দিন যেন আর কাটে না। যখন তখন হঠাৎ আকাশ ঢেকে মেঘ আসে ঝড় আসে বাতাস বয় ঢল নামে নদীতে। আনন্দের বন্যা ছোটে বর্ষা নামে জল ঝরে জল-ঝড়ে। তারপর আকাশ হঠাৎ নীল চোখ মেলে চায় পৃথিবীর দিকে। সোনায় লেখা সবুজ সাড়ি পরে পৃথিবী চলে দিগন্তে উৎসব করতে, তারপর শিশির ঝরে পাতায় পাতায়, হিমের পরশ লাগে, শিউরে ওঠে বাতাসের মন অচেনা হাতের ছোঁয়া পেয়ে, কোকিল গান ধরে—উহু উহু। এই উৎসব তো হচ্ছে ফিরে ফিরে কতকাল কিন্তু এ তো তবু পুরোনো হয় না অবিচিত্র হয় না, বেসুরো বেতালা হয় না আমাদের বারো মাসে তেরো এবং তার চেয়ে বেশি পার্ব্বণের উৎসবের মতো। এ যে প্রকৃতির উৎসব বা প্রকৃত উৎসব, এ নিত্যকাল ধরে চলেছে, চলবে ঋতু চক্রের চিহ্ন ধরে। সে কেন নতুন নতুন কবিকে নতুন নতুন শিল্পীকে নতুন শোভা নতুন রস দিয়ে মুগ্ধ করে, চলে—তার কারণ সন্ধান করে দেখি যে, উৎসব যা হ'চ্ছে তা স্বাভাবিক। তার মধ্যে নিয়ম একটা আছে কিন্তু বিচিত্রতায় সেটা ঢাকা। সেই নিয়মের ঠাট এমন ভাবে লুকানো থাকে যে বোঝাই যায় না। উৎসবের ধারার হিসেব আজ যেটা নিলেম সেটা কাল আবার তেমনি ভাবে থাকবে কি না, কিম্বা আমি যেমন হিসেবটা দেখলেম অন্যের চোখে উৎসবটার হিসেব সেই ভাবে পড়বে কি না তা বলা যায় না। এই হ'ল স্বভাবের নিয়মে উৎসবের রহস্য। কিন্তু মানুষের উৎসবের আমরা যে ভাবে নিয়ম বেঁধে দিয়েছি, তাতে করে' ঐ অম্বিকা পূজা থেকে মনসা পূজার আনন্দ যেমন আজকের আমাদের কাছে পুরোনো হয়ে পড়ছে, আমাদের এখনকার উৎসবগুলোও ঠিক সেই দশা পাবে, পেয়ে বসে' আছে। দপ্তরীর বাড়ির রুলটানা খাতার শোভা খাতার প্রথম পাতা দেখলেই বোঝা গেল, আর দেখতে হয় না নিরেনব্বই খানা পাতায় কি আছে। কিন্তু ভাল গল্পের বই, তারও সোজা ফর্মাবাঁধা হিসেবমতো চেহারা, কিন্তু বিচিত্রভাব বিচিত্র রস এসে তার প্রত্যেক পৃষ্ঠা রহস্যপূর্ণ ও বিচিত্র করে' দেয়, কোন বই এক পাতা উল্টেই ফেলে দিই কোনটা বা শেষ হয়ে গেলেও ভাবি আরো হ'লে হ'ত। ভাল গানেও এই, বার বার শুনলেও মন চায় আবার শুনি, ভাল ছবি, তার বেলাতেও এই; এবং সব প্রকৃত জিনিষের মধ্যে এই গুণটি আছে। এবং এই জন্য বাঙলার ইতিহাসের চেয়ে ভাল বাঙলা উপন্যাস ছেলে মেয়েরা

কিনে পড়ে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে। হস্‌টেলের কেউ ভাল নভেল কিনলে কিছুদিন ধরে' সন্ধ্যেবেলা একটা যেন উৎসব পড়ে' যায় সেখানে। আবার নভেল পড়া এবং উৎসব করা দুই যখন বাতিকে দাঁড়ায় তখন আর ভালমন্দ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না—একটা কিছু হ'লেই হ'ল এই ভাব দাঁড়ায় তখন। আমাদের সমস্ত কাণ্ড-কারখানা আমোদ-আহ্লাদ যেমন-তেমন হ'চ্ছে, যেমনটি হওয়া উচিত তেমনিটি হচ্ছে না; তার কারণ উৎসবের বাতিক চেগেছে এমন বিষম রকম—দেশে যে উৎসবের বাতি কেমন জ্বল্লো সেদিকে নজর দেবার সময়ই নেই। সময়ে সময়ে দেশে মরার ও জেলে গিয়ে পচবার উৎসব পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাতিক চাগে আমাদেরও মরালোকের শ্রাদ্ধ বাসর সাজাবার এবং জেলের মধ্যে দুগ্‌গোপূজো লাগাবার। উৎসাহটাই যে উৎসবের জনয়িতা তা তো নয়, রক্ত যখন অতিরিক্ত রকম উৎসাহে চলাচল করছে মস্তিষ্কে— তখন বুঝতে হবে জ্বর এল বলে', নয় জ্বরের চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটলো বলে'। হঠাৎ খেয়াল হ'ল একটা সাম্বৎসরিক কি সম্মিলনী কি আরকিছু খুব ধূমধামে করতে হবে, তখনি ছুটোছুটি পড়ে গেল বক্তা ধরতে ষ্টেজ বাঁধতে, বাদ্যি জোগাড় করতে। এ তে স্বাভাবিক অবস্থার কায নয়। স্বভাবের নিয়মে বসন্ত কালের উৎসব মনে হয় বটে হঠাৎ সুরু হ'ল, কিন্তু এটা ভুল্লে চলবে না যে কোকিলকে এই উৎসবে আসতে হবে বলে' ফাল্‌গুন মাস আসবার দশ এগারো মাস আগে থেকে সে গলা সাধছিল এমন গোপনে যে বাতাসও টের পায়নি। গাছগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে শীতকাল ভোর পাতা ফুল কত কি জোগাড় করে' রেখেছে। উৎসবের ঢের আগে বসে' যায় বোধন, তাই সুন্দর হয় উৎসব এবং তার রেশ চলে অনেক দিন ধরে' বাতাসের মধ্যে ঝরা বাসি ফুলের সৌরভের মতো। এই স্বাভাবিক ছন্দে যে উৎসব হয় সেই উৎসব ঠিক উৎসব, শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই স্বাভাবিক অবস্থা না পেলে দেশে উৎসবের বাঁশি বাজবে না বাজবে না' তা যতই কেন ফুলুটে ফুঁ দাও না, যতই কেন হারমোনিয়মের হাপর জোরে টিপে সুরের আগুন জ্বালাতে চাও না। বাঁশী বলবে না বাতি জ্বলবে না। সন্ধ্যার উৎসব আরতিটা এমনতরো হঠাৎ আয়োজন তো নয়, সেখানে সারাবেলার আয়োজন মেলে গিয়ে সারা রাতের আয়োজনের সঙ্গে। আকাশে তাই তো অতখানি রং লাগে, বাতাসে অতটা সুর ভরে—

দিনে রাতে মিলিয়ে দেওয়ার গান
রংএ রংএ
ওই আকাশে লুকিয়ে ভাসে
বাতাস ব'য়ে সেই তো আসে,
বাঁশী ডাকে
দেয় সে ধরা সুরে সুরে।
এই বাতাস এ লুকিয়ে রাখে
বেণু বনের তলায় তলায়
আলো ছায়ায় মিলিয়ে দেওয়া গান,
বাঁশী তারে ধরে সুরের ফাঁসে
এই বাতাসে।

সৌন্দর্যের সন্ধান

সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেরই মনে ধরার সম্পর্ক, আর অসুন্দরের সঙ্গে হ'ল মনে না ধরার ঝগড়া। ইমারতে ঘেরা বন্দিশালার মতো এই যে সহরের মধ্যে এখানে ওখানে একটুখানি বাগান, অনেকখানিই যার মরা এবং শ্রীহীন, এদের পাখী প্রজাপতির মনে ধরেছে তবেই না এরা এই সব বাগানে বাসা বেঁধে এই ধূলোমাখা রোদে সকাল সন্ধ্যে ডানা মেলে সুরে ছন্দে ভরে' তুলছে সহরের বুকের আবদ্ধ অফুলন্ত স্থানটুকু! আর এই সব বাগানের ধারেই রাস্তায় বসে' খেলছে ছেলেরা—শিশুপ্রাণ তাদের মনে ধরেছে বাগানের ফুলকে ছেড়ে রাস্তার ধূলো মাটি, তাই তো খেলছে ওরা ধুলোকে নিয়ে ধূলোখেলা! রথের দিনে রথো সামগ্রী—সোলার ফুল পাতার বাঁশি—তার সুর আর রং আর পরিমল ছড়িয়ে পড়েছে বাদলার দিনে—রথতলার আর খেলাঘরের ছেলে বুড়োর মেলায়, তাই না আজ দেখছি নিজেদের ঘর সাজাচ্ছে মানুষ সোলার ফুলে মাটির খেলনায়! তেমনি সে আমার নিজের কোণটি, দেওয়ালের ফাঁকে ভাঙ্গা কাচের মতো এক খণ্ড আকাশ—ময়লা ঝাপ্‌সা প্রাচীরে ঘেরা চারটিখানি ঘাস চোর-কাঁটা আর দোপাটি ফুলের খেলাঘর, সবই মনে ধরেছে আমার, তাই না কোণের দিকে মন থেকে থেকে দৌড় দিচ্ছে, চোর-কাঁটার বনে লুকোচুরি খেলছে, নয় তো দোপাটি ফুলের

রং এর ছাপ নিয়ে লিখছে ছবি, স্বপন দেখছে রকম রকম, আর থেকে থেকে ঠিক নাকের সামনে মাড়োয়ারিদের আকাশ বাতাস আড়াল করা তেতলা পাঁচতলা বাড়ীগুলোর সঙ্গে আড়ি দিয়ে বলে' চলেছে বিশ্রী বিশ্রী বিশ্রী! মাড়োয়ারি গৃহস্থরা কিন্তু ওদের পায়রার খোপগুলোকে সুন্দর বাসা বলেই বোধ করছে এবং তাদের নাকের সামনে আমাদের সেকেলে বাড়ী আর ভাঙ্গাচোরা বাগানকে অসুন্দর বলছে! কাযেই বলতে হবে আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতকে সুন্দরই দেখি। কারু কাছ থেকে ধার করা আয়না এনে যে আমরা সুন্দরকে দেখতে পাবো তার উপায় নেই। সুন্দরকে ধরবার জন্যে নানা মুনি নানা মতো আরসী আমাদের জন্যে সৃজন করে গেছেন, সেগুলো দিয়ে সুন্দরকে দেখার যদি একটুও সুবিধে হতো তো মানুষ কোন্ কালে এই সব আয়নার কাচ গালিয়ে মস্ত একটা আতসী কাচের চশমা বানিয়ে চোখে পরে' বসে' থাকতো, সুন্দরের খোঁজে কেউ চলতো না; কিন্তু সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্না তাই, সেখানে অন্যের মনোমতকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজে পেতে আনতে হয় নিজের মনোমতটি।

জীবের মনস্তত্ত্ব যেমন জটিল যেমন অপার, সুন্দরও তেমনি বিচিত্র তেমনি অপরিমেয়। কেউ কাযকে দেখছে সুন্দর সে দিন-রাত কাযের ধন্ধায় ছুটছে, কেউ দেখছে অকাযকে সুন্দর সে সেই দিকেই চলেছে, কিন্তু মনে রয়েছে দুজনেরই সুন্দর কায অথবা সুন্দর রকমের অকায! ধনী খুঁজে ফিরছে তার সর্বস্ব আগ্‌লাবার সুন্দর চাবি-কাটি, বিশ্রী তালা-চাবি কেউ খোঁজে না— আর দেখ চোর সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্ধি কাটবার সুন্দর সিঁদ! ভক্ত খুঁজছেন ভক্তিকে, শাক্ত খুঁজছেন শক্তিকে আর নর খোঁজে গাড়ী জুড়ি বি-এ পাশের পরেই বিয়েতে সোনার ঘড়ি এবং তার কিছু পরেই চাকরী এবং এমন সুন্দর একটি বাসাবাড়ী যেখানে সব জিনিষ সুন্দর করে' উপভোগ করা যায়। হাহুতাশ কচ্ছেন কবি কল্পনালক্ষ্মীর জন্যে এবং ছবি-লিখিয়ের হাহুতাশ হচ্ছে কলালক্ষ্মীর জন্যে, ধরতে গেলে সব হাহুতাশ যা চাই সেটা সুন্দরভাবে পাই এই জন্যে, অসুন্দরের জন্যে একেবারেই নয়। সুন্দরের রূপ ও তার লক্ষণাদি সম্বন্ধে জনে জনে মতভেদ কিন্তু সুন্দরের আকর্ষণ

যে প্রকাণ্ড আকর্ষণ এবং তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়ানো সে বিষয়ে দুই মত নেই।

যে ভাবেই হোক যা কিছু বা যারই সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি তার দুটো দিক আছে—একটা মনে ধরার দিক যেটাকে বলা যায় বস্তুর ও ভাবের সুন্দর দিক, আর একটা মনে না ধরার দিক যেটাকে বলা চলে অসুন্দর দিক, আমাদের জনে জনে মনেরও ঐ দুরকম দৃষ্টি—যাকে বলা যায় শুভ আর অশুভ বা সু আর কু দৃষ্টি। কাযেই দেখি, যে দেখছে তার মন আর যাকে দেখছে তার মন—এই দুই মন ভিতরে ভিতরে মিল্লো তো সুন্দরের স্বাদ পাওয়া গেল, না হলেই গোল। রাধিকা কৃষ্ণকে সুরূপ শ্যামসুন্দর দেখেছিলেন, তারপর অনঙ্গভীমদেব এবং তারপর থেকে আমাদের সবার কাছে রূপকসুন্দর ভাবে কৃষ্ণ এলেন, এই দুই মূর্তিই আমাদের শিল্পে ধরা হয়েছে, এখন কোন্ সমালোচকের সৌন্দর্য সমালোচনার উপর নির্ভর করে' এই দুই মূর্তির বিচার করবো? আ-কা-শ এই তিনটে অক্ষরে আকাশ জ্ঞানটাই রূপকের দল বলবে ভাল, কিন্তু রূপের সেবক তারা বলবে 'নব-নীরদ-শ্যাম' যা দেখে চোখ ভুল্লো মন ঝুরলো, যার মোহন ছায়া তমাল গাছে যমুনার জলে এসে পড়লো সেই সুন্দর। সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বলতে পারে তো আমাদের নিজের নিজের মন। পণ্ডিতের কাযই হচ্ছে বিচার করা এবং বিচার করে দেখতে হলেই বিষয়কে বিশ্লেষ করে দেখতে হয়, সুতরাং সুন্দরকেও নানা মুনি নানা ভাবে বিশ্লেষ করে দেখেছেন, তার ফলে তিল তিল সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমা গড়ে' তোলবার একটা পরীক্ষা আমাদের দেশে এবং গ্রীসে হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের মন সেই প্রথাকে সুন্দর বলে' স্বীকার করেনি এবং সেই প্রথায় গড়া মূর্তিকেই সৌন্দর্য-সৃষ্টির শেষ বলেও গ্রাহ্য করেনি। বিশেষ বিশেষ আর্টের পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা ছাড়া কোন আর্টিষ্ট বলেনি অন্য সুন্দর নেই, ঐটেই সুন্দর। আমাদের দেশ যখন বল্লে—সুন্দর গড়ো কিন্তু সুন্দর মানুষ গড়ো' না, সুন্দর করে' দেবমূর্তি গড়ো সেই ভাল, ঠিক সেই সময় গ্রীস বল্লে—না, মানুষকে করে' তোল সুন্দর দেবতার প্রায় কিম্বা দেবতাকে করে' তোল প্রায় মানুষ! আবার চীন বল্লে—খবরদার, দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়ো তো দৈহিক এবং ঐহিক সৌন্দর্যকে একটুও প্রশ্রয় দিও না চিত্রে বা মূর্তিতে। নিগ্রোদের আর্ট,

www.bengaliebook.com

যার আদর এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্টিষ্ট করছে তার মধ্যে আশ্চর্য রং রেখার খেলা এবং ভাস্কর্য দিয়ে আমরা যাকে বলি বেঢপ বেয়াড়া তাকেই সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে।

সুতরাং সুন্দরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিষ্টের নিজের নিজের মনে ছাড়া বাইরে নেই, কোন কালে ছিল না, কোন কালে থাকবেও না এটা একেবারে নিশ্চয় করে' বলা যেতে পারে। সুন্দর যদি খিচুড়ি হ'তো তবে এতদিনে সৌন্দর্যের তিল ও তাল মিলিয়ে কোন এক বেরসিক পরম সুন্দর করে সেটা প্রস্তুত করে' যেতো তথাকথিত কলারসিকদের জন্য, কিন্তু একমাত্র যাঁকে মানুষ বল্লে 'রসো বৈ সঃ' তিনিও সুন্দরের পরিপূর্ণ আদর্শ জনে জনে মনে মনে ছাড়া আপনার সৃষ্টিতে একত্র ও সম্পূর্ণভাবে কোথাও রাখেননি। তাঁর সৃষ্টি, এটি সুন্দর অসুন্দর দুইই, এবং সব দিক দিয়ে অপূর্ণও নয় পরিপূর্ণও নয় এই কথাই তিনি স্পষ্ট করে' যে জানতে চায় তাকেই জানিয়েছেন। শান্তিতে-অশান্তিতে সুখে-দুঃখে সুন্দরে-অসুন্দরে মিলিয়ে হ'ল ছোট এই নীড়, তারি মধ্যে এসে মানুষের জীবনকণা পরম সুন্দরের আলো পেয়ে ক্ষণিকের শিশির-বিন্দুর মতো নতুন নতুন সুন্দর প্রভা সুন্দর স্বপ্ন রচনা করে চল্লো। এই হ'ল প্রথম শিল্পীর মানস কল্পনা ও এই বিশ্বরচনার নিয়ম, এ নিয়ম অতিক্রম করে' কোন কিছুতে পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষরূপ দিতে পারে এমন আর্টও নেই আর্টিষ্টও নেই। যা বিশ্বের মানুষের মনে বিচিত্র পদার্থের মধ্য দিয়ে বিচিত্র হয়ে ফুটতে চাচ্ছে সেই পরম সুন্দরের স্পৃহা জেগেই রইলো, মিটলো না। যদি পরম সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান পেয়ে সত্যই কোন দিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে' ওঠার, নদীর ভরে' ওঠার, পাতার ঘন সবুজ হয়ে ওঠার, আগুনের জ্বলে' ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি আঁকা মূর্তি গড়া কবিতা লেখা গান গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। চাঁদ একটুখানি চাঁচ্‌নী থেকে আরম্ভ করে' পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠবার দিকে গেলেও যেমন শেষে একটুখানি অপরিণতি তার গোলটার মধ্যে থেকেই যায়, তেমনি মানুষের আর্টও কোথাও কখনো পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠে না। মানুষ জানে সে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি। গ্রীস ভারত চীন ঈজিপ্ট সবাই দেখি পরম সুন্দরের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা কেউ পায়নি,

কেবল পেতে চাওয়ার দিকেই চলেছে। আজ যেখানে মনে হল আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হ'তে পারে তাই হ'ল, কাল দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাঁড়িয়ে বলছে, হয়নি, আরো এগোতে হবে কিম্বা পিছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হবে। পরম সুন্দরের দিকে মামুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এই ভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁছচ্ছে আর্ট, এবং একটা গতি আর একটা গতি সৃষ্টি করছে, ঢেউ উঠলো ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে, চল, আরো বাকি আছে। এইভাবে সামনে আশেপাশে নানা দিক থেকে পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চিরযৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন নতুন।

মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে মনে ভাবে, সুন্দর! ঠিক সেই সময় অার একটি সুন্দর মুখের ছায়া আয়নায় পড়ে; যে ভাবছিলো সে অবাক হয়ে বলে, তুমি যে আমার চেয়ে সুন্দর, অমনি স্বপ্নের মতো সুন্দর ছায়া হেসে বলে, আমার চোখে তুমি সুন্দর! এই ভাবে এক আর্টে আর এক আর্টে, এক সুন্দরে অার এক সুন্দরে পরিচয়ের খেলা চলেছে, জগৎ জুড়ে সুন্দর মনের সুন্দরের সঙ্গে মনে মনে খেলা। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আর্ট দিয়ে ধরতে পারলে এ খেলা কোন্ কালে শেষ হয়ে যেতো। যে মাছ ধরে তার ছিপে যদি মৎস্য-অবতার উঠে আসতো তবে সে মানুষ কোন দিন আর মাছ ধরাধরি খেলা করতো না, সে তখনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে কলম হাতে মাছ বিক্রির হিসেব পরীক্ষা করতে বসতো, আর যদি তখনও খেলার আশা তার কিছু থাকতো তো এমন জায়গায় গিয়ে বসতো যেখানে ছিপে মাছ ধরাই দিতে আসে না, ধরি ধরি করতে করতে পালায়! পরম সুন্দর যিনি তিনি লুকোচুরি খেলতে জানেন, তাই নিজে লুকিয়ে থেকে বাতাসের মধ্য দিয়ে তাঁর একটু রূপের পরিমল, আলোর মধ্য দিয়ে চকিতের মতো দেখা ইত্যাদি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আর্টিষ্টদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান, আর্টিষ্টের মনও সেইজন্যে এই খেলাতে সাড়া দেয়, খেলা চলেও সেইজন্যে। এক একটা ছেলে আছে খেলতে জানে না খেলার আরম্ভেই হঠাৎ কোণ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধরা পড়ে' রস-ভঙ্গ করে' দেয় আর সব ছেলেগুলো তার সঙ্গে আড়ি

দিয়ে বসে। তেমনি পরম সুন্দরও যদি আর্টিষ্টদের সামনে হঠাৎ বেরিয়ে এসে রস-ভঙ্গ করতে বসেন তবে আর্টিষ্টরা তাঁকে নিয়ে বড় গোলে পড়ে যায় নিশ্চয়ই। আর্টিষ্টরা, ভক্তেরা, কবিরা—পরম সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর খেলা খেলেন কিন্তু পণ্ডিতেরা পরম সুন্দরকে অনুবীক্ষণের উপরে চড়িয়ে তাঁর হাড় হদ্দের সঠিক হিসেব নিতে বসেন। কাযেই দেখি যারা খেলে আর যারা খেলে না সৌন্দর্য সম্বন্ধে এ দুয়ের ধারণা এবং উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। পণ্ডিতেরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট কথা লিখে ছাপিয়ে গেছেন, সেগুলো পড়ে' নেওয়া সহজ কিন্তু পড়ে' তার মধ্য থেকে সৌন্দর্যের আবিষ্কার করাই শক্ত। আর্টিষ্ট তারা সুন্দরকে নিয়ে খেলা করে সুন্দরকে ধরে আনে চোখের সামনে মনের সামনে অথচ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায় দেখতে পাই। 'সুন্দর কাকে বল' এই প্রশ্নের জবাবে আর্টিষ্ট ড্রুরার বল্লেন, 'আমি ও সব জানিনে বাপু' অথচ তাঁর তুলির আগায় সুন্দর বাসা বেঁধেছিল! লিয়োনার্ডো দ্য ভিন্‌চি যাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর্ট থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেছে, তিনি বলেছেন—পরম সুন্দর ও চমৎকার অসুন্দর দুইই দুর্লভ, পাঁচ-পাঁচিই জগতে প্রচুর।

এক সময়ে আর্টিষ্টদের মনে জায়গা জায়গা থেকে তিল তিল করে বস্তুর খণ্ড খণ্ড সুন্দর অংশ নিয়ে একটা পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্তি রচনা করার মতলব জেগেছিল। গ্রীসে এক কারিগর এইভাবে হেলেনের চিত্র পাঁচজন গ্রীক সুন্দরীর পঞ্চাশ টুকরো থেকে রচনা করে সমস্ত গ্রীসকে চম্‌কে দিয়েছিল। কিছুদিন ধরে ঐ মূর্তিরই জল্পনা চল্লো বটে কিন্তু চিরদিন নয়, শেষে এমনও দিন এল যে ঐ ভাবে তিলোত্তমা গড়ার চেষ্টা ভারি মূর্খতা একথাও আর্টিষ্টরা বলে' বসলো! আমাদের দেশেও ঐ একই ঘটনা—শাস্ত্রসম্মত মূর্তিকেই রম্য বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করলেন, সে শাস্ত্র আর কিছু নয় কতকগুলো মাপ-জোঁক এবং পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু, কদলীকাণ্ড, কুক্‌কুটাণ্ড, নিম্বপত্র এই সব মিলিয়ে সৌন্দর্যের এবং আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেণ্ট খাদ্যসামগ্রী! মনের খোরাক এভাবে প্রস্তুত হয় না, কাযেই আমাদের শাস্ত্রসম্মত সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে artificiality তা ধর্ম-প্রচারের কাযে লাগলেও সেখানেই আর্ট শেষ হলো একথা খাটলো না।

একেষাং মতম্ বলে একটা জিনিয সে বলে' উঠলো 'তদ্ রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ', মনে যার যা ধরলো সেই হ'ল সুন্দর। এখন তর্ক ওঠে—মনে ধরা না ধরার উপরে সুন্দর অসুন্দরের বিচার যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে কিছু সুন্দর কিছুই অসুন্দর থাকে না সবই সুন্দর সবই অসুন্দর প্রতিপন্ন হয়ে যায়, কোন কিছুর একটা অাদর্শ থাকে না। ভক্ত বলেন ভক্তিরসই সুন্দর আর সব অসুন্দর, যেমন শ্রীচৈতন্য বল্লেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

আর্টিষ্ট বল্লেন,—কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে ইত্যাদি। যার মন যেটাতে টানলো তার কাছে সেইটেই হল সুন্দর অন্য সবার চেয়ে। এখন সহজেই আমাদের মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয়—কোন্ দিকে যাই, ভক্তের ফুলের সাজিতে গিয়ে উঠি, না আর্টিষ্টের বাঁশিতে গিয়ে বাজি? কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায়, ঘোরতর বৈরাগী এবং ঘোরতর অনুরাগী দুইজনেই চাইছেন একই জিনিষ—ভক্ত ধন চাইছেন না কিন্তু সব ধনের যা সার তাই চাইছেন, জন চাইছেন না কিন্তু সবার যে আপনজন তাকেই চাইছেন, সুন্দরী চান না কিন্তু চান ভক্তি, কবিতা নয় কিন্তু যিনি কবি যিনি স্রষ্টা—সুন্দরের যিনি সুন্দর—তাঁর প্রতি অচলা যে সুন্দরী ভক্তি তার কামনা করেন। আর্টিষ্ট ও ভক্ত উভয়ে শেষে গিয়ে মিলেছেন যা চান সেটা সুন্দর করে পেতে চান এই কথাই বলে'। মুখে সুন্দরী চাইনে বল্লে হবে কেন, মন টান্ছে বৈরাগীর ও অনুরাগীর মতোই সমান তেজে যেটা সুন্দর সেটার দিকে। মানুষের অন্তর বাহির দুয়ের উপরেই সুন্দরের যে বিপুল আকর্ষণ রয়েছে তা সহজেই ধরা যাচ্ছে—শুন্তে চাই আমরা সুন্দর, বলতে চাই সুন্দর, উঠ্তে চাই, বস্তে চাই, চল্তে চাই সুন্দর, সুন্দরের কথা প্রত্যেক পদে পদে আমরা স্মরণ করে চলেছি। পাই না পাই, পারি না পারি, সুন্দর বৌ ঘরে আনবার ইচ্ছা নেই এমন লোক কম আছে। যা কিছু ভাল তারি সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে দেখা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। আমরা কথায় কথায় বলি—গাড়ীখানি সুন্দর চলেছে, বাড়ীখানি সুন্দর বানিয়েছে, ওষুধ সুন্দর কায করছে; এমন কি পরীক্ষার প্রশ্ন আর উত্তরগুলো সুন্দর হয়েছে একথাও বলি। এমনি সব ভালর সঙ্গে সুন্দরকে

www.bengaliebook.com

জড়িয়ে থাকতে যখন আমরা দেখছি তখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে সুন্দরের আকর্ষণ আমাদের মনকে ভালোর দিকেই নিয়ে চলে, আর বাকে বলি অসুন্দর তারও তো একটা আকর্ষণ আছে, সেও তো যার মন টানে আমার কাছে অসুন্দর হয়েও তার কাছে সুন্দর বলেই ঠেকে, তবে মনে ধরা এবং মন টানার দিক থেকে সুন্দরে অসুন্দরে ভেদ করি কেমন করে'? কাযেই সুন্দর অসুন্দর দুই মিলে চুম্বক পাথরের মত শক্তিমান একটি জিনিষ বলেই আমার কাছে ঠেকছে। সুন্দরের দিকটা হ'ল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক এবং অসুন্দরের দিকও হ'ল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক। এখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে চুম্বক যেমন ঘড়ির কাঁটাকে দক্ষিণ থেকে পরে পরে সম্পূর্ণ উত্তরে নিয়ে যায় তেমনি সুন্দরের টান মানুষের মনকে ক্ষণিক ঐহিক নৈতিক এমনি নানা সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে মহাসুন্দরের দিকেই নিয়ে চলে, আর অসুন্দরের প্রভাব সেও মানুষের মনকে আর এক ভাবে টানতে টানতে নিয়ে চলে কদর্যতার দিকেই। কিন্তু সত্যিকার একটা কাঁটা আর চুম্বক নিয়ে যদি এই সত্যটা পরীক্ষা করতে বসা যায় তবে দেখবো সুন্দরের একটা চিহ্ন দিয়ে তারি কাছে যদি চুম্বকের টানের মুখ রাখা যায় তবে কাঁটা সোজা সুন্দরে গিয়ে ঠেকবে নিজের ঘর থেকে, আবার ঐ চুম্বকের মুখ যদি অসুন্দর চিহ্ন দিয়ে সেখানে রাখা যায় তবে ও কাঁটা উল্টো রাস্তা ধরেই ঠিক অসুন্দরে গিয়ে না ঠেকে পারে না। কিন্তু এমন তো হয় যে, আমি যদি মনে করি তবে অসুন্দরের গ্রাস থেকেও কাঁটাকে আরো খানিক টেনে সুন্দরের কাছে পৌঁছে দিতে পারি কিম্বা সুন্দরের দিক থেকে অসুন্দরে নামিয়ে দিতে পারি! সুতরাং সুন্দর অসুন্দরের মধ্যে কোন্ টাতে আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সমুদয় গিয়ে দাঁড়াবে তার নির্দেশ কর্তা হচ্ছে আমাদের মন ও মনের ইচ্ছা। মনে হ'ল তো সুন্দরে গিয়ে লাগলেম, মনে হ'লতো অসুন্দরে গিয়ে পড়লেম কিম্বা সুন্দর থেকে অসুন্দর অসুন্দর থেকে সুন্দরে দৌড় দিলেম, মন ও মনের শক্তি হল এ বিষয়ে নিয়ন্তা। টানে ধরলে যে চুম্বক ধরেছে তার মনের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রয়োজন না রেখেই কাঁটা আপনিই তার চরম গতি পায়, কিন্তু এই গতিকে সংযত করে' অধোগতি থেকে ঊর্ধ্ব বা ঊর্ধ্ব থেকে অধোভাবের দিকে আনতে হলে আমাদের মনের একটা ইচ্ছাশক্তি একান্ত দরকার। বিল্বমঙ্গল বারবনিতার প্রেমোন্মাদ থেকে বিভুর প্রেমোন্মাদে গিয়ে যে ঠেকলেন সে শুধু তাঁর মনটি

শক্তিমান ছিল বলেই। নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টে, অসুন্দর থেকে সুন্দরে যেতে সেই পারে যার মন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর, যার মন অসুন্দর সেও এই ভাবে চলে ভাল থেকে মন্দে। আর্টিষ্ট কবি ভক্ত এঁদের মন এমনিই শক্তিমান যে অসুন্দরের মধ্য দিয়ে সুন্দরের আবিষ্কার তাঁদের পক্ষে সহজ। ভক্ত কবি আর্টিষ্ট সবাই এক ধরণের মানুষ; সবাই আর্টিষ্ট, আর্টিষ্টের কাছে ভেদ নেই পণ্ডিতের কাছে যেমন সেটা আছে। আর্টিষ্টের কাছে রসের ভেদ আছে, মনের অবস্থাভেদে সু হয় কু, কু হয় সু এও আছে, তাছাড়া রূপভেদও আছে; কিন্তু সু কু এর যে নির্দিষ্ট সীমা পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে অপণ্ডিত পর্যন্ত টেনে দিচ্ছে, এ রূপ সে রূপের মাঝে সেই পাকাপোক্ত পাঁচিল নেই আর্টিষ্টের কাছে। নীরসেরও স্বাদ পেয়ে আর্টিষ্টের মন রসায়িত হয়, এইটুকুই তফাৎ আর্টিষ্টের আর সাধারণের মনে। তুমি আমি যখন খরার দিনে পাখা আর বরফ বলে' হাঁক দিচ্ছি আর্টিষ্ট তখন সুন্দর করে' খরার দিন মনে ধরে' কবিতা লিখলে—'কাল বৈশাখী আগুন ঝরে, কাল বৈশাখী রোদে পোড়ে! গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই!' রসের প্রেরণা সুন্দর অসুন্দরের ধারণাকে মুক্তি দিলে, আর্টিষ্টের মধ্যে সুন্দর অসুন্দরে মিলিয়ে এক রসরূপ সে দেখে চল্লো। আর্টিষ্ট রূপমাত্রকে নির্বিচারে গ্রহণ করলে—কেন সুন্দর কেন অসুন্দর এ প্রশ্ন আর্টিষ্ট করলে না, শুধু রসরূপে যখন বস্তুটিকে দেখলে তখন সে সাধারণ মানুষের মত আহা ওহো বলে' ক্ষান্ত থাকলো না, দেখার সঙ্গে আর্টিষ্টের মন আপনার সৌন্দর্যের অনুভূতিটা প্রত্যক্ষ করবার জন্য সুন্দর উপায় নির্বাচন করতে লাগলো। সুন্দর রং চং সুন্দর ছন্দোবন্ধ এমনি নানা সরঞ্জাম নিয়ে আর্টিষ্টের সমস্ত মানসিক বৃত্তি ধাবিত হল সুন্দরের স্মৃতিটিকে একটা বাহ্যিক রূপ দিতে, কিম্বা সুন্দরের স্মৃতিটিকে নতুন নতুন কল্পনার মধ্যে মিশিয়ে নতুন রচনা প্রকাশ করতে। সুন্দর বা তথাকথিত অসুন্দর দুয়েরই যেমন মনকে আকর্ষণ করবার শক্তি আছে, তেমনি মনের মধ্যে গভীর ভাবে নিজের স্মৃতিটি মুদ্রিত করবারও শক্তি আছে—সুতরাং সুন্দরে অসুন্দরে এখানেও এক। সুন্দরকেও যেমন ভোলবার জো নেই অসুন্দরকেও তেমনি টেনে ফেলবার উপায় নেই। দুই স্মৃতির মধ্যে শুধু তফাৎ এই, সুন্দরের স্মৃতিতে আনন্দ, অসুন্দরের স্পর্শে মন ব্যথিত হয়, সুখও যেমন দুঃখও তেমনি মনের একস্থানে গিয়ে সঞ্চিত হয়, শুধু দুঃখকে মানুষ ভোলবারই চেষ্টা করে আর সুখের স্মৃতিকে লতার মত মানুষের মন

জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতেই চায় দিন রাত। সাধারণ মানুষের মনেও যেমন, আর্টিষ্ট মানুষের মনেও তেমনি সহজ ভাবেই সুন্দর অসুন্দরের ক্রিয়া হয়, শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিষ্টের তফাৎ হচ্ছে মনের অনুভূতিকে প্রকাশের ক্ষমতা বা অক্ষমতা নিয়ে। দুঃখ পেলে সাধারণ মানুষ বেজায় রকম কান্নাকাটি সুরু করে, আর্টিষ্টও যে কাঁদে না তা নয়, কিন্তু তার মনের কাঁদন আর্টের মধ্য দিয়ে একটি অপরূপ সুন্দর ছন্দে বেরিয়ে আসে। অসুন্দরের মধ্যে, অ-সুখের মধ্যে আর্টিষ্টের কাছ থেকে রস আসে বলেই আর্ট মাত্রকে সুন্দরের প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়, এবং সেই কারণে আর্টের চর্চায় ক্রমে সুন্দরের অনুভূতি আমাদের যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন সৌন্দর্য সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক পড়ে' কিম্বা শুনে হয় না। আসলে যা সুন্দর তা কখনও বলে না, আমি এই জন্যে সুন্দর; আমাদের মনেও ঠিক সেই জন্যে সুন্দরকে গ্রহণ করবার বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে না যে, কেন এ সুন্দর! আসলে যে সুন্দর নয় সেই কেবল আমাদের সামনে রং মেখে অলঙ্কার পরে' হাব ভাব করে' এসে বলে আমি এই কারণে সুন্দর, মনও আমাদের তখনি বিচার করে বুঝে নেয় এ রংএর দ্বারা অথবা অলঙ্কারে বা আর কিছুর দ্বারায় সুন্দর দেখাচ্ছে কি না! আসলে যা সুন্দর তাকে নিয়ে আর্টিষ্ট কিম্বা সাধারণ মানুষের মন বিচার করতে বসে না, সবাই বলে—সুন্দর ঠেক্‌ছে, কেন তা জানি না। কিন্তু সুন্দরের সাজে যে অসুন্দর আসে তাকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং আর্টিষ্টের মনে তর্কের উদয় হয়। কিন্তু পণ্ডিতের মন দার্শনিকের মনের ঠিক বিপরীত উপায়ে চলে, অসুন্দরের বিচার সেখানে নাই, সব বিচার বিতর্ক সুন্দরকে নিয়ে। যা সুন্দর আমরা দেখেছি তা নিজের সুন্দরতা প্রমাণের কোন দলিল নিয়ে এল না কিন্তু আমাদের মন সহজেই তাতে রত হল, কিন্তু পণ্ডিতের সামনে এসে সুন্দর দায়গ্রস্ত হ'ল—প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠলো সুন্দরকে নিয়ে—তুমি কেন সুন্দর, কিসে সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি! সুন্দর, সে সুন্দর বলেই সুন্দর, মনে ধরলো বলেই সুন্দর, এ সহজ কথা সেখানে খাটলো না। পণ্ডিত সেই সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করছেন—কি নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য? সেই বিশ্লেষণের একটা মোটামুটি হিসেব করলে এই দাঁড়ায়—(১) সুখদ বলেই ইনি সুন্দর, (২) কাযের বলেই সুন্দর, (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর, (৪) অপরিমিত বলেই সুন্দর, (৫) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর, (৬) সুসংহত

www.bengaliebook.com

বলেই সুন্দর (৭) বিচিত্র অবিচিত্র সম বিষম দুই দিয়ে ইনি সুন্দর।—এই সব প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মতামত নিয়ে সৌন্দর্যের সার ধরবার জন্যে সুন্দর একটি জাল বুনে নেওয়া যে চলে না তা নয়, কিন্তু তাতে করে' সুন্দরকে ঠিক যে ধরা যায় তার আশা আমি দিতে সাহস করি না; তবে আমি এই টুকু বলি—অন্যের কাছে সুন্দর কি বলে' আপনাকে সপ্রমাণিত করছে তা আমাদের দেখায় লাভ কি? আমাদের নিজের নিজের কাছে সুন্দর কি বলে' আসছে তাই আমি দেখবো। আমি জানি সুন্দর সব সময়ে সুখও দেয় না কাযও দেয় না—বিদ্যুৎ-শিখার মত বিশৃঙ্খল অসংযত উদেশ্যহীন বিদ্রুত বিষম এবং বিচিত্র আবির্ভাব সুন্দরের! সুন্দর, এই কথাই তো বলছে আমাদের—আমি এ নই তা নই, এজন্যে সুন্‌দর ওজন্যে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর। আর্টের মধ্যে রীতিনীতি, চক্ষু-জোড়ানো মন-ওড়ানো প্রাণ-ভোলানো ও কাঁদানো গুণ, কিম্বা এর যে কোন একটা যেমন আর্ট নয়, আর্ট বলেই যেমন সে আর্ট, সুন্দরও তেমনি সুন্দর বলেই সুন্দর। সুন্দর নিত্য ও অমূর্ত, নানা বস্তু নানা ভাবের মধ্যে তার অধিষ্ঠান ও আরোপ হলে তবে মনোরসনা তার স্বাদ অনুভব করে—এমন সুন্দর তেমন সুন্দর সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর! আমাদের জিব যেমন চাখে মেঠাই সন্দেশ সরবৎ ইত্যাদি পৃথক পৃথক জিনিষের মধ্য দিয়ে মিষ্টতাকে—ঠিক সেই ভাবেই জীব বা জীবাত্মা মনোরসনার সাহায্যে আপনার মধ্যে সুন্দরের জন্য যে প্রকাণ্ড পিপাসা রয়েছে সেটা নানা বস্তু ধরে' মেটাতে চলে। অতএব বলতে হয়, মন যার যেমনটা চায় সেইভাবে সুন্দরকে পাওয়াই হ'ল পাওয়া, আর কারু কথা মতো কিম্বা অন্য কারু মনের মতো সুন্দরকে পাওয়ার মানে—না পাওয়াই। মা-বাপের মনের মতো হলেই বৌ সুন্দর হল একথা যে ছেলের একটু মাত্র সৌন্দর্য জ্ঞান হয়েছে সে মনে করে না। বৌ কাযের, বৌ সংসারী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্না, এবং হয়তো বা ডাক-সাইটে সুন্দরীও হতে পারে অন্য সবার কাছে, কিন্তু ছেলের নিজের মনের মধ্যে কায কর্ম সংসার সুরূপ কুরূপ ইত্যাদির একটা যে ধারণা তার সঙ্গে অন্যের পছন্দ করা বৌ মিল্লো তো গোল নেই, না হলেই মুস্কিল। হিন্দিতে প্রবাদ আছে 'আপ্ রুচি খানা—পর রুচি পহেরনা', খাবারের স্বাদ আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ভাবে নিতে হয় সুতরাং সেখানে আমাদের স্বরাজ, কিন্তু পরণের বেলায় পরে যেটা দেখে' সুন্দর বলে

সেইটেই মেনে চলতে হয়, না হলে নিন্দে; সুতরাং সেখানে কেউ জোর ক'রে বলতে পারে না এইটেই পরি পাঁচজনে যা বলে বলুক, আমরা নিজের বুদ্ধিকেও সেখানে প্রাধান্য দিতে পারিনে, দেশ কাল যে সুন্দর পরিচ্ছদের সম্মান করে তাকেই মেনে নিতে হয়। একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই, সাজ গোজ পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু ওলট পালট সময়ে সময়ে যে হয়ে আসছে তা ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকেই আসছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দর অসুন্দরের বোঝা-পড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে। যদি সত্যই এই জগৎ অসুন্দরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, নিছক সুন্দর জিনিষ দিয়ে গড়া পরিপূর্ণ সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্বগুণান্বিত একটা কিছু হতো তবে এর মধ্যে এসে সুন্দর অসুন্দরের কোন প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হতে না। আমরা এই জগৎ সংসার চিরসুন্দরের প্রকাশ ইত্যাদি কথা মুখে বল্লেও চোখে তা দেখিনে অনেক সময় মনেও সেটা ধরতে পারিনে, কাজেই অতৃপ্ত মন সুন্দরের বাসনায় নানা দিকে ধাবিত হয় এবং সুন্দরের একটা সাক্ষাৎ আদর্শ খাড়া করে, দেখার চেষ্টা করে এবং সুন্দরকে অসুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখলে আমাদের সৌন্দর্যজগৎ যে খণ্ড ও খর্ব হয়ে পড়ে তা আর মনেই থাকে না। সুরূপ কুরূপ দুয়ে মিলে সুন্দরের অখণ্ড মূর্তির ধারণা করা শক্ত কিন্তু একেবারে যে অসম্ভব মানুষের পক্ষে তা বলা যায় না। ভক্ত কবি এবং আর্টিষ্ট এদের কাছে সুন্দর অসুন্দর বলে দুটো জিনিষ নেই, সব জিনিষের ও ভাবের মধ্যে যে নিত্য বস্তুটি সেটিই সুন্দর বলে' তাঁরা ধরেন। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যা কিছু তা অনিত্য, তার সুখ শৃঙ্খলা মান পরিমাণ সমস্তই অনিত্য, সুতরাং সুন্দর যা নিত্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তার সঙ্গে মেলা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলা যেতে পারে। আমাদের মনই কেবল গ্রহণ করতে পারে সুন্দরের আস্বাদ—সুতরাং মনোরসনা রোগ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার মতো ভীষণ বিপত্তি মানুষের হতে পারে না। আর্টের দিক দিয়ে যৌবনই সুন্দর বার্ধক্য সুন্দর নয়, আলোই সুন্দর অন্ধকার নয়, সুখই সুন্দর দুঃখ নয়, পরিষ্কার দিন বাদলা নয়, বর্ষার নদী শরতের নয়, পূর্ণচন্দ্রই চন্দ্রকলা নয়—কেউ একথা বলতে পাবে না। যে একেবারেই আর্টিষ্ট নয় শুধু তারি পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডভাবের একটা আদর্শ সৌন্দর্যকে কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব। কবীর ছিলেন আর্টিষ্ট তাই তিনি বলেছিলেন—"সবহি মূরত বীচ অমূরত, মূরতকী

www.bengaliebook.com

বলিহারী”। যে সেরা আর্টিষ্ট তারি গড়া যা কিছু তারি মধ্যে এইটে লক্ষ্য করছি—ভালমন্দ সব মূর্তির মধ্যে অমূর্তি বিরাজ করছেন! “ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো, মৈঁ কেহি বিধি কথৌঁ গম্ভীরা লো”—সুন্দর যে অসুন্দরের মধ্যেও আছে এ গভীর কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত তাই কবীর এক কথায় সব তর্ক শেষ করিলেন “বিছুড়ি নহিঁ মিলিহো”—বিচ্ছিন্নভাবে তাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু এই যে সুন্দরের অখণ্ড ধারণা কবীর পেলেন তার মূলে কি ভাবের সাধনা ছিল জানতে মন সহজেই উৎসুক হয়; এর উত্তর কবীর যা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে সব আর্টিষ্টের এক ছাড়া দুই মত নেই দেখা যায়—“সংতো সহজ সমাধ ভলী, সাঁঈসে মিলন ভয়ো জা দিনতে সুরত ন অন্তি চলি॥ আঁখ ন মুদুঁ কান ন রূংধু, কায়া কষ্ট ন ধারূঁ। খুলে নয়ন মৈ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নিহারূঁ॥” সহজ সমাধিই ভাল, হেসে চাও দেখবে সব সুন্দর, যার মনে হাসি নেই তার চোখে সুন্দরও নেই। যার প্রাণে সুর আছে বিশ্বের সুর বেসুর বিবাদী সম্বাদী সবই সুন্দর গান হয়ে মেলে তারি মনে। আর যার কাছে শুধু পুঁথির সুর-সপ্তক স্বরলিপি ও তাল বেতালের বোল মাত্রই আছে, তার বুকের কাছে বিশ্বের সুর এসে তুলোট কাগজের খড়মড়ে শব্দে হঠাৎ পরিণত হয়।

এখন মানুষের ব্যক্তিগত রুচির উপরে সুন্দর অসুন্দরের বিচারের শেষ নিষ্পত্তিটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে সুন্দর অসুন্দরের যাচাই করবার আদর্শ কোন্‌খানে পাওয়া যাবে এই আশঙ্কা সবারই মনে উদয় হয়। সুন্দরকে বাহ্যিক উপমান ধরে’ যাচাই করে নেবার জন্যে এ ব্যস্ততার কারণ আমি খুঁজে পাইনে। ধর, সুন্দরের একটা বাঁধাবাঁধি প্রত্যক্ষ আদর্শ রইলো না, প্রত্যেকে আমরা নিজের নিজের মনের কষ্টিপাথরেই বিশ্বটাকে পরীক্ষা করে চল্লেম—খুব আদিকালে মানুষ আর্টিষ্ট যে ভাবে সুন্দরকে দেখে চলেছিল—এতে করে’ মানুষের সৌন্দর্য উপভোগ সৌন্দর্য সৃষ্টির ধারা কি একদিনের জন্য বন্ধ হ’ল জগতে? বরং আর্টের ইতিহাসে এইটেই দেখতে পাই যে যেমনি কোন জাতি বা দল আর্টের দিক দিয়ে কিছুকে আদর্শ করে’ নিয়ে ধরে’ বসলো পুরুষ-পরম্পরায় অমনি সেখানে রসের ব্যাঘাত হতে আরম্ভ হ’ল, আর্টও ক্রমে অধঃ থেকে অধোগতি পেতে থাকলো। আমাদের সঙ্গীতে সেই তানসেন ও আকব্বরি চাল, ছবিতে দিল্লীর চাল বা বিলাতী চাল যে কুকাণ্ড ঘটাতে পারে, এবং সেই আদর্শকে উল্টে

ফেলে চল্লেও যা হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমস্ত আমাদের সামনেই ধরা রয়েছে, সুতরাং আমার মনে হয় সুন্দরের একটা আদর্শের অভাব হ'লে তত ভাবনা নেই, যত ভাবনা আদর্শটা বড় হয়ে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও অনুভবশক্তির বিলুপ্তি যদি ঘটায়। কালিদাসের আমলে 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' ছিল সুন্দরীর আদর্শ। অজন্তার এবং তার পূর্বের যুগ থেকেও হয়তো এই আদর্শই চলে আসছিল, মোগলানী এসে এবং অবশেষে আরমাণি থেকে আরম্ভ করে ফিরিঙ্গিনী পর্যন্ত এসে সে আদর্শ উল্টে দিলে এবং হয়তো কোন দিন বা চীনই এসে সেটা আবার উল্টে দেয় তারও ঠিক নেই। আদর্শটা এমনিই অস্থায়ী জিনিষ যে তাকে নিয়ে চিরকাল কারবার করা মুস্কিল। রুচি বদলায় আদর্শও বদলায়, যেটা ছিল এককালের চাল সেটা হয় অন্যকালের বেচাল, ছিল টিকি এল টাই, ছিল খড়ম এল বুট, এমনি কত কি! গাছগুলো অনেককাল ধরে' এক অবস্থায় রয়েছে—সেই জন্যে এই গুলোকেই আদর্শ গাছ ইত্যাদি বলে' আমাদের মনে হয় কিন্তু পৃথিবীর পুরাকালের গাছ পাতা ফল ফুলের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা—অথচ তারাও তো ছিল সুন্দর!—সুতরাং পরিবর্তনশীল বাইরেটার মধ্যে সুন্দর আদর্শভাবে থাকে না। শিশু গাছ, বড় গাছ এবং বুড়ো গাছ প্রত্যেকেরই মধ্যে যে সুন্দরের ধারা চলছে, পরম সুন্দর হয়ে দেখা দেবার নিত্য এবং বিচিত্র চেষ্টা সেই প্রাণের স্রোত নিয়ে হচ্ছে গাছ সুন্দর। এমনি আমাদের মনে বা বস্তু ও ভাবের অন্তরে যে নিত্য এবং সুন্দর প্রাণের স্রোত গোপনে চলেছে তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে' ধরতে পারি, আর কিছুকে নয়, এবং সেই আদর্শই সুন্দরকে যাচাই করার যে নিত্য আদর্শ নয় তা জোর করে কে বলতে পারে! সমস্ত পদার্থের সৌন্দর্যের পরিমাপ হল তাদের মধ্যে, অনিত্য রস যা তা নিয়ে বাইরের রং রূপ বদলে' চলে কিন্তু নিত্য যা তার অদল বদল নাই। সব শিল্পকে যাচাই করে' নেবার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের মনে নিত্য সুন্দরের যে একটি আদর্শ ধরা আছে—তার চেয়ে বড় আদর্শ কোথায় আর পাবো? যে ভাবেই হোক যে বস্তুই হোক যখন সে নিত্য তার আস্বাদ দিয়ে আমাদের মনে পরমসুন্দরের স্বল্পাধিক স্পর্শ অনুভব করিয়ে গেল সে সুন্দর বলে' আমাদের কাছে নিজেকে প্রমাণ করলে। আমার কাছে কতকগুলো জিনিষ কতকগুলো ভাব সুন্দর ঠেকে কতক ঠেকে অসুন্দর, এই ঠেকলো সুন্দর এই অসুন্দর, তোমার কাছেও তাই, আমার মনের সঙ্গে

www.bengaliebook.com

মেলে না তোমারটি তোমার সঙ্গে মেলে না অামারটি। সুন্দরের অসুন্দরের অবিচলিত অাদর্শ চলায়মান জীবনে কোথাও নেই, সুতরাং যেদিক দিয়েই চল সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে বিতর্ক মেটবার নয়, কাযেই এই অতৃপ্তিকেই—এই সুখ-দুঃখে আলো-আঁধারে সুন্দর, অসুন্দরে মেলা খণ্ড-বিখণ্ড সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলকে—সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে যে চলতে পারে, সেই সুন্দরকে এক ও বিচিত্রভাবে অনুভব করবার সুবিধে পায়। জগৎ যার কাছে তার ছোট লোহার সিন্দুকটিতেই ধরা আর জগৎ যার কাছে লোহার সিন্দুকের বাইরেও অনেকখানি বিস্তৃত ধূলোর মধ্যে কাদার মধ্যে আকাশের মধ্যে বাতাসের মধ্যে, তাদের দু'জনের কাছে সুন্দর ছোট বড় হয়ে দেখা যে দেয় তার সন্দেহ নেই! সিন্দুক খালি হ'লে যার সিন্দুক তার কাছে কিছুই আর সুন্দর ঠেকে না, কিন্তু যার মন সিন্দুকের বাইরের জগৎকে যথার্থভাবে বরণ করলে তার চোখে সুন্দরের দিকে চলবার অশেষ রাস্তা খুলে গেল, চলে গেল সে সোজা নির্বিচারে নির্ভয়ে। যখন দেখি নৌকা চলেছে ভয়ে ভয়ে, পদে পদে নোঙ্গর আর খোঁটার আদর্শে ঠেকতে ঠেকতে, তখন বলি, নৌকা সুন্দর চল্লো না, আর যখন দেখলেম নৌকা উল্টো স্রোতের বাধা উল্টো বাতাসের ঠেলাকে স্বীকার করেও গন্তব্য পথে সোজা বেরিয়ে গেল ঘাটের ধারের খোঁটা ছেড়ে নোঙ্গর তুলে নিয়ে, তখন বলি, সুন্দর চলে গেল!

সুন্দর অসুন্দর–জীবন-নদীর এই দুই টান—একে মেনে নিয়ে যে চল্লো সেই সুন্দর চল্লো আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইলো যে কোনো একটা খোঁটায় বাঁধা। ঘাটের ধারে বাঁশের খোঁটা, তাকে অতিক্রম করে চলে' যায় নদীর স্রোত নানা ছন্দে এঁকে বেঁকে,—আর্টের স্রোতও চলেছে চিরকাল ঠিক এই ভাবেই চিরসুন্দরের দিকে। সুন্দর করে' বাঁধা আদর্শের খোঁটাগুলো আর্টের ধাক্কায় এদিক ওদিক দোলে, তারপর একদিন যখন বান ডাকে খোঁটা সেদিন নিজে এবং নিজের সঙ্গে বাঁধা নৌকাটাকেও নিয়ে ভেসে যায়। আর্ট এবং আর্টিষ্ট এদের মনের গতি এমনি করে' পণ্ডিতদের বাঁধা এবং মূর্খদের আঁকড়ে ধরা তথাকথিত দড়ি খোঁটা অতিক্রম করে' উপড়ে' ফেলে' চলে' যায়। বড় আর্টিষ্টরা সুন্দরের আদর্শ গড়তে আসেন না, যেগুলো কালে কালে সুন্দরের বাঁধাবাঁধি আদর্শ হয়ে দাঁড়াবার জোগাড়

করে, সেইগুলোকেই ভেঙে দিতে আসেন, ভাসিয়ে দিতে আসেন সুন্দর অসুন্দরের মিলে যে চলন্ত নদী তারি স্রোতে। যে পারে সে ভেসে চলে মনোমত স্থানে মনতরী ভেড়াতে ভেড়াতে সুন্দর সূর্যাস্তের মুখে, আর সেটা যে পারে না সে পরের মনোমত সুন্দর করে' বাঁধা ঘাটে আটকা থেকে আদর্শ খোঁটায় মাথা ঠুকে ঠুকেই মরে, সুন্দর অসুন্দরের জোয়ার ভাঁটা তাকে বৃথাই দুলিয়ে যায় সকাল সন্ধ্যে!

বাঁধা নৌকা সে এক ভাবে সুন্দর, ছাড়া নৌকা সে আর এক ভাবে সুন্দর; তেমনি কোন একটা কিছু সকরুণ সুন্দর, কেউ নিষ্করুণ সুন্দর, কেউ ভীষণ সুন্দর, আবার কেউ বা এত বড় সুন্দর কি এতটুকু সুন্দর—আর্টিষ্টের চোখে এইভাবে বিশ্বজগৎ সুন্দরের বিচিত্র সমাবেশ বলেই ঠেকে; আর্টিষ্টের কাছে শুধু তর্ক জিনিষটাই অসুন্দর, কিন্তু তর্কের সভায় যখন ঘাড় নড়ছে হাত নড়ছে ঝড় বইছে তার বীভৎস ছন্দটা সুন্দর। সুতরাং যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে কথায় দোলে সুরে দোলে ফুলে দোলে ফলে দোলে বাতাসে দোলে পাতায় দোলে—সে শুকনোই হ'ক তাজাই হ'ক সুন্দর হ'ক অসুন্দর হ'ক সে যদি মন দোলালো তো সুন্দর হ'ল এইটেই বোধ হয় চরম কথা সুন্দর অসুন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিষ্ট বলতে পারেন নিঃসঙ্কোচে। আদর্শকে ভাঙতে বড় বড় আর্টিষ্টরা যা আজ রচনা করে' গেলেন, আস্তে আস্তে মানুষ সেইগুলোকেই যে আদর্শ ঠাউরে নেয় তার কারণ আর কিছু নয়, আমাদের সবার মন সত্যিই যে সুন্দর তার স্বাদ পেতে ব্যাকুল থাকে—যে রচনার মধ্যে যে জীবনের মধ্যে তার আস্বাদ পায় তাকেই অন্য সবার চেয়ে বড় করে' না বোধ করে' সে থাকতে পারে না। এইভাবে একজন, ক্রমে দশজন। এবং এমনো হয়, সৌন্দর্য সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত নেই অথচ চেষ্টা রয়েছে সুন্দরকে কাছাকাছি চারিদিকে পেতে, সে, অথবা সুন্দরের কোন ধারণা সম্ভব নয় শুধু সৌন্দর্যবোধের ভাণ করছে, সেও, আর্ট বিশেষকে আস্তে আস্তে আদর্শ হবার দিকে ঠেলে তুলে' ধরে,—ঠিক যে ভাবে বিশেষ বিশেষ জাতি আপনার আপনার এক একটা জাতীয় পতাকা ধরে' তারি নীচে সমবেত হয়; সে পতাকা তখনকার মতো সুন্দর হলেও একদিন তার জায়গায় নতুন মানুষ তোলে নতুন সজ্জায় সাজানো নিজের Standard বা সৌন্দর্য-বোধের চিহ্ন। এইভাবে একের পর আর এসে নতুন

নতুন ভাবে সুন্দরের আদর্শ ভাঙ্গাগড়া হ'তে হ'তে চলেছে পরিপূর্ণতার দিকে, কিন্তু পূর্ণ সুন্দর বলে' নিজেকে বলাতে পারছে না কেউ। আর্টিষ্টের সৌন্দর্যের ধারণা পাকা ফলের পরিণতির রেখাটির মতো সুডৌল ও সুগোল কিন্তু জ্যামিতির গোলের মতো একেবারে নিশ্চল গোল নয়, সচল ঢলঢলে গোল যার একটু খুঁৎ আছে, পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়; সেই কারণে অনেক সময় বড় আর্টিষ্টের রচনা সাধারণের কাছে ঠেকে যাচ্ছেতাই—কেন না সাধারণ মন জ্যামিতিক গোলের মতো আদর্শ একটা না একটা ধরে' থাকেই, কাযেই সে সত্য কথাই বলে যখন বলে যাচ্ছেতাই, অর্থাৎ তার ইচ্ছের সঙ্গে মিলছে না আর্টিষ্টের ইচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছেতাই শব্দটি বড় চমৎকার, এটিতে বোঝায়—যা ইচ্ছে তাই, সাধুভাষায় বল্লে বলি, যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ বা যথাভিরুচি, এই যা ইচ্ছে তাই—যা মন চাচ্ছে তাই, সুতরাং রসিক ও আর্টিষ্ট এই শব্দটির যথার্থ অর্থ সুন্দর অর্থ ধরেই চিরকাল চলেছে। মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে সুন্দরকে মনের টানের উপরে ছেড়ে যা ইচ্ছে তাই বলে' পণ্ডিতানাম্ মতম্-এর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে; খোঁটা-ছাড়া নৌকা বাঁধনমুক্ত-প্রাণ! তাই দেখছি সুন্দর অসুন্দরের বাছ্-বিচার পরিত্যাগ করে' তারি সঙ্গে গিয়ে লাগবার স্বাধীনতা আর্টিষ্টের মনকে বড় কম প্রসার দেয় না।

বড় মন বড় সুন্দরকে ধরতে চাইছে যখন, বড় স্বাধীনতার মুক্তি তার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু মন যেখানে ছোট সেখানে আর্টের দিক দিয়ে এই বড় স্বাধীনতা দেওয়ার মানে ছেলের হাতে আগুনের মশালটা ধরে' দেওয়া,—সে লঙ্কাকাণ্ড করে' বসবেই, নিজের সঙ্গে আর্টের মুখ পুড়িয়ে কিম্বা ভরাডুবি করে' স্রোতের মাঝে। বড় মন সে জানে বড় সুন্দরকে পেতে হ'লে কতটা সংযম আর বাঁধাবাঁধির মধ্য দিয়ে নিজেকে ও নিজের আর্টকে চালিয়ে নিতে হয়। ছোট সে তো বোঝেনা যে পরের অনুসরণে সুন্দরের দিকে চলাতেও আলো থেকে আলোতেই গিয়ে পৌঁছয় মন; আর নিজের ইচ্ছামত চলতে চলতে ভুলে' হঠাৎ সে অসুন্দরের নেশা ও টানে পড়ে' যায়, তখন তার কোন কারিগরিই তাকে সুন্দরের বিষয়ে প্রকাণ্ড অন্ধতা এবং আর্ট বিষয়ে সংসারজোড়া সর্বনাশ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পণ্ডিতরা আর কিছু না হোন পণ্ডিত তো বটে, সৌন্দর্যের এবং আর্টের

লক্ষণ নিয়ম ইত্যাদি বেঁধে দিতে তাঁরা যে চেয়েছেন তা এই ছোট মনের উৎপাত থেকে আর্টকে এবং সেই সঙ্গে আর্টিষ্টকেও বাঁচাতে। যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ—একথা যাঁরা শিল্প বিষয়ে পণ্ডিত তাঁরা স্বীকার করে' নিলেও এই যা-ইচ্ছে-তাই শিল্পের উপরে খুব জোর দিয়ে কিছু বল্লেন না। কেন না তাঁরা জানতেন হৃদয় সবার সমান নয় মহৎ নয় সুন্দর নয়, হৃদয়ে যা ধরে তারও ভেদাভেদ আছে, হৃদয় আমাদের অনেক জিনিষে গিয়ে লগ্ন হয় যা অসুন্দর এবং একেবারেই আর্ট নয়, এবং এও দেখা যায় পরম সুন্দর এবং অপূর্ব আর্ট তাতেও গিয়ে হৃদয় লাগলো না, মধুকরের মতো উড়ে' পড়লো না ফুলের দিকে, কাদাখোঁচার মতো নদীর ধারে ধারেই খোঁচা দিয়ে বেড়াতে লাগলো পাঁকে।

যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয় গিয়ে লগ্ন হচ্ছে কুব্জার লাবণ্যে, আর একে পড়েছে চন্দ্রাবলীর প্রেমে অন্যে রাধে রাধে বলেই পাগল, তখন এই তিনে মিলে ঝগড়া চলবেই। এই সব তর্কের ঘূর্ণাজলে আর্টকে না ফেলে সৌন্দর্য ও আর্টের ধারাকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত রকমে চালাতে হয় পুরুষ-পরম্পরায়, তবে পণ্ডিত ও রসিকদের কথিত সমস্ত রসের রূপের ধারার সাহায্য না নিলে কেমন করে' খণ্ড-বিখণ্ডতা থেকে আর্টে একত্ব দেওয়া যাবে। আমার নিজের মুখে কি ভাল লাগল না লাগল তা নিয়ে দু'চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হ'লে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অসুন্দর তাকে বড় করে' সবার করে' দেবার উপায় নিছক নিজত্বটুকু নয়; সেখানে individualityকে universality দিয়ে যদি না ভাঙতে পারা যায়, তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পুরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিম্বা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্র মধ্যম হওয়াকে অস্বীকার ক'রলে সঙ্গীতে যে কাণ্ড ঘটে, artএও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয় যদি সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিষ্ট ও রসিকদের দিক দিয়ে। ধারা ভেঙে নদী যদি চলে শতমুখী ছোট ছোট তরঙ্গের লীলা-খেলা শোভা-সৌন্দর্য নিয়ে তবে সে বড় নদী হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্যে শিল্পে পূর্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টির মুখে অগ্রসর হতে হয় আর্টের জগতে। সত্যই যে শক্তিমান্ সে পুরাতন

www.bengaliebook.com

প্রথাকে ঠেলে চলে, আর যে অশক্ত সে এই বাঁধাস্রোত বেয়ে আস্তে আস্তে বড় শিল্প রচনার ধারা ও সুরে সুর মিলিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে' চলে। বাইরে রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে, ভিতরে ভাবে ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে। যে ছবি লিখেছে, গান গেয়েছে, নৃত্য করেছে সে যেমন এটা সহজে বুঝতে পারবে, তেমন যারা শুধু সৌন্দর্য সম্বন্ধে পড়েছে, কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা শুনেছে তারা তা পারবে না। সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুল্লো তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছল মন্দিরে এবং ভিতরের খবর বয়ে চল্লো বাইরে অবাধ স্রোতে— সুন্দর অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।

www.bengaliebook.com